অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৭০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রাকর
আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

সাহিত্যজগতে আমার অকৃত্রিম বন্ধু

শ্রীসুনীল মণ্ডল

প্রিয়বরেষু

আতো ভাগনাডিহি।

দামিনঈকোহ্ পার্বত্য সানুদেশে প্রকৃতির শ্যামলা অঞ্চল, সাঁওতাল আবাসিত গ্রাম ভাগনাডিহি। শ্বেতাংবের পার হয়ে বাস্কেয়াবের। কাক-প্রত্যূষ অতিক্রান্ত, তারপর আরও খানিকটা প্রসন্ন সকাল। আকাশের সূর্য এখন প্রকৃত সিঞচান্দো। সত্যিকার দিবা-চন্দ্রমা!

পুরাণপ্রসিদ্ধি শোনাতে বসেছে ভাগনাডিহির গ্রাম-পুরোহিত, আতো নাইকী স্বরীন মুর্মু। সাঁওতালী উপকথা। লিপিতে আবদ্ধ নয়, কিন্তু অজস্র সময়ের বারিধি অতিক্রম করেও কাহিনী-ধারায় কোনো পরিবর্তন নেই। বংশ-পরম্পর স্মৃতির ভরসায় অবসানের নিশ্চিত ইঙ্গিত অবহেলায় মাড়িয়ে গেছে।

ভোগন টুডুর কুটির প্রাঙ্গণে আতোর জন পঁচিশ হড়্ উপস্থিত। মায়জিউ, অর্থাৎ নারীও বারো তেরোটি। কাহিনী আরম্ভের আগে পুরোহিত স্বরীন মুর্মু মাথার শিথিল ঝুঁটি খুলে পুনরায় ঘনকুঞ্চিত চুলে দৃঢ়তর গিঁট বাঁধে। ডান কানের পাশে কিশলয় সমেত অশোকগুচ্ছ। ক্ষুদ্র পুষ্পস্তবকটি আর একবার কানের পাশে সুরক্ষিত করে নেয় সে। তারপর হাতের জ্বলন্ত চুটিতে শেষ টান দিয়ে সেটি সহকারী কুড়ম নাইকী কাপোশ মুর্মুকে দিয়ে পুরাকাহিনীর মুখবন্ধ উন্মোচনে প্রবৃত্ত হয়।

হড়্ সমাজের যত নারী ও পুরুষের এ গল্প সুপরিজ্ঞাত। এবং তা অধিকাংশেরই কণ্ঠস্থ। তবু পরম নিবিষ্টচিত্তে শোনে তারা। পুণ্য কথার পুনরাবৃত্তিতে পুণ্য বর্ধন, শ্রবণে পাপ অপনোদন। উপরন্তু বিভিন্ন অপদেবতা ও সবিশেষ অনিষ্টকারী বোঙার সম্ভাব্য রোষ থেকে অব্যাহতি।

প্রথম দিকে স্বরীন মুর্মু প্রতিটি শব্দ বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করে, 'সে অনেক অনেক বছর আগেকার কথা—আড্ডী আড্ডী সেরমা! এত বছর যে হাত আর পায়ের আঙুল গুনে শেষ করা যায় না। পাজী দীকু মহাজনরাও সে হিসেব জানে না। তাদের খেরো বাঁধানো পাকি বহি কিতোবে এ আঁক লেখা অসম্ভব। একটা মানুষের দেহের সব হাড়গোড়, হড়ের হড়মোয় যত হড়মহাটিং, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি বছর!'

সময়ের বৃত্তান্ত শেষ করে নাইকী একটু বিরতি দেয়, তারপর সেই কথিকার মূল অংশের দিকে তার ক্রমশ যাত্রা, 'তখন এই ধারতিতে একটুও হাসা নেই, বুরু নেই একটাও, শুধু অথৈ দাঃ।'

মৃত্তিকা এবং পর্বতহীন বিশ্বলোক। অনন্ত অগাধ মহাসমুদ্র। সুবিশাল বিকট জালাপুরী। মানুষ তো বহু দূর ও কল্পনাতীত ভবিষ্যতের জীব, একটা পশুপাখি কীটপতঙ্গও তখন নেই। বিপুল-পরিধি মহারাশিতে ভুবন আচ্ছন্ন।

এ অবস্থা বোঝাবার জন্যে নাইকী নিজের বুকের উভয় প্রান্তে দু-বাহু প্রসারিত করে দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ অর্ধ বৃত্তাকারে পাক দিতে দিতে বলে, 'ঠাকুরজিউ সিসিজাওইর ইচ্ছে হল জীউইআন সৃষ্টি করবে। প্রথমে হরো তায়ান আর বোয়াড় হাকো—কচ্ছপ কুমির ও বোয়ালমাছ। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল অনির্দেশ জালাপুরীর কোথায় যে তারা ডুব দিল—! খুব রাগ ঠাকুরজিউর, কাড়াং কাড়াং এদরে ; আর জালাপুরীর জীউইআন নয়, নিজের হড়মোর সঙ্গে মিলিয়ে হড়্ তৈরি করবে—চেহারার অনুরূপে মানুষ।'

শ্রোতা হিসেবে ওড়ার রাচায় উপস্থিত টুইলা মারান্তী নামের বছর পঁয়ত্রিশ বয়েসের একজন মুণ্ডিতকেশ হড়্ বাঁ হাত তুলে প্রশ্ন করে, 'অতে হো নাইকী, হড়্, মানুষ—দীকুদের মতন মানুষ নাকি?'

টুইলা মারান্তীর বাঁ বাহুর উল্টো পিঠে, কব্জি থেকে হাতের কনুই পর্যন্ত পাঁচটি পোড়া ঘায়ের চিহ্ন। আকৃতিতে টাকার মাপ। ধর্মসম্মত প্রথায় শিকা নেওয়া হাতটার দিকে তাকিয়ে গ্রাম পুরোহিত সুরীন নাইকী সবলে মাথা নাড়ে, 'বাইং বাইং, না না, দীকুর মতন কেন হতে যাবে, ঠাকুরজিউ কি দীকু নাকি?'

'তবে?' টুইলার দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর সবিশেষ প্রশ্নময়।

পূর্বমুখে উপবিষ্ট সুরীন নাইকীর চোখে তরুণ সূর্যের সতেজ রশ্মি পড়েছে, ঘাড় উঁচু করে বাঁ হাতের পাতায় আলোর ভ্রূকুটি আড়াল করে সে সগর্বে জবাব দেয়, 'দীকু শয়তান, সিসিজাওই ঠাকুরজিউ আমাদের মতন দেখতে—ঠাকুরজিউ হড়্।'

'ও—ও—!' পরম আস্থায় ঘাড় নাড়ে টুইলা, তারপর সমর্থনের প্রত্যাশায় ইতস্তত তাকিয়ে দেখে অনেকগুলি গ্রীবা সোল্লাসে আন্দোলিত। মেয়েদের কৃষ্ণবর্ণ কম্বুকণ্ঠগুলিতেও পুলকের হিল্লোল।

সমুদ্রের নিচে হাত ডুবিয়ে একতাল মাটি তুলে ঠাকুরজিউ সিসিজাওই নিজের হড়মোর ছায়ার অনুকরণে একজোড়া মানুষের মতো পুতুল তৈরি করল

হড়্ কোড়া হড়্ কুড়ি। সুন্দর পুতুল দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠাকুর-জিউ মনস্থির করে তাদের মুখের ভেতর দিয়ে বুকের মধ্যে প্রাণের হাওয়া পুরে দেবে। এই চিন্তা ও আয়োজনের অবসরে সিঞচান্দো হাসুর হতে চলেছে। সূর্য অস্তমিত প্রায়। সিঞচান্দোর পোস্ত সাদম তখন জালাপুরীতে জল খেতে নেমেছে। সেই পিপাসার্ত শ্রান্ত শ্বেত অশ্বের গায়ের ধাক্কা লেগে সিসিজাওইর হাতে গড়া মাটির পুতুলদুটি ছিটকে সাগর-জলে পড়ল। ঠাকুরজিউ তাড়াতাড়ি আকাশের মতো উঁচু আর বিরাট মূর্তি ধারণ করে সমুদ্রে হাত ডুবিয়ে একেবারে তল অবধি পাঁতি পাঁতি খুঁজল, কিন্তু ততক্ষণে মাটির পুতুল কাদার তাল, তার অঙ্গ থেকে ঠাকুরজিউর হাতের স্পর্শ সম্পূর্ণ ধুয়ে গেছে।

সিসিজাওই ঠাকুরজিউ রাগ করে আট দিন বসে রইল। এই ইরাম দিন সে সিঞচান্দোর মুখে হাত চাপা দিয়ে রাখল। চারিদিকে কাড়াং কাড়াং এ়ত্—খুব গাঢ় অন্ধকার। ঘোর তমসায় পরিবেষ্টিত জালাপুরীর জীবরা আহার অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে সম্পূর্ণ উপবাসী। ক্ষুধায় কাতর। শেষাবধি তারা একত্র হয়ে ঠাকুরজিউর পুজো করল। গান গেয়ে আলোর প্রার্থনা। পুজো আর গানে তুষ্ট ঠাকুরজিউ সিঞচান্দোর মুখের ওপর থেকে হাতের আড়াল সরিয়ে নিতে আবার চারিদিকে রাঁত ছড়িয়ে পড়ল। সূর্যের স্নিগ্ধ ও সতেজ রশ্মি দেখে ঠাকুরজিউ প্রসন্ন। রাগ ভুলল সিসিজাওই।

এবার ঠাকুরজিউ স্থির করে, আর হড় নয়, চেঁড়ে। মুক্তাকাশের বিহঙ্গ। জন্মের পর হড়্ থাকবে কোথায়? নোয়াপুরীর কোথাও তো এক কণা হাসা নেই! মৃত্তিকাশূন্য জলময় পৃথ্বী! তাই জলের জীব ছাড়া আকাশচারী পক্ষী সৃষ্টিই সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যে ঠাকুরজিউ, হড়ের আদি দেবতা সিসিজাওই পরম যত্নের সঙ্গে মরাল মরালীর জুটি গঠন করল। অপূর্ব সেই হাঁস হাঁসীল! নিজের সৃষ্টির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সিসিজাওই, ইতিমধ্যে দিবা-চন্দ্রমার শেষ কিরণ সাগরের বুকে বিলীন।

সন্ধ্যের মুখে সিঞচান্দোর পোও সাদম নিয়মমতো জালাপুরীতে জল খেতে নামে, এবার খুব ভয়ে ভয়ে, ব্যস্ততা আছে কিন্তু সাবধানতার অভাব নেই। সিসিজাওইর শরীরের ছায়া থেকে পর্যন্ত সে দূরে সরে থাকে। পরিতৃপ্ত চিত্তে জল পান করে হানাপুরী, অর্থাৎ স্বর্গে ফিরে যাবার সময় সে ঠাকুরজিউকে স্মরণ করায়, 'পাখিজোড়া হাতে নিয়ে তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছ, এদের দেহে প্রাণ তো দাওনি?'

পোণ্ড সাদমের কথায় সির্সিজাওই মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠে উত্তর দেয়, 'সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এ সময় প্রাণ দিলে তারপর এরা যাবে কোথায় ? কাল সকালে জীবন সঞ্চার করব, সারাদিন আকাশে উড়ে বেড়াতে পারবে।'

পরের দিন শ্বেতাংবেরে সিঞচান্দো আকাশে উঁকি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-জিউ হাঁস হাঁসীলের লাল টুকটুকে ঠোঁট ফাঁক করে সেখানে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিল, তারপর মৃত্তিকা নির্মিত ধড় দুটিতে অতর্কিতে প্রাণের স্পন্দন। সৃষ্টির আদিতম পক্ষীযুগল মুহূর্তমাত্র অবসর না রেখে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত আকাশ পথে নিরুদ্দেশ। কিন্তু আয়ুপ ঞ্‌ত হলেই ফিরে এল তারা। সন্ধ্যের আঁধারে থাকবে কোথায়, উপরন্তু সারা রাতই তো বাকি ?

জীব সৃষ্টি মানেই দায়িত্ব, হাঁস হাঁসীলকে নিজের দুটি হাতের পাতায় আশ্রয় দিয়ে ঠাকুরজিউ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে রাত কাটাল। জালাপুরীর অগাধ জলের বুকে দাঁড়িয়ে রইল সির্সিজাওই। কর্তব্যের পেষণ!

পরের দিন সকাল হতেই ক্ষুধার্ত হাঁস হাঁসীল ঠাকুরজিউর কাছে খাবার চাইল। আর বসবাসের জায়গা। সির্সিজাওই অনুভব করে এদের দাবি মেটাতে ঘুটু ছাড়া অন্য উপায় নেই। স্থলের বিকল্প জলে হয় না। জালাপুরীর যত জীবকে ডেকে সির্সিজাওই গভীর অতল থেকে হাসা তুলতে বলল। কেউ সাহস করল না। তল থেকে ওপর পর্যন্ত তুলে আনতে আনতে মাটির শেষ কণাটাও ধুয়ে গিয়ে আবার সাগরের জলে মিশে যাবে। ঠাকুরজিউ বিব্রত। গভীর চিন্তামগ্ন। কি ভাবে সমুদ্রের বুকে মাটি জড়ো হবে, হংসমিথুন বাসা বাঁধবে, তাদের আহারের জন্যে শস্য ফলবে ?

তপ্ত দুপুর, সূর্যের ক্লান্ত পিপাসার্ত ঘোড়া সমুদ্রের বুকে জল পান করতে নেমেছে। তিকিনবেরের প্রচণ্ড অগ্নিদাহ, পোণ্ড সাদমের মুখের খানিকটা জমে যাওয়া শ্বেত ফেনা জালাপুরীতে পড়ল। ঠাকুরজিউর হাতের আশ্রয় থেকে হাঁস হাঁসীল সেই ফেনিল তরণীতে বসে কিছুক্ষণ সাগরজলে বিহার করে এল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরজিউর মস্তিষ্ক খানিকটা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে, সে কূর্মকে ডেকে বলল, 'তোর পিঠের ওপর আমি নোয়াপুরী রচনা করব, পৃথিবী গড়ব।'

কূর্ম রাজী, তবু সবিনয়ে অক্ষমতা ব্যক্ত করে, 'আমি তো পাতাল থেকে মাটি তুলতে পারব না ?'

সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ঝুঁকিয়ে ঠাকুরজিউ তখন হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করে, 'কে পারবে এই হরোর পিঠের ওপর হাসা তুলে জমা করতে ?'

অসম্ভব প্রস্তাব, সবাই পাশ কাটিয়ে গেলে লেঙেৎ এগিয়ে আসে। সেই ক্ষীণ-কলেবর কেঁচো ঠাকুরজিউকে বলে, 'তুই ঐ হাঁস হাঁসীলকে বল ফেনার নৌকো এনে হরোর পিঠের ওপর রাখতে। আমি জালাপুরীর অতল থেকে হাসা তুলে এনে জমা করব. নয়তো হরোর পিছল গায়ে হাসা ধরবে না।'

লেঙেতের অসাধ্য সাধনের ফলে হানাপুরী সৃষ্টি। জালাপুরীর বুকে ভাসমান হরো; সেইজন্যে আজও মাটি খুঁড়লেই জল বের হয়।

সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট শিখাসমন্বিত একজন প্রবীণ হড়্ পবিত্র পুরাণ-কাহিনী শুনতে শুনতে চুটি ধরাচ্ছিল, বাকি গল্পাংশ তার অজানিত নয়. জনসভায় বসে নিজেও আনুপূর্বিক শোনাতে পারে, তবু নাইকী কিঞ্চিৎ বিরতি দিতে সে চুটি ধরানো স্থগিত রেখে আগ্রহে প্রশ্ন করে, 'চেৎ ইনাকাতে নাইকী--তারপর কি হল নাইকী?'

সুরীন মুর্মু হাত তুলে তাকে নীরব থাকার ইঙ্গিত করে, 'ইঞ লাই এদা, লাই এদা—তুই থাম, আমি বলছি, বলছি।'

আবার আরম্ভ করে সুরীন নাইকী। এ গল্প সে বিভিন্ন পর্ব ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আতোর হড়্ সভায় অজস্রবার বলেছে; যা অকথিত থাকলে অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ। ফলে অনিষ্টকারী অপদেবতা বোঙাবর্গের রোষ এবং অত্যাচারে সারা আতো অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

স্থগিত রাখা কাহিনীর শেষাংশের থেই ধরে নাইকী বলে চলে, 'হরোর পিঠের ওপর নোয়াপুরী, সির্সিজাওই খুশি হয়ে সেই মাটিতে ফোসলের বীজ পুঁতল। বীজ থেকে গাছ। তার ডালে হাঁস হাঁসীলের বাসা। একদিন সেই বাসায় হাঁসীলের মিত্ জোড়া নীল রঙের বেলে দেখা গেল। ডিম ফুটে বের হল কোড়া গিদরে আর কুড়ি গিদরে। ছেলে আর মেয়ে। নোয়াপুরীর প্রথম হড়্।'

পৃথিবীর প্রথম পুরুষ। প্রথম নারী। কৃষ্ণাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গী সহোদর সহোদরা। কিন্তু অতঃপর সমস্যা, কি খেয়ে এই দুটি মানব সন্তান জীবন ধারণ করবে, হাঁসীল তো পয়স্বিনী নয়? সির্সিজাওই হাঁসীলকে পরামর্শ দিল শস্যের মণ্ড তৈরি করে শিশু দুটিকে পান করাতে।

কিন্তু এখানেই সমস্যার শেষ নয়, ক্রমশ সেই গিদরে দুটি বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। পাখির নীড়ে তাদের সম্পূর্ণ অকুলান। ছেলে পিলচু কোড়া. মেয়ে পিলচু কুড়ি; ছোট্ট বাসায় গা ঘেঁষাঘেঁষি, নড়তে চড়তে পারে না, নিয়ত আশঙ্কা সমুদ্রের জলে পড়ে পাতালে তলিয়ে যাবে।

হাঁস হাঁসীল ঠাকুরজিউকে ডেকে দেখায়, 'আমাদের পিলচুরা অনেক বড় হয়ে গেছে, এখন কোথায় এদের রাখি ?'

একটু চিন্তা করে সির্সিজাওই, তারপর পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, যা সম্ভবত এই পৃথিবীর বাইরে, একটি স্থানের কথা স্মরণ করে বলে, 'তোদের কোড়াকুড়িকে হিহিরিপিপিরিতে নিয়ে গিয়ে রেখে আয়। সেখানে তারা চিরদিন প্রকৃতির শিশু হয়ে থাকবে, আশ্রয় অথবা আহার্যের অভাব হবে না। লজ্জা নিবারণের জন্যে দেহ আচ্ছাদনের কথা চিন্তায় আসবে না। লজ্জা নামের পাপ থেকে তারা মুক্ত থাকবে।'

দুই পিলচুকে পিঠে নিয়ে হাঁস হাঁসীল হিহিরিপিপিরিতে রেখে এল। ক্রমশ বেশ বড়সড় হয়ে উঠল তারা। তারপর একদা দেবদূত লিটা পউরের পাত্র হাতে সুমুখে উপস্থিত হয়ে বলল, 'তোরা সর্বপ্রথম দেবাদিদেব মারাং বুরুকে এই মাদক পানীয় উৎসর্গ কর, উৎসর্গের মন্ত্র, ঞ্যা তব্যা মারাং বুরু—। তারপর দেবতার প্রসাদী পউর পান করে জীবন উপভোগ কর।'

'তারপর ?' পিলচুরা প্রশ্ন করে।

মৃদু মনোহর হাসি হেসে লিটা উত্তর দেয়, 'প্রকৃতি তোদের বাকি নির্দেশ দেবে। গুরুরূপী প্রকৃতি তোদের অন্তঃকরণেই বিরাজ করছে, যথাসময়ে তার সাক্ষাৎ পাবি।'

লিটার পরামর্শে পিলচু কোড়া আর পিলচু কুড়ি পউর পান করে নেশার ঘোরে বয়হা-মিসেরা সম্পর্ক ভুলে গেল। স্মরণ রইল না তারা একই পিতামাতার সন্তান। সহোদর সহোদরা। জাওঞাই আর রিনিংর মতো দাম্পত্য আচরণে মত্ত হয়ে উঠল তারা। এবং একবার নতুন সুখের স্বাদ পেয়ে দৈনিক পুনরাবৃত্তি।

ইতিমধ্যে লিটা একদিন হিহিরিপিপিরিতে এসে পিলচুদের অনুসন্ধান করল। তারা লিটার আগমনের সংবাদ পেয়ে ঘন বনানীর অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। অনেক ডাকাডাকির পর বিরক্ত হয়ে লিটা এবার অভিপাশের ভাষা উচ্চারণ করে।

অগত্যা পিলচু কোড়া একটা গাছের আড়াল থেকে সাড়া দেয়, 'আলিং নন্তে —আমরা এখানে রয়েছি !'

'তোরা লুকিয়ে কেন ?' লিটার কণ্ঠস্বর সবিশেষ রোষপূর্ণ, 'আমার সুমুখে এসে দাঁড়া।'

সলজ্জ ও আশঙ্কাযুক্ত গলায় পিলচু কোড়া উত্তর দেয়, 'আমরা উলঙ্গ। পউর

পান করে আমরা নিজেদের মধ্যে আসঙ্গে লিপ্ত হয়েছি। এমনকি আচরণ মুহূর্ত ছাড়া পরস্পরের দিকে উন্মুক্ত দৃষ্টিতে তাকাতে পর্যন্ত পারছি না। আমরা বিচিত্র সুখের স্বাদ পেয়েছি, সেইসঙ্গে লজ্জা ও পাপবোধের রজ্জুতে বাঁধা পড়ে গেছি। আর আমরা আগেকার মতো তোর সুমুখে গিয়ে সরল চিত্তে দাঁড়াতে পারব না।'

পিলচু কোড়ার উত্তর শুনে লিটা নিঃশব্দ হাসি হাসে, তারপর গম্ভীর স্বরে বলে, 'তোদের জীব সৃষ্টি করতে হবে, সির্সিজাওই সেই উদ্দেশ্যে তোদের নোয়াপুরীতে এনেছে। আর তোরা বয়হা-মিসেরা নয়, তোদের সম্পর্ক জাওঞাই আর রিনিঃ। স্বামী-স্ত্রী। আজ থেকে তোদের পরিচয় পিলচু হাড়াম, পিলচু বুঢ়ী।'

পিলচু হাড়াম পিলচু বুঢ়ীর সাত কোড়া গিদরে আর সাতটি কুড়ি গিদরে। ঐ গ্যালপুনিয়া, অর্থাৎ চোদ্দটি সন্তান নিজেদের মধ্যে বাপলা করে আলাদা আলাদা সংসার পাতল। হিহিরিপিপিরি থেকে তাদের বংশ ক্রমশ ক্রমশ খোজখামানের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ততদিনে আদি পিলচু দম্পতি খুব সুখের সঙ্গে নোয়াপুরীর জীবন কাটিয়ে হানাপুরী চলে গেছে। ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে।

পিলচু দম্পতির সাত পুত্র, হাঁসদা মুর্মু কিস্কু হেমব্রম মারাণ্ডী সোরেন এবং টুডু। তাদের নামেই পরবর্তী কালে হড়ের গোত্র আর পদবী। ক্রমে সেই সাতের সংখ্যা বেড়ে বারোটি। কেবল বারোই নয়, বারো গুণিত বারো। একটি গোত্রে আরও এগারোটি উপগোত্র। তবে সাধারণত বিবাহাদির সময়েই সেইসব ভাঙা গোত্রের অনুসন্ধান। এবং তদনুযায়ী কৌলিন্যের অগ্রপশ্চাৎ।

এতক্ষণ বিনা প্রতিবাদেই পুরাণ-কাহিনী এগিয়ে চলেছিল। নাইকী পিলচুর পুত্রদের নামোচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই টোহা বাস্কে সজোরে প্রতিবাদ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ায়, 'বাইং, না না না, আগে কিস্কু ছিল না বাস্কে ছিল। পিলচুর কোড়া বাস্কে, আমার নিজের গড়ম গড়ম গডম গড়মবা—পূর্বপুরুষ।'

স্বরীন মুর্মু হাত তুলে টোহা বাস্কেকে চ্যাঁচাতে নিষেধ করে, তারপর বলে, 'এই ব্যাপার নিয়ে হড্ সমাজে বরাবরই একটু রেটেপেটে। তবে ঝগড়াঝাঁটি যতই থাক, পিলচুর মুর্মু নামের একটা কোড়া তো ছিলই, মুর্মু ছাড়া আর কেউ কি নাইকী হতে পারে?'

সমর্থনসূচক গ্রীবা আন্দোলন করে টোহা বাস্কে, তারপর আগের মতো বসে পড়ে জবাব দেয়, 'মুর্মু ছাড়া আবার নাইকী হয় নাকি? মুর্মুই তো বাবর্ডে,

যেমন দীকুদের ভেতর বাভন। বাভন ভিন্ন আর কেউ দীকুদের পুজোপাঠ করতে পারে না।'

'কানায় কানায়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো। মুর্মুই বাবডে।' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে স্বরীন মুর্মু নিজের বাবডেত্ব পুনর্বার জাহির করে।

তীব্র প্রতিবাদের স্বরে আপু মারাণ্ডী বলে ওঠে, 'মুর্মু বাবড়ে, এ যে নতুন কথা! সবাই জানে আসল বাবড়ে হল মারাণ্ডী। মারাণ্ডীরা মুর্মুকে নাইকী হতে দিয়েছে তাই মুর্মু নাইকীর কাজ করে।'

'ও, মুর্মু বাবডে নয়? হানাপুরীতে গিয়ে তোর বা' আর গড়মবা-কে জিজ্ঞেস করে আয়, মুর্মু বাবডে কি না।' স্বরীন নাইকীর সহকারী কুড়ম নাইকী কাপোশ মুর্মু কলহের ভাষায় প্রতিবাদ জানায়, তারপর উত্তেজিত হাতে বাঁ কানের পাশ থেকে আধপোড়া চুটি টেনে নিয়ে মুখে গুঁজে রেখে রোষযুক্ত ভঙ্গিতে ঠক্ ঠক্ করে একনাগাড়ে চকমকি ঠুকে চলে। আগুনের প্রতিটি ফুল্কি চোঙার ভেতর না পড়ে ইতস্তত ছিটকে ছিটকে পড়ে।

ডাঙে মাঝির মাজায় শকুনাস্থি গাঁথা কোমরবন্ধনী, দু-বাহুতে অস্থিময় বাজু, কানের লতিতে সিকি ইঞ্চি মাপের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে শকুনাস্থি গলানো, গলায় অস্থির সাতনরী; কোমর আর হাত দুটি নৃত্যভঙ্গিমায় দুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, তারপর সমবেত প্রত্যেকের দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বলে, 'এখানে যদি কোনো রেটেপেটে হয় তো আমি চলে যাব।'

স্বরীন নাইকী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভয় দেখায়, 'চলে যাবি তো যা। কিন্তু ধরমের কথা শেষ অবদি না শুনে উঠে গেলে সন্ধ্যেবেলা তোকে এ়ৃত জীউ ধরবে। অন্ধকারের ঐ ভূত তোর ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষে খাবে।'

'এ়ৃত জীউ আমায় ধরলেই হল নাকি?' সর্বাঙ্গের অস্থিভূষণ বাজিয়ে ডাঙে মাঝি সগর্বে উত্তর দেয়, 'আমার হড়মোর সঙ্গে গিদি চেঁড়ের হড়মহাটিং গাঁথা রয়েছে, ভূতপ্রেত রোগমোগ কি ডাইনীর ভয় করি না।'

জবাবের মাধ্যমে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্ভীক জাহির করবার চেষ্টা করলেও প্রতিবাদ জানাবার পর ডাঙে মাঝি বেহায়াগাছের বেড়া ঘেরা গোবরমাটি নিকোনো ওড়ার রাচায় একান্ত বিনীত ও শিষ্ট হড়ের মতো বসে পড়ে। এ়ৃত জীউকে তুষ্ট রাখতে মনে মনে মাঝি-বোঙার মন্ত্র জপ করে সে। অধিকন্তু মাঝি-বোঙার থানে একটা সীম অর্থাৎ মুর্গী বলি দেওয়ার সংকল্প নেয়। মাঝি-বোঙা তুষ্ট থাকলে বাদবাকি জীউ আর বোঙাবৃন্দের যৌথ শক্তিও অচল।

সবদিক থেকে চিন্তা করার পর ডাঙে মাঝি গুমোর ভরা গলায় বলে, 'আমার কোনো কিছুর ভয় নেই, কিন্তু চলে যাব বললেই তো আর যাওয়া যায় না ? হড়্ সমাজে আছি যখন, তার সমস্ত আনআরি মেনে চলতে হবে।' তারপর সে স্বরীন নাইকীর উদ্দেশে বলে, 'নে, এবার তোর ধরম-কথা তাড়াতাড়ি শেষ কর, সেই শ্বেতাঃবেরে বসেছি তারপর তিকিনবের হয়ে গেল।' মাথার ওপর হাত তুলে দ্বিপ্রহরের সূর্য দেখায় সে।

চুলের পাশ থেকে কাঠের চিরুনি খুলে নিয়ে স্বরীন নাইকী সেই জায়গাটা একবার চুলকে নেয়। বোধহয় উকুন! কলাপাতা পোড়ানো ছাই আর সাজিমাটি দিয়ে মাথা ঘষা হয় নি অনেক দিন। আজই সময় করে এ কাজ সারতে হবে।

কাঠের নাকিটি মাথার যথাস্থানে গুঁজে নিয়ে নাইকী আবার পুণ্য-কথা আরম্ভ করে, 'পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুঢ়ী পউর খাবার পর পাপ করেছিল, তাদের গিদরেরা আরও বেশি পাপ করল, তাই ঠাকুরজিউ একদিন খুব এদরে নিয়ে এসে বলল, 'আমি সবাইকে দাল দিয়ে নোয়াপুরীতে আবার নতুন হড়্ তৈরি করব। সেই হড়্ পাপ কাকে বলে তা জানবে না।'

মায়জিউ মহলে বসে রয়েছে নিনকী মেঝেন, পরনে নীল ডুরির পঞ্চি, গামছার মতো ক্ষুদ্র অধোবাস। ঊর্ধ্বাঙ্গে অনুরূপ বর্ণের পাঢ়ান, দৈর্ঘ্যে তিন হাত। পাঢ়ানের এক প্রান্ত ডান কোমরে গোঁজা, অপর দিকটা বুকের ওপর দিয়ে ফেরতা দিয়ে বাঁ কাঁধ মাড়িয়ে পিঠ বেয়ে কোমরের পশ্চাৎভাগে নেমেছে, সেখানে কিছুটা অংশ কসিতে আশ্রিত, বাকি পুষ্পগুচ্ছের মতো ঝুলে রয়েছে।

নিনকী মেঝেন চল্লিশোর্ধ মায়জিউ, বয়স্কা মহিলা, কিন্তু তার হাড়মোমুঠান আর মেৎআঁহা, শারীরিক আকৃতি অথবা চোখমুখের ভঙ্গিমা, এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণ যৌবনের বন্ধনে শাসিত। বিশেষত বুকের ওপর অর্ধোন্মুক্ত সুঠাম সুদৃঢ় মাংসপিণ্ড নিজস্ব স্পর্ধায় তুঙ্গশীর্ষ হয়ে প্রকৃত বয়েসের অনুমান ব্যাপারে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে।

নাইকীর কথার মাঝে নিনকী মেঝেন শিহরিত কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে, 'আই গ আই, ও মা গো, ঠাকুরজিউ সব হড়্কে দাল দেবে—মেরে ফেলবে সব মানুষকে ?'

'আঃ, হিজু হিজু, যা বলছি চুপ করে শোন তো!' বচনের উৎসে বাধা পড়তে নাইকী বিরক্ত। তারপর বলে, 'পাপ করলে ঠাকুরজিউ মেরে ফেলবে না? পাপ করার জন্যে কি হড়্দের নোয়াপুরীতে আনা হয়েছে ? তুই যে তিন

তিনবার আঙ্গির আপাঙ্গির হয়েছিস, অন্য হড়ের সঙ্গে আতো থেকে বেরিয়ে গেছিস, তার জন্যে তোকেও ঠাকুরজিউ দাল দেবে, তারপর নিয়ে গিয়ে ঈচকুণ্ডে ফেলবে। নরকে যাবি তুই! হুঁ তারপর—'

ঠাকুরজিউর কথা শুনে হড়্ সমাজে প্রবল আতঙ্ক। তারপর চতুর্দিকে সির্সিজাওই ঠাকুরজিউর পুজোর ধুমধাম পড়ে গেল। গানের সুরে স্তোত্রপাঠ। সীমসাণ্ডী বলি, আর ঘড়া ঘড়া পউর উৎসর্গ। ঠাকুরজিউর ক্রোধ দেখে সারা নোয়াপুরী যেন মুহূর্তের মধ্যে পাপ বিমুক্ত হানাপুরীতে পরিণত হল। পাপযুক্ত পৃথিবী পুণ্যময় স্বর্গভূমিতে রূপান্তরিত। ভয়ে ভক্তি, এ চিরদিনের কথা।

হড়ের ভক্তি দেখে ঠাকুরজিউর চিত্ত কিঞ্চিৎ প্রসন্ন, কিন্তু সমূহ ক্রোধ বিনষ্ট হয়নি। করুণা-প্রত্যাশী হড়্দের লক্ষ্য করে সে বলল, 'তোদের মধ্যে থেকে একজোড়া হড়্ আর কুড়ি এখান থেকে হারাঠায় চলে যা। সেখানে গিয়ে বুরু দান্দেরে থাকবি—পাহাড়ের গুহায়। তোদের দু-জনকে বাদ দিয়ে বাকি সকলকে আমি সেঙ্গেলদা নামিয়ে মেরে ফেলব। প্রবল অগ্নিবৃষ্টি হবে।'

বয়েসে যে বড় তারই সর্ব বিষয়ে অগ্রাধিকার, বাঁচার অধিকারও তারই বেশি। সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হড়্ আর কুড়ি হিহিরিপিপিরি আর খোজখামান ছেড়ে হারাঠা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। তারপর সির্সিজাওইর আদেশে সিঞচান্দো তপনদেবের সংহারী সেঙ্গেলদা। ভয়ংকর অগ্নিবৃষ্টি!

সাতদিন সাতরাত সৃষ্টিধ্বংসকারী তরল অগ্নিরাশি নোয়াপুরীর ওপর বর্ষিত হল। কেবলমাত্র হারাঠা পাহাড়ের গুহায় আশ্রিত নারী ও পুরুষের ঐ জুটি ভিন্ন সারা পৃথিবী এখন হড়্শূন্য। জীবজন্তু অথবা বিহঙ্গ পতঙ্গশূন্য। মহাশ্মশান নোয়াপুরী।

অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হতে ঐ হড়্ আর কুড়ি হারাঠার পর্বতগহ্বর থেকে বের হয়ে এল। হারাঠাই নোয়াপুরীর মারাং বুরু—বিশ্বের বৃহত্তম পর্বত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র জীবিত নারীপুরুষ পরম কৃতজ্ঞতাবশে ঐ মারাং বুরুর পুজো করল। মারাংবুরু তাদের বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছে, অবশ্যম্ভাবী মরণের হাত থেকে প্রাণ রক্ষা করেছে।

এবার সির্সিজাওই ঠাকুরজিউ ঐ যুগল হড়্ আর কুড়ির সুমুখে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করল, 'আমিই মারাংবুরু, হড়ের প্রথম ও প্রধান দেবতা।'

ভাণ্ডে মাঝি খুব ভক্তিভরে পুণ্যকথা শুনছিল, নাইকী কিঞ্চিৎ বিরতি দিতে সে প্রশ্ন করে, 'তারপর কি হল নাইকী—চেৎ হয়োয়া?'

মৃদু অথচ সগর্ব হাসি হেসে স্বরীন নাইকী প্রতিপ্রশ্ন করে, 'তুই তো না শুনেই চলে যাচ্ছিলি ?'

ডাণ্ডে মাঝির সর্বাঙ্গে গিদিচেঁড়ের অস্থিভূষণ বেজে ওঠে, বেপরোয়া কণ্ঠে পুরনো উত্তরটাই দেয় সে, 'আমার শেষ অবদি না শোনায় ভয় নেই, তবু উঠে যেতে পারি না, আনআরি যে ; হড়্ সমাজের নিয়ম ভাঙব কি করে ?'

ডাণ্ডে মাঝির কথা শুনে নিনকী মেঝেন কিশোরী কন্যার মতো খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে, সবার চকিত দৃষ্টি তার দিকে, কিন্তু কিছুই বলে না সে, বরং যেন আকস্মিক হাসির খেসারৎস্বরূপ মুখটা অধিকতর গম্ভীর করে নেয়, তারপর পাঢ়ানের কিনারা টেনে অনাবৃত বুকটা ঢাকা দেয়, আর বস্ত্রস্বল্পতার দরুন অপরটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেয় না কেউ।

কাহিনীর শেষাংশ বলতে আরম্ভ করে স্বরীন মুর্মু, 'তারপর থেকে হারাঠা বুরুর ঐ হড়্ আর কুড়ির আড্ডী আড্ডী সুখ। যত খাবার তত মদ আর ততই দু-জনের সব সময় এক সঙ্গে থাকা। তারা এক নিমেষও আলাদা হয় না। সারা দিনরাত একসঙ্গে থাকার জন্যে বুঢ়ীর অনেক কোড়া হল, আর অনেক কুড়ি। সেইসব কোড়াকুড়িদের অনেক অনেক কোডাকুডি হয়ে হারাঠা বুরু ছেয়ে ফেলল।'

নিনকী মেঝেন প্রশ্ন করে, 'কত কোড়াকুড়ি ?'

নাইকী একবার ভ্রূ কুঁচকে নিনকীর দিকে তাকায়, কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে চলে, 'তারপর একদিন ঠাকুরজিউ মারাংবুরু এসে হড়্দের কাছে ডেকে বলল, আমি হড়ের মধ্যে জেত তৈরি করব।'

অতঃপর মারাংবুরু রূপে ঠাকুরজিউর পুনরাবির্ভাব, সঙ্গে ভোজ্য বস্তু পূর্ণ কয়েকটি পাত্র। সেগুলি একটা শাল গাছের নিচে রাখার পর দেবতা মারাংবুরু সব হড়্দের কাছে ডাকল। পাত্রগুলির মধ্যে রাখা বস্তু সমূহ দেখতে পেল তারা। একটিতে পরম সুস্বাদু গৌ-জেল—গোমংস। একটাতে দাকা আর হাকো উতু—ভাত ও মাছের ঝোল, এবং শেষটিতে দাকা দুধ।

মারাংবুরু বলল, 'কোন্ পাত্রে কি আছে তা তোদের দেখানো হল। এবার সবাই এখান থেকে অনেক দূরে সরে যা। তারপর দৌড়ে এসে খাবারের পাত্রগুলো নেবার চেষ্টা কর। যে গোমাংস নেবে তার জেত্ সবচেয়ে উঁচু, তারপর যে দাকা হাকো নেবে সে তার পরের ধাপের হড়্। আর যে দাকা দুধ নেবে সে বাবর্ডে—বাভন।'

তিনবার আঙ্গির আপাঙ্গির হয়েছিস, অন্য হড়ের সঙ্গে আতো থেকে বেরিয়ে গেছিস, তার জন্যে তোকেও ঠাকুরজিউ দাল দেবে, তারপর নিয়ে গিয়ে ঈচকুণ্ডে ফেলবে। নরকে যাবি তুই! হুঁ তারপর—'

ঠাকুরজিউর কথা শুনে হড় সমাজে প্রবল আতঙ্ক। তারপর চতুর্দিকে সির্সিজাওই ঠাকুরজিউর পুজোর ধুমধাম পড়ে গেল। গানের স্বরে স্তোত্রপাঠ। সীমসাণ্ডী বলি, আর ঘড়া ঘড়া পউর উৎসর্গ। ঠাকুরজিউর ক্রোধ দেখে সারা নোয়াপুরী যেন মুহূর্তের মধ্যে পাপ বিমুক্ত হানাপুরীতে পরিণত হল। পাপযুক্ত পৃথিবী পুণ্যময় স্বর্গভূমিতে রূপান্তরিত। ভয়ে ভক্তি, এ চিরদিনের কথা।

হড়ের ভক্তি দেখে ঠাকুরজিউর চিত্ত কিঞ্চিৎ প্রসন্ন, কিন্তু সমূহ ক্রোধ বিনষ্ট হয়নি। করুণা-প্রত্যাশী হড়দের লক্ষ্য করে সে বলল, 'তোদের মধ্যে থেকে একজোড়া হড় আর কুড়ি এখান থেকে হারাঠায় চলে যা। সেখানে গিয়ে বুরু দান্দেরে থাকবি—পাহাড়ের গুহায়। তোদের দু-জনকে বাদ দিয়ে বাকি সকলকে আমি সেঙ্গেলদা নামিয়ে মেরে ফেলব। প্রবল অগ্নিবৃষ্টি হবে।'

বয়েসে যে বড় তারই সর্ব বিষয়ে অগ্রাধিকার, বাঁচার অধিকারও তারই বেশি। সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হড় আর কুড়ি হিহিরিপিপিরি আর খোজখামান ছেড়ে হারাঠা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। তারপর সির্সিজাওইর আদেশে সিঞচান্দো তপনদেবের সংহারী সেঙ্গেলদা। ভয়ংকর অগ্নিবৃষ্টি!

সাতদিন সাতরাত সৃষ্টিধ্বংসকারী তরল অগ্নিরাশি নোয়াপুরীর ওপর বর্ষিত হল। কেবলমাত্র হারাঠা পাহাড়ের গুহায় আশ্রিত নারী ও পুরুষের ঐ জুটি ভিন্ন সারা পৃথিবী এখন হড়শূন্য। জীবজন্তু অথবা বিহঙ্গ পতঙ্গশূন্য। মহাশ্মশান নোয়াপুরী।

অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হতে ঐ হড় আর কুড়ি হারাঠার পর্বতগহ্বর থেকে বের হয়ে এল। হারাঠাই নোয়াপুরীর মারাং বুরু—বিশ্বের বৃহত্তম পর্বত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র জীবিত নারীপুরুষ পরম কৃতজ্ঞতাবশে ঐ মারাং বুরুর পুজো করল। মারাংবুরু তাদের বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছে, অবশ্যম্ভাবী মরণের হাত থেকে প্রাণ রক্ষা করেছে।

এবার সির্সিজাওই ঠাকুরজিউ ঐ যুগল হড় আর কুড়ির সুমুখে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করল, 'আমিই মারাংবুরু, হড়ের প্রথম ও প্রধান দেবতা।'

ভাণ্ডে মাঝি খুব ভক্তিভরে পুণ্যকথা শুনছিল, নাইকী কিঞ্চিৎ বিরতি দিতে সে প্রশ্ন করে, 'তারপর কি হল নাইকী—চেৎ হয়োয়া?'

মৃদু অথচ সগর্ব হাসি হেসে স্বরীন নাইকী প্রতিপ্রশ্ন করে, 'তুই তো না শুনেই চলে যাচ্ছিলি ?'

ডাণ্ডে মাঝির সর্বাঙ্গে গিদিচেঁড়ের অস্থিভূষণ বেজে ওঠে. বেপরোয়া কণ্ঠে পুরনো উত্তরটাই দেয় সে, 'আমার শেষ অবদি না শোনায় ভয় নেই, তবু উঠে যেতে পারি না. আনআরি যে ; হড়্ সমাজের নিয়ম ভাঙব কি করে ?'

ডাণ্ডে মাঝির কথা শুনে নিনকী মেঝেন কিশোরী কন্যার মতো খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে, সবার চকিত দৃষ্টি তার দিকে. কিন্তু কিছুই বলে না সে, বরং যেন আকস্মিক হাসির খেসারৎস্বরূপ মুখটা অধিকতর গম্ভীর করে নেয়, তারপর পাঢ়ানের কিনারা টেনে অনাবৃত বুকটা ঢাকা দেয়, আর বস্ত্রস্বল্পতার দরুন অপরটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেয় না কেউ।

কাহিনীর শেষাংশ বলতে আরম্ভ করে স্বরীন মুর্মু, 'তারপর থেকে হারাঠা বুরুর ঐ হড়্ আর কুড়ির আড্ডী আড্ডী সুখ। যত খাবার তত মদ আর ততই দু-জনের সব সময় এক সঙ্গে থাকা। তারা এক নিমেষও আলাদা হয় না। সারা দিনরাত একসঙ্গে থাকার জন্যে বুঢ়ীর অনেক কোড়া হল, আর অনেক কুড়ি। সেইসব কোড়াকুড়িদের অনেক অনেক কোডাকুডি হয়ে হারাঠা বুরু ছেয়ে ফেলল।'

নিনকী মেঝেন প্রশ্ন করে, 'কত কোড়াকুড়ি ?'

নাইকী একবার ভ্রূ কুঁচকে নিনকীর দিকে তাকায়, কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে চলে, 'তারপর একদিন ঠাকুরজিউ মারাংবুরু এসে হড়্‌দের কাছে ডেকে বলল, আমি হড়ের মধ্যে জেত্ তৈরি করব।'

অতঃপর মারাংবুরু রূপে ঠাকুরজিউর পুনরাবির্ভাব, সঙ্গে ভোজ্য বস্তু পূর্ণ কয়েকটি পাত্র। সেগুলি একটা শাল গাছের নিচে রাখার পর দেবতা মারাংবুরু সব হড়্‌দের কাছে ডাকল। পাত্রগুলির মধ্যে রাখা বস্তু সমূহ দেখতে পেল তারা। একটিতে পরম সুস্বাদু গৌ-জেল—গোমংস। একটাতে দাকা আর হাকো উতু—ভাত ও মাছের ঝোল, এবং শেষটিতে দাকা দুধ।

মারাংবুরু বল্লল, 'কোন্ পাত্রে কি আছে তা তোদের দেখানো হল। এবার সবাই এখান থেকে অনেক দূরে সরে যা। তারপর দৌড়ে এসে খাবারের পাত্রগুলো নেবার চেষ্টা কর। যে গোমাংস নেবে তার জেত্ সবচেয়ে উঁচু, তারপর যে দাকা হাকো নেবে সে তার পরের ধাপের হড়্। আর যে দাকা দুধ নেবে সে বাবডেঁ—বাভন।'

এরপর ক্রমশ হড়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগল। নিজেদের জেত্ আর গোত্র নিয়ে আজ তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত। হড়্ কোনোদিন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসবাস করেনি। সারা নোয়াপুরী জুড়ে হড়ের সংসার। হড়ের সাম্রাজ্য। পৃথিবীতে হড়্ই আদি মানব। সর্বত্রই তার অগ্রাধিকার। কিন্তু হড়্ চলমান জাতি। হড়ের জীবনের অর্থ চলিষ্ণু ইতিবৃত্ত।

তিকিনবেরের সিঞচান্দো ধারতির মেরুদণ্ড অতিক্রম করে গেছে, নিদাঘ-সূর্য মাথার ওপর, স্বরীন নাইকীর পুরাণ-কথা শেষ হল। মারাংবুরুর উদ্দেশ্যে জোহার জানাল সবাই—সকৃতজ্ঞ প্রণতি।

তারপর পরবর্তী সূচীর প্রতীক্ষা।

দুই

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল দীঘল টুডু। কষ্টি পাথরের মূর্তির মতো স্থির। নির্বাক মূক দ্রষ্টা। আজকের অনুষ্ঠান তাকে কেন্দ্র করে। তারই চাচো ছটিহার। পরিপূর্ণ যৌবনের সামাজিক স্বীকৃতি। যৌব অধিকারের সার্বিক সমর্থন। আজ থেকে সে সমাজের একজন বিশিষ্ট হড়্। আর গিদরে পর্যায়ভুক্ত নয়, একজন দায়িত্বশীল্ ব্যক্তি। এবার থেকে সে মাঝিস্থানের সভায় বসে যে কোনো আলাপ-আলোচনায় নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকারী।

চাচো ছটিহারের জন্যে অবশ্য বিশেষ কোনো বয়ঃসীমা বাঁধা নেই, তবু বাপলার আগে তা অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় সে বিবাহ সামাজিক এবং ধর্মের দিক থেকে অসিদ্ধ।

আতোর প্রায় প্রতিটি হড়্ আজ ভোগন টুডুর অতিথি। সাত সকালে তার পক্ষ থেকে গিয়ে মারাংমোড়া, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্র গড়ম আতো মাঝি ভৈরবকে নিজেদের ওড়ায় ডেকে এনেছিল।

ভৈরব মাঝির দিকে কাঁসার জামবাটিতে এক পাত্র হাঁড়িয়া এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়ন করল ভোগন টুডু, 'ন্য মাঝি—এটা খেয়ে নে মাঝি।'

পাত্রে একবার মুখ ঠেকিয়ে অচিরে মুখ সরিয়ে এনে ভৈরব স্মিত ও কৌতূহলী হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে, 'চেৎ খোবর ভোগন মাঝি, সাত সকালে গড়ম গিয়ে আমায় তোর ওড়ায় ডেকে নিয়ে এল, কোনো সুখবর আছে নাকি?'

ওদিকে ওড়ার দাওয়ায় বসে গড়মের স্ত্রী বাহা একমনে কাঁচা শালপাতার দোনা তৈরি করছিল। ইতিমধ্যে শ-খানেক প্রস্তুত, একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি ধামায় সেগুলি স্তূপীকৃত।

মাঝির প্রশ্ন কানে যেতে বাহা তার লাবণ্যময়ী কৃষ্ণকলি মুখাবয়বে নকল গাম্ভীর্য ফুটিয়ে ভোগনের জবাব দেবার আগেই বলে ওঠে, 'আজ আমার শ্বশুরের ওড়ায় একজন নতুন হড়্ জন্ম নেবে, তারই ব্যবস্থা।'

'মানে?' হাঁড়িয়াপূর্ণ জামবাটির কানায় মুখ লাগিয়ে সুদীর্ঘ টানে তৃপ্তিপূর্ণ চুমুক দেওয়ার পর বাহার কাছে জবাব পাওয়ার আশায় ভৈরব মাঝি দাওয়ার দিকে চোখ পাতে।

কিন্তু ভৈরবের জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় না গড়মের যুবতী রিণিঃ বাহা কিস্কু। নিজের অজ্ঞাতেই সে যেন আচম্বিতে সবিশেষ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কিন্তু ত্বরিতেই সংবিৎ ফেরে তার। তারপর এই আকস্মিক বিমর্ষতার ভাব দ্রুত প্রচেষ্টায় মন থেকে মুছে ফেলার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। তা সত্ত্বেও তার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সবার অলক্ষ্যে যথাযথ চলতে থাকে।

ভৈরবের প্রশ্নের উত্তরে বাহাকে নিরুত্তর দেখে ভোগন নিজেই তার কথার জবাব দেয়। মাঝি এবং পুত্রবধূ উভয়কে শুনিয়ে হর্ষ এবং বিষাদমিশ্রিত গলায় সে বলে, 'আমি আর এ নোয়াপুরীতে কটা দিন আছি? এবার হানাপুরী থেকে আমার ডাক আসবে। মাঝি, তোর অনুমতি পেলে তালাকোড়ার চাচো ছটি-হার আমি আজই সেরে দি? তারপর তোরা একটা ভালো কুড়ি দেখে তালার বাপলার ব্যবস্থা করে দে। তবে আমি তালাকে কোথাও ঘরজামাই বা ঘরদিজামাই হতে দেব না।'

ঝোঁকের মাথায় বেশ জোর দিয়ে কথা বলে যাওয়ার পর ভোগন এবার দ্বিধাভরা স্বরে আশঙ্কা প্রকাশ করে, 'আমি তালার বাপলার কথা বলছি বটে, কিন্তু সে এ কালের গিদরে তো, বাপের কথা কি শোনে, হয়তো কোথা থেকে একটা ইতুত বাপলা করে যেমন তেমন কোনো কুড়িকে এনে আমার ওড়ায় তুলবে!'

ভোগন পরিবেশিত সংবাদের প্রথমাংশ সুখবর, বাকিটা তার ব্যক্তিগত চিন্তা। সুখবর শোনার পর ভৈরব মাঝি পচাইপূর্ণ বিপুলাকৃতি জামবাটি এক নিশ্বাসে শেষ করে পাত্রটা রাচায় নামিয়ে রেখে হাত বাড়ায়, 'মিত্‌টে চুটি আগুইম্যা, সেংগেল হ্যান—চুটি আর আগুন দে তো আগে! তালার চাচো

ছটিহার, আতোর সব হড়্ আর কুড়ি কোড়া মায়জিউদের তোর ওড়ায় ডাকিয়ে আনতে হবে তো ?'

একটা বিঘতখানেক মাপের কড়া তামাক ভরা চুটি আর মোটা কঞ্চিতে তৈরি করা চকমকির চোঙা ও আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম ভৈরব মাঝির দিকে এগিয়ে দিয়ে ভোগন টুডু জিজ্ঞেস করে, 'আতোর হড়্দের কাছে কে চাচো ছটিহারের সন্দেশ নিয়ে যাবে ; গোড়াইত নাইকী কুড়ম নাইকী, এরা সব আজ আতোয় আছে তো ?'

'দেখি গিয়ে কে আতোয় আছে আর কে নেই।' বলতে বলতে ভৈরব মাঝি উঠে দাঁড়ায়, ত্বরিত পদক্ষেপে কুটির-প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, 'তুই তৈরি হয়ে নে, আমি মিত্ ঘড়িতে সবাইকে চাচো ছটিহারের সন্দেশ শুনিয়ে জুটিয়ে আনছি।' এবং অতঃপর সে কতকটা নিজের মনেই সখেদে বলে, 'কিন্তু এ গোড়াইতকে দিয়ে আর চলবে না, শুধু মেয়ে শিকারেই ব্যস্ত, একে তাড়াতে হবে।'

কথাটা শুনে বাহা মেঝেন শ্বশুরের উপস্থিতির দরুন নতমস্তক গাম্ভীর্য ধারণ করে।

'বহু ?' ভৈরব মাঝি চলে যাওয়ার পর ভোগন টুডু বাহাকে কাছে ডাকল।

হাতের কাজ ফেলে দাওয়া ছেড়ে উঠে এল বাহা, শ্বশুরের অদূরে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু সলজ্জ হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'চেং বা—কি বলছিস বাবা ?'

'মারাং কোড়া আজ এরই মধ্যে কোথায় বেরিয়েছে, ভৈরব মাঝি ডেকে আনার পর সেই যে বেরুল, আমায় বলে যায়নি তো ?' বিরক্ত গলায় ভোগন প্রশ্ন করে।

জাওঞাই কোথায় বেরুচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে, বিশেষ কারণ না থাকলে বিগিঃ-কে তা জানিয়ে যাওয়ার রীতি হড়্ সমাজে নেই। গড়মও বাহাকে কিছু বলে-কয়ে যায়নি, যায়ও না কোনোদিন, তবু সে শ্বশুরের জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, 'একটু বেরিয়েছে, এখুনি এসে পড়বে।'

'আজকালকার গিদরে তো, বিগিঃকে বলে যাবে কোথায় যাচ্ছে, বাপকে নয়!' মন্তব্য করার পর বিরক্তিপূর্ণ মুখাকৃতি করে ভোগন চুটি ধরায়, তারপর মুখের ধোঁয়া বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রশ্ন করে, 'তাসাকোড়া কোথায় দীঘল ? নাকি সে-ও এখন চরতে বেরিয়েছে ? এ যেন আমারই চাচো ছটিহার,

আমিই আজ সাবালক হব, তারপর বাপলা করব!'

ওড়ার রাচা ঘেরা মেহেদী আর বেহায়া গাছের বেড়া, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বাহা মৃদু হাসে, তারপর উত্তর দেয়, 'তালাকোড়া তো নিজের কুঠলিতে।'

'তবু ভালা! তোর হানহাররা কোথায়?' প্রশ্ন করার পর ভোগন ঈষৎ সন্দেহময় দৃষ্টিতে বাহার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাহা মেঝেনের দুই শাশুড়ী, পরস্পরের সহোদরা, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বয়েসের বিপুল তফাত। কনিষ্ঠা খুব সম্ভব বাহার সমবয়সী। মাস তিনেক আগে তার প্রথম সন্তানের জন্ম। গর্ভাবস্থায় সহজ প্রসবের উদ্দেশ্যে বিবিধ বনজ ঔষধাদি সেবনের ফলে মরণাপন্ন বিপর্যয়; তারপর প্রাণে বেঁচেছে, কিন্তু পূর্বেকার স্বাস্থ্য এখনো ফেরেনি।

সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল ভেতরে ডাইনীর ক্রিয়াকলাপ, কিন্তু তিন ভিন্ গাঁয়ের তিনজন অভিজ্ঞ ওঝা সহমত্ না হওয়ায় সন্দেহবিদ্ধা ডাইনীটির শাস্তি বিধান সম্ভব হয়নি। ওঝার মন্ত্রশক্তি ও ওষুধপত্রের গুণে ভোগনের হপন রিণিঃ এখন রোগ ও মৃত্যুর আশঙ্কা বিমুক্ত, কিন্তু সংসারের ভারি কাজে হাত দেওয়ার উপযুক্ত হয়নি সে। আরও কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন।

বাহা সঠিক উত্তর দিতে চায় না, ভোগনের প্রশ্নের উত্তরে একটু ঘুরিয়ে বলে, 'হানহাররা কাজে ব্যস্ত।'

'কি কাজ?' ভোগনের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি গভীরতর হয়।

জড়িত গলায় বাহা বলে, 'তারা পোখরীতে দাঃ আনতে গেছে।

ভোগনের কণ্ঠস্বর ক্রোধে ফেটে পড়ে যেন, 'হপন রিণিঃও পোখরী থেকে দাঃ আনতে গেছে!'

শাশুড়ীদের পরিবর্তে বাহা নিজেই কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে, 'আজ তামা এরোয়েলের চাচো ছটিহার, অনেক জলের দরকার, তাই—'

মেজ দেওরের চাচো ছটিহার, বাড়িতে লোক সমাবেশ হবে, বেশি জলের প্রয়োজন, তবু হপন .রিণিঃ সেরালীর জল আনতে যাওয়া উচিত হয়নি। এরপর আবার হয়তো সে বিলম্বিত নিরাময়ের রোগ বাধিয়ে বসবে।

সেরালী যে স্বেচ্ছায় জল আনতে পুকুরে গেছে তা ভোগনের মনে হয় না। বড় সতীনের নির্দেশেই তার ইচ্ছে অনিচ্ছে ও কর্মতালিকা নিয়ন্ত্রিত। হড়্ সমাজের তাই নিয়ম। এ আনআরি এড়িয়ে যাবার সাধ্য সেরালীর নেই। এমন কি জ্যেষ্ঠা সতীনের অনুমতি ভিন্ন কনিষ্ঠার পক্ষে স্বামী মিলনও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

নিশিরাতে কনিষ্ঠাকে গ্রহণ করার বাসনা জাগলে ভোগনকে জ্যেষ্ঠা রিণিঃ রতনী মেঝেনের অনুমতি নিতে হয়। নিষ্প্রদীপ কুঠলির সুমুখে অন্ধকার ওসারা। মেঝেয় পাতা চাটাইয়ের ওপর জীর্ণ কন্থার শয্যা। অপরিসর জায়গা, মধ্যে ভোগন আর তার দু-পাশে দুই রিণিঃ। ডান দিকে বিগত-যৌবনা ও বাঁ দিকে পূর্ণযৌবন নারীদেহ।

স্বভাবতই ভোগনের সকাম চেতনা ও ভোগ-প্রবৃত্তি চুম্বক আকর্ষণে বারবার বাঁদিকে ঘুরে যায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই রতনী মেঝেন সেরালীকে স্পর্শের অনুমতি দেয় না।

'না, তোর বয়েস হয়েচে, এসবে বেশি টান থাকলে কোন্‌দিন তুই মাড়ি হয়ে যাবি; মরে যাবি।' এক ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করে রতনী মেঝেন।

কিংবা ঐ কনিষ্ঠার টোপে ভোগনকে উত্তেজিত করে তোলার পর আসল সুখটা রতনী মেঝেন নিজেই আদায় করে নেয়। অবশ্য মাঝে মাঝে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার মতো বিলম্বিত সময়ের ব্যবধানে ভোগনের বাসনা পূর্তির সুযোগ দেয় সে। তখন হয়তো তৃতীয় পক্ষ সেজে কিছুটা সাহায্যও করে, দুয়ের ক্রিয়া তিনের ক্রীড়াস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তবু খেলা শেষে ভোগন নিজেকে ঠিক পরিতৃপ্ত মনে করতে পারে না। সেরালী কখনো তৃপ্তি পেয়েছে কি না এমন অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করার সুযোগ সে অদ্যাপি পায়নি।

ভোগন ভাবে এই বিচিত্র আচারের মধ্যেও সে যে সেরালীর গিদরের আপাত হতে পেরেছে তাই সবিশেষ বিস্ময়। হয়তো সেরালীর ছেলের প্রকৃত পিতা সে নয়, কেবল সামাজিক নিয়মে পিতৃত্বের শিলমোহর দেবারই অধিকারী।

ঠিক এইরকম এ আতো আর ভিন্ গাঁয়ে হয়তো ভোগনের নিজেরও গুটিকয় কোড়া কুড়ি আছে, যেখানে অপর ব্যক্তিবর্গের পিতৃত্বের শিলমোহর। উদার হড়্ সমাজে কিছুই বেমানান অথবা খুব বেশি নিন্দনীয় নয়। পিতৃ-পরিচয়ের অভাবে কোনো সন্তান অবৈধ ঘোষিত হয় না। অনাথ নয় কেউ।

বাহা সুমুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, শ্বশুর অনুমনি দেয়নি যে এখান থেকে সরে গিয়ে আবার হাতের কাজ নিয়ে বসবে। অথবা অপর কোনো কাজ। একেবারে চুপ করে অলস বিলাসিতার মাঝে বসে থাকা তার ধাতে সয় না। আর এমন শিক্ষাও সে কখনো পায়নি। হড়্ সমাজের কোনো মেয়ে আয়াস-প্রত্যাশী নয়। বরং দল বেঁধে অথবা একা নিজের মনে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালবাসে তারা।

কি যেন চিন্তা করছিল ভোগন, বাহার দিকে নজর পড়তে তার মনে একটা ভাবনা উদিত হল, কতকটা উচ্চারণও করে ফেলেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তা মুখের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তালাকোড়া এখনো অবদি কুঠলিতে বসে কি করছে দেখে আয় তো? গিয়ে বল্, আজ তার বোচো ছটিহার, সারা আতোর হড়্ আর মায়জিউ এখুনি এসে ওড়ায় জমবে; এখানে এসে সে আমার কাছে বসবে।'

শ্বশুরের ফরমাশ শুনে নিয়ে বাহা সেখান থেকে চলে গেল।

বাহা মেঝেনের বয়েস সবে বিশটি সমঋতু ওপার হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে তার শরীরে কৈশোরের আবির্ভাব হয়নি। শৈশব উত্তীর্ণ হয়েই পরিপূর্ণ যৌবন অর্থাৎ খুব অল্প বয়েস থেকেই যৌবনের অভিজ্ঞতা লাভ। অবশ্য মেয়ে হিসেবে এ ব্যাপারে সে একাই কোনো ব্যতিক্রম নয়।

দশ বছর বয়েস থেকে বাহা আতোর কুমারী মেয়েদের সার্বজনিক গীতি-ওড়ায় নৈশবাস করতে গেছে। কাছেই আদড়া তরুণদের গীতিওড়া। রাতের অন্ধকারে অঙ্গস্রবার ঘোটুলের সভ্য-সভ্যারা নিজেদের শয্যা বিনিময় করেছে। কখন যে কে এসে বাহার পাশে শুয়েছে তার সঠিক হিসেব সে নিজেও জানে না।

স্পর্শ ও আচরণভঙ্গি পরিবর্তনে ব্যক্তি পরিবর্তন অনুভব করেছে বাহা। বাইরে থেকে ভেসে আসা ক্ষাণ চাঁদের আলোয় আবছা ছায়া-মূর্তিটাকে চিনতে পেরেছে, কিন্তু সর্বদা নয়। ঘোটুল প্রথায় গীতিওড়ায় আলো জ্বালার রীতি অথবা শয়নকালে কথা বলার নিয়ম নেই। শয়নের একমাত্র অর্থ আনন্দময় মৃত্যু-তুল্য সুখ সঞ্চয়। সে গীতি-সুখ, অর্থাৎ শয়ন-সুখের স্মৃতি বাহার জীবনে অসংখ্য, এবং প্রায় আশৈশব।

বিবাহিতা তরুণী বাহা মেঝেন নয়, তখন বয়েসের দিক থেকে কিশোরী কন্যা বাহা কুড়ি, সে সময়টা তার বাপের বাড়ির আতোর কুমারী মেয়েদের গীতিওড়ার কর্ত্রী সিন্দো বুঢ়ী বলেছিল, 'বাহা-মিসেরা, ভাইবোন বা এক গোত্রের সম্বন্ধ না থাকলে কোনো কোড়ার ভালবাসার ডাক কখনো এড়িয়ে যাবি না। মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষ নিতে আসে না দিতেই আসে। তার হাতের ছোঁয়ায় তোর এই হড়মহাটিং ভরা হড়মোয় সুন্দর একজোড়া মাংসের ফুল ফুটে উঠবে। সে তোকে সুখের স্বর্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তোর শরীরের যত লুকনো জায়গায় যখন তার অঙ্গের ছোঁয়া লাগবে সেইসব জায়গা থেকে আলাদা আলাদা করে

জীবন ফুটে বেরুবে। মনে হবে তোর একটা শরীরে যেন মিত্‌শাই জীউই রয়েছে —একশ'টা প্রাণ।'

বাহা কুড়ি তন্ময় হয়ে সিন্দো বুঢ়ীর কথা শোনে, সব ঠিক বুঝতে পারে না সে, বুঝলেও বিশ্বাস হয় না যেন, তাই প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'ত্যুৎ মিছে কথা— মেয়েরা আপনিই বড় হয়ে ওঠে।'

দন্তহীন মুখের মাড়ি বের করে সিন্দো বুঢ়ী ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে, তারপর অকস্মাৎ নিজের গা থেকে সমস্ত বস্ত্র ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, 'এই দেখ, আমার হড়মোয় আর আছে কিছু?' নিজের আমসী বুকে হাত ছুঁইয়ে বলে, 'নুনুদুটো শুকিয়ে গুটনো তামাক পাতা হয়ে গেছে।' তারপর শরীরের অন্যত্র হাত ঠেকায়, 'কোথাও কিছু নেই। কারণ এখন আর কোনো হড়্‌ আমায় ছোঁয় না। আবার যদি কেউ কখনো আমায় স্পর্শ করে তো দেখতে পারি এই মাড়ি দারে তাজা বাহায় বাহায় ভরে গেছে—ফুল ফুটেছে মরা গাছে।'

প্রকৃতির গুণে বাহা বড় হয়নি, পুরুষের হাতের স্পর্শ ও সেই দেহের মুগ্ধ আবেশময় পরিবেষ্টনে বার বার যাওয়ার সৌভাগ্যবশে তার এই যৌবনপুষ্ট কমনীয় তরুণী দেহ। বাপলার সময় জাওঞাই গড়ম তাকে ঠিক এই অবস্থায় পেয়েছিল। তার শারীরিক গঠন সৌন্দর্য গড়মের আয়াসের পুরস্কার নয়। বাহার স্মৃতিময় কৃতজ্ঞতা বাপের বাড়ির আতোর যুবকবৃন্দের প্রতি, যদিও তাদের অনেককেই সে এখন ভুলে গেছে।

শ্বশুরের আদেশ বয়ে নিয়ে বাহা মেঝেন তালাকোড়ার কুঠলির সামনে এসে দাঁড়ালে। ঘরের নিচু দরজা যেন চৌকাঠবিহীন গহ্বরের দু-পাশে দুটি পাল্লা আঁটা। বাতায়নের কোনো বালাই নেই। বিশেষ কারণ ভিন্ন কোনো হড়্‌ ঘরে শোয় না। কুঠলির সুমুখের ওসারাই শয়নাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাইরে আলোয় দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতরটা ঠিকমতো দেখা যায় না। বাহা দরজার এপার থেকেই সুরেলা গলায় ডাকে, 'অতে হো তালা—মেজ, ঘরে আছিস নাকি?'

কুঠলির ভেতর থেকে তালাকোড়া দীঘল টুডু সাড়া দেয়, 'আনজম ম্যা হিলি —কে বৌদি, ভেতরে আয়।'

'চেৎ চিকায়দা—কি বলছিস তুই?' বলতে বলতে বাহা দরজার আরও কাছে সরে এসে ঘরের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, তারপর বলে, 'বা' ডাকছে

তোকে।'

'চেং লগিং—কেন ?'

বাহা ঘাড় নাড়ে, 'ইঞ অকয় রড়ায়—আমি তার কি জানি ?'

বাহা মেঝেনের সমগ্র অবয়ব তালাকোড়ার চোখে সুস্পষ্ট, সেখানে অন্ধকারের অবরোধ নেই। বরং আরও কম আলো থাকলে স্বপ্নের প্রতুলতায় এ রূপ অধিকতর উদ্ভাসিত বোধ হত।

একটু ঝুঁকে দাঁড়ানোর জন্যে বাহার গায়ের উর্ধ্ববাস শিথিল হয়ে বুকদুটি উন্মোচিত। সেদিকে তার হুঁশ নেই। অবারিত অথবা অর্ধআবরিত বুকে ঘুরে বেড়ানোয় সামাজিক কিংবা সংস্কারগত নিষেধ নেই। পুরুষের অভ্যস্ত চোখের সামনে তাতে কোনো সংকোচও জাগে না। তবে সময়বিশেষে সেই দৃষ্টি যখন বিশেষ লোলুপ বা অর্থময় হয়ে ওঠে তখন যেন বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। তখনই কেবল পাঢানের স্বল্পপরিসরের মধ্যে সে দুটি আড়াল করার প্রচেষ্টা জাগে।

'বা' ডাকছে, যাচ্ছি, আগে তুই একবার ভেতরে আয় তো ?' বাহার দিকে ব্যগ্র চোখে তাকিয়ে থেকে দীঘল কথা বলে। তার গলার কাছটা হঠাৎ কেমন রসসিক্ত হয়ে যায়।

'কেন, কি দরকার ?' বলতে বলতে বাহা নিজের শরীর দুয়র নামের গহ্বরটার ভেতর দিয়ে কুঠলির মধ্যে গলিয়ে নিয়ে আসে। তার মাথায় গোঁজা পলাশের সতেজ গুচ্ছ দরজার কাছে খসে পড়েছে।

ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে যেতে বাহা দেখল তালাকোড়া এই অবেলায় পারকমে শুয়ে রয়েছে। হড়্ সমাজের কোনো পুরুষ সূর্যোদয়ের পর শয্যায় পড়ে থাকে না। মেয়েরাও না। সমর্থ মানুষের এ অনাচার অসহনীয়।

বিরক্তিমাখা গলায় বাহা বলে, 'সিঞচান্দো আকাশের মাঝখানে, আর তুই কোন্ লজ্জায় গীতি রয়েছিল তালা ? বা' জানতে পারলে এখুনি তোকে ওড়া থেকে বের করে দেবে।'

অভিযোগের উত্তরে তাচ্ছিল্যের হাই তোলে দীঘল, 'উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হয় সারাক্ষণই গীতি যাই—শুয়ে থাকি।'

এবার কণ্ঠস্বর একটু নরম করে বাহা প্রশ্ন করে, 'তালা, তোর রুগ্নঃ হয়েছে বুঝি, তাই এত বেলাতেও পারকম ছেড়ে উঠতে পারিস নি ?' জিজ্ঞাসা করার পর সে গায়ে হাত দিয়ে দেখবে বলে তালাকোড়ার আরও কাছে সরে আসে।

'সিঞ্চান্দো কোথায় এখন ?' বলতে বলতে দীঘল নিজেই বাহার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

বাহা সভয়ে ছিটকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করে, সেই সঙ্গে উত্তর দেয়. 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, সিঞ্চান্দো আকাশের পুনিয়া হাত ওপরে উঠেছে।'

'মাত্র চার হাত, আরও পাঁচ হাত উঠুক, তারপর আমিও পারকম ছেড়ে উঠব।' হাই তুলে দীঘল বলে, 'তারপর হঠাৎ খপ করে বাহার একটা হাত ধরে ফেলে সে, 'তুরুপ ম্যা, গীতি ম্যা—বস এখানে, না, শো একটু।'

আকর্ষণের আকস্মিকতায় বাহা দীঘলের বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। সিন্দো বুঢ়ীর ভাষায় পুরুষের হাতের ক্রিয়াকৌশলে পরিপুষ্ট তার যুগল বক্ষকুসুম একজন সবল পুরুষের বুকেই আশ্রিত এখন, তবু কণ্ঠস্বরে প্রতিবাদ এবং পরিপূর্ণ ভীতির আঁচ রেখে সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে পরোক্ষে আপাতত ওড়ার সম্পূর্ণ নির্জনতার কথাই বলে যেন, 'না না, এখন না, হানহাররা পোখরীতে দায় আনতে গেছে। তোর দাদাও বাইরে কোথায় গেছে, এখুনি সবাই ওড়ায় ফিরে এসে আমার খোঁজ করবে। এখন না, রাত্তিরে আসব।'

দীঘল অবিশ্বাসের স্বরে উত্তর দেয়, 'রাত্তিরেই বটে! রাত্তিরে তো তুই দাদার আদরের রিণি, তখন আমার কথা তোর মনে পড়বে ?'

বাহা প্রতিবাদের স্বরে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'মিথ্যুক কোথাকার, রাত্তিরে তোর কাছে কখনো আসিনি বুঝি. অন্তত মিত্‌শাইবার, কি মড়েশাইবার—একশ' বার, পাঁচশ'বার ?'

'সে দাদা ওড়ায় না থাকলে।' বাহাকে অন্যমনস্ক রেখে নিজের প্রয়োজনীয় ভঙ্গিতে শুইয়ে দিতে দিতে কথা বলে যায় দীঘল।

বাহা নীরব. আর উত্তর দেয় না কোনো. দীঘলের প্রয়াসে বাধা দিতে থাকে, হয়তো বা তারই নামান্তরে সমর্থন।

দীঘল আবার প্রশ্ন করে, 'দাদা ওকারে—কোথায় গেছে দাদা ?'

এবার মৃদু স্বরে মুখঝামটা দিয়ে কথার উত্তর দেয় বাহা, 'আমি কি জানি. আমায় কি বলে গেছে কোথায় যাচ্ছে ? হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে আগে থেকে কথা বলে রেখেছে, এখন সেই শিকারে বেরিয়েছে। আর এদিকে তার বয়হা তার রিণিংকে হাড়গাড়ের মতন ছিঁড়ে খাচ্ছে। নেকড়ে বাঘ যেন! যখন ছাড়া পাব হয়তো দেখব আমার গায়ের অনেক জায়গার মাংস নেই, হাড় বেরিয়ে রয়েছে, হড়ম হাটিংয়ের হড়মো!'

বাহার বিচিত্র ভৎসনায় উৎসাহিত। দীঘল নিজের শরীরটা বাহার দেহের ওপর প্রসারিত করে ফেলে, তারপর পুরুষের হাতের স্পর্শে স্ফজিত তার বুকের একটি কঠিন কোমল মাংসকোরকে তীক্ষ্ণ দাঁতের দংশন দিয়ে বলে, 'এবার তোকে জম যাই তাহলে, খেতে আরম্ভ করি ?'

'আই গ' আই—ও মা গো!' বাহা নিচু গলায় কাতরোক্তি করে, তারপর দীঘলকে সরিয়ে দেবার ছলনায় প্রবল বেগে নিজের শরীরের দিকেই আকর্ষিত করে নেয়। তার দুখানি ডুডৌল বাহুর বন্ধনে দীঘল বিজড়িত।

উৎসাহের আতিশয্যে দীঘল একসময় বলে, 'তোর মতন এত রূপ আশপাশের দশটা আতোয় কারো নেই।'

আবেশজড়িত স্বরে উত্তর দেয় বাহা, 'আমি কি জানি ?'

'তুই কি করে জানবি ?' দীঘল সমর্থন দিয়ে বলে, 'কোন্ মেয়ের শরীরে কতখানি রূপ সে তার বাপও জানে না, এমনকি সির্সিজাওই পর্যন্ত না। যে তাকে কাছে পায় সে-ই শুধু এ রূপের খোঁজ রাখতে পারে।'

'যাঃ!' এর বেশি বাহা বলতে পারে না, তার আবেশমুগ্ধ মৃদু বাক্শক্তিও এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নীরব সে। মূক!

ওড়া খালি, গড়ম বাড়ি নেই, বাহার দুই হানহারও না, তারা ডাণ্ডী থেকে জল আনতে গেছে। পাহাড়ী ঝর্ণা, দূরের পথ। ভোগন আর দীঘলকে বাহা মিছে বলেছে, ওরা পোখরী থেকে জল আনবে। হপন গ' সেরুলীর তিন-চার মাসের কোড়া দিগরে ওদিকের ছপরিতে ঘুমোচ্ছে। সে জেগে উঠলেও ক্ষতি নেই, কেঁদে কেঁদে নিজেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

হড়্ পরিবারে গিদরে কাঁদলেই তাকে কোলে তোলে না কেউ। বাচ্চা বয়েসে কেঁদে কেঁদে কোড়াম শক্ত করে, তারপর আস্ত বয়েসটাই তো সংগ্রামের জন্যে! বন জঙ্গল পাহাড়ের সঙ্গে সংগ্রাম, সংগ্রাম বন্য জন্তু আর চিরন্তন দুর্ভিক্ষের সঙ্গে, তার চেয়ে ব্যাপক কঠিন আর স্থায়ী সংগ্রাম দীকু নামের তথাকথিত সভ্য মানব সমাজের সঙ্গে, যারা প্রধানত হিন্দু, তারপর শ্বেত চর্মধারী পোণ্ড সাহেব, এবং তাদের বশংবদ কিছু মোগল, অর্থাৎ মুসলমান ব্যবসায়ী দারোগা ও সাজাওয়াল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। আর ওদিকে পাহাড়ীরা।

শুধুমাত্র ভোগন হাড়ামই ওড়ায় রয়েছে। যতই প্রয়োজন হোক তার, বহু তালাকোড়ার ঘরের দিকে গেছে জানার পর সে নিজে কখনো এ প্রান্তে আসবে না। গড়ম যদি ইতিমধ্যে ওড়ায় ফেরে এবং অনুমান করে রিণিঃ

এরোয়েল অর্থাৎ দেওরের কাছে রয়েছে, বাহা ফিরে না যাওয়া অবধি সে তার খোঁজ করবে না। একই নিয়ম হানহারদের সম্বন্ধেও। তারা বড়জোর দূর থেকে উঁচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে উপস্থিতি ঘোষণা করবে।

গড়মের কি এদরে হয়, মনে আড়িস জাগে, বাহা আজও এ প্রশ্নের জবাব পায়নি। মুখে কিছু বলে না সে। একা একা নিজের রিণিঃর আসঙ্গ ভোগ করবে, আর ডাণ্ডোয়া বয়হা সেই ওড়ায় বসে নিঃসঙ্গ যৌবনের দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, হুতাশায় দগ্ধ হতে থাকবে অবিবাহিত কনিষ্ঠ ভাই, সভ্য মানুষের মতো এমন স্বার্থপর আনআড়ি হুড়্ সমাজে আজও প্রবেশ করেনি। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী কনিষ্ঠ ভাইয়েরও ভোগ্যা, বিশেষত যতদিন সে অবিবাহিত।

গড়মের যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় বাহাকে বাপলা করার অগ্রাধিকার দীঘলের। কিন্তু ইতিমধ্যে সে বিবাহিত হয়ে পড়লে তবেই বাহার নববধূরূপে পরিবারের বাইরে যাওয়ার প্রশ্ন। তা সত্ত্বেও তখনো যদি দীঘল প্রস্তুত থাকে, এবং তার রিণিঃ সম্মতি দেয়, তাহলে বাহাকে দীঘলেরই রিণিঃ হতে হবে, কিন্তু মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে প্রথমার নিচে। এমনকি তার অনুমতি বিনে বাহাকে দীঘল স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।

বাপলা না হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত কনিষ্ঠ ভাইয়ের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর ওপর দাম্পত্যবিধিময় অধিকার, অবশ্য তা পতিত্বের সমতুল নয়। এবং সে অধিকারের প্রয়োগ বিশেষ প্রত্যক্ষ ও সর্বজনবিদিত হওয়াও অনুচিত।

এর দুটি কারণ, দেওরের প্রতি ভ্রাতৃবধূর পক্ষপাতিত্ব অধিক হলে সংসারের ভাঙন অবধারিত, এরোয়েল হয়তো হিলিকে নিয়ে আঙ্গির আপাঙ্গির হবে; ওড়া আর আতো ছেড়ে উধাও!

দ্বিতীয়ত হিলি ও এরোয়েলের প্রণয় দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমি নয়, তাতে অভিসারের সর্তরক্ষা ও জৈবিক প্রবৃত্তির ওপর মাধুর্যের আবরণ দেওয়া প্রয়োজন। এ আবরণ কখনো ঘোচাতে নেই। গোপনে হিপিরি; সবার অজ্ঞাতে এবং অলক্ষ্যে দেখাসাক্ষাৎ, আসঙ্গ সহবাস; তারই স-ইতে চারিদিক মঞ্জু হয়ে উঠবে। প্রণয় সুবাসে ম-ম করবে হড়ের ওড়া, আতো, আর তাদের নিজস্ব উদার ও সরল সামাজিক পরিবেশ।

একটু শ্বাস ফেলার অবসর পেতে অস্পষ্ট সুখদ স্বরে বাহা বলে, 'তালা, তুই একেবারে নষ্ট হয়ে গেছিস, এই শ্বেতাংবেরে কেউ কি এমন কাজ করে? লোকে

জানতে পারলে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না. ডাভিতে গিয়ে ডুবে মরতে হবে।'

নিজের মুখ দিয়ে বাহার কথা-বলা মুখ চাপা দেয় দীঘল, তারপর বুকের চাপ তার বুকের ওপর আরও ঘন এবং প্রায় শ্বাসরোধকারী করে তোলার পর মুখে মুখ রেখেই আবেশমুগ্ধ গলায় জবাব দেয়, 'চুপ কর্, এখন কথা বলতে নেই। আজ আমার চাচো ছটিহার. তোকে সারাটা দিন খুব খাটতে হবে, হয়তো মুখ ব্যাজার করে থাকবি, তাই আগাম মজুরী দিয়ে রাখছি। আড্ডী আড্ডা রাঙ্ক— অনেক অনেক সুখ।'

দীঘলের ওষ্ঠবন্ধন থেকে কোনোমতে মুখ সরিয়ে এনে বাহা বলতে যায়, 'এ সুখের দরকার নেই আমার। আমার জাওঞাই আছে, আমি রাণ্ডি নই—স্বামী আছে আমার, আমি বিধবা নই। তোর মতন অন্যের গাছের ফুলের মধু খেয়ে বেড়ানো হড়্—'

এবার আর মুখ দিয়ে নয়, বাহার পিঠ ও ঘাড়ের নিচে থেকে একটা হাত সরিয়ে এনে দীঘল আবার তার মুখ চাপা দেয়. 'আলপে রপড়া কুডাইদ এমাপে কানগে আইঞ—আঃ, চুপ করে থাক্ তো, মিছে তর্কাতর্কি করিস না।'

এরপর দীঘল বাহাকে আর বহুক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে দেয় না। অবশ্য মুখ ফুটে কথা বেরুবে এমন অবস্থাও সে বাহা কিস্কুর রাখে না। বাহা কিস্কুই. টুডু নয়। বাপলার পর হড রমণীর পদবী পরিবর্তন হয় না।

বাহা কিস্কু নিশ্চুপ এখন, দীঘল টুডুর বাচনিক শাসনে. এবং নিজের দেহের মূল কেন্দ্রে প্রাণসঞ্চারজনিত সুখে। যে প্রাণের কথা একদা সিন্দো বুঢ়ী তাকে বলেছিল. সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। এখন অবশ্য বিশ্বাস করে, কিন্তু আজও পরিপূর্ণ উপলব্ধির আগে কেমন যেন ঘুম এসে যায়। নিদ্রাপুরীর স্বপন-পরীরা এসে চতুর্দিকে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। তাকেও এক চিরবিস্মৃতির জগতে তুলে নিয়ে যেতে চায়। এমন কত অসংখ্যবার সে উড়ে গেছে, তবু মনের আশ মেটে না! প্রতিবারই উপলব্ধি হয় যেন নতুনের স্বাদ।

নিজেও দীঘল নির্বাক মুহূর্ত যাপন করে। তারপর সুগভীর ও সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ছোট্ট কুঠলিটা ভরিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। এসব পর্ব সাগ্রহ নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্জাপন করে বাহা কিস্কুর শরীরের ওপর থেকে উঠে পড়ে ক্লান্ত হাসি হেসে সে সকৌতুকে প্রশ্ন করে, 'নিতঃ দ পে কুসিএনা—এবার বেশ সন্তুষ্ট হলি তো?'

'লাজাও দ বাম্ব আমা; লজ্জা শরম তো তোর নেই!' যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব পারকম ছেড়ে উঠে পড়ে বাহা মেঝেন। নগ্ন তন্বী! পঞ্ছি আর পাড়াল ঘরের মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত হাতে নিজের শরীর ঢাকে সে।

ওদিকের আঙিনায় দাঁড়িয়ে মারাং গ' রতনী মেঝেন ডাকছে; দীঘলের মা, বাহার জ্যেষ্ঠা শাশুড়ী, 'অতে বহু ওকারে—ওরে বউ, কোথায় গেলি তুই?'

পরিধেয় অঙ্গে তুলে গোবরমাটি নিকনো কুঠলির মসৃণ মেঝের ওপর দাঁড়িয়েছিল বাহা মেঝেন, মনে ক্ষীণ আশা, এবং যা প্রায় নিয়মিত, দীঘল একবার হাত বাড়িয়ে আবার তাকে কাছে টেনে নেবে, খাটিয়ার ওপর নিঃসাড়ে পরস্পরের দেহের সঙ্গে বিজড়িত অবস্থায় তারা পড়ে থাকবে কিছুক্ষণ, কিন্তু মনে হবে এ যেন অনন্তকালের বিশ্রাম মুহূর্ত, তারপর সে ধীরে ধীরে পারকম ছেড়ে উঠে কুঠলি থেকে বেরিয়ে যাবে, শরীরে যখন অসংখ্য প্রাণের অনুভূতি, সেই প্রাণগুলো সে সংসারের বিভিন্ন কাজে ছড়িয়ে দেবে, কিন্তু দেহ অথবা মনে একটুও শ্রান্তির ছোঁয়া লাগবে না, মনে হবে শুধু কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকাই হড়ের প্রকৃত জীবন, কর্মসূচীর বাইরে অস্তিত্ব নেই তার, অলসের কোনো সামাজিক পরিচয় নেই।

কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না, শাশুড়ীর ডাক শুনে পুত্রবধূ বাহা মেঝেনকে ত্বরিত অথচ সুরেলা গলায় উত্তর দিতে হল, 'আই গ', ইঞ নন্তে—ও মা, এখানে আমি, তালাকে বলতে এসেছি আজ তার চাচো ছটিয়ার, ওডায় অনেক হড় আর মায়জিউ আসবে, নাইকী ধরম কথা শোনাবে, তাড়াম তাড়াম তৈরি হয়ে রাচায় গিয়ে বসতে। খুব তাড়াতাড়ি!'

কথা শেষ করে বাহা মেঝেন অভ্যস্ত ত্বরিতে মাথা ঝুঁকিয়ে কুঠলির নিচু দরজা পার হয়ে বেরিয়ে আসে, তারপর ছুটে ওদিকের আঙিনায় চলে যায়। ওখানে গিয়ে পৌছবার পরমুহূর্ত থেকে আর অবসর নেই। দুপুর বিকেল সন্ধ্যে কখন শেষ হয়ে যাবে তা টেরও পাবে না সে!

॥ তিন ॥

আরও খানিকক্ষণ খাটিয়ার ওপর পড়ে রইল দীঘল। বাহা চলে যাওয়ার পরও এই অপরিসর পারকমে তার উপস্থিতি যেন অশরীরী অবস্থায় রয়েছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না, তাই পাশে অনেকখানি জায়গা খালি। দৃশ্যত নেই, কিন্তু স্মৃতির স্পর্শে দীঘলের দেহে মুহুর্মুহুঃ আবেশময় শিহরণ জাগছে।

কুঠলির কাছে এসে মারাং গ' রতনী মেঝেন বাইরে থেকে ডাকল, 'অতে

তালাকোড়া—ওরে মেজখোকা ?'

'চেৎ চিকায়দা—কি বলছিস ?' শ্রান্তিমাখা বিরক্তির সঙ্গে দীঘল সাড়া দেয়, তারপর পাশ বদলে শোয় সে।

মারাং গ' বলে, 'এখনো শুয়ে কেন তুই, এবার বাইরে রাচায় গিয়ে বস ? আতোর হড় কুড়ি মায়জিউ সব ওড়ায় জুটতে আরম্ভ করেছে, জামঞ্‌য় হবে, খাবেদাবে তারা।'

কপট অস্বস্তি ও অস্থিরতা দেখিয়ে দীঘল মা-র নির্দেশের পাশ কাটাবার চেষ্টা করে, 'রুয়ঃ হয়েছে আমার, আড্ডী রাবাং কানায়—আমার জ্বর হয়েছে, ভয়ানক শীত করছে।'

হাসবে না ভেবেও মারাং গ' হেসে ফেলে, থালি ওড়ায় উপযুক্তভাবে সময়াতিপাতের সুযোগ বহু আর তালাকোড়া যে পুরোমাত্রায় তুলে নিয়েছে, শেতাঃবের কি তালাঞ্জিদা, দিন দুপুর অথবা মধ্যরাত, সে বিবেচনা অবধি না করেই, ওড়ার রাচায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটুকু বুঝে নিতে দেরি হয়নি তার।

মারাং গ' রতনী মেঝেনেরও বয়েস ছিল, বাহার তবু একটা এরোয়েল, আর তার চারটি। বাপলার পর এখন সবাই তারা ভিন্ন। এমনকি থাকেও অন্য আতোয় ঘোর সংসারী তারা। রিণিঃ কোড়াকুড়ি নিয়ে ওড়া বোঝাই। তাদের কারো একটি রিণিঃ, কারো বা একাধিক।

নিজেদের বাপলার আগে ঐ চারটি ডাঙোয়া এরোয়েলের হাতে রতনী মেঝেনের অবস্থা বায়োয়ারি সম্পত্তির মতো। হড় সমাজের বধূ পারিবারিক সম্পদ, যেমন ঐ বন জঙ্গল আর ঝর্ণার জলে আতোর সবারই অধিকার! বয়েসে বড় গৌরব এবং অপরাধে ভোগন মুখ বুজে বসে থেকেছে। এ ব্যাপারে ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিজের মুখ হাসায়নি! স্বার্থপর অপবাদ কেনেনি। এমন দিনও গেছে স্বামী নিয়ে পাঁচজনকে পরিতৃপ্ত করেছে রতনী মেঝেন। পাঁচ ভাইকে এক পারিবারিক বাঁধনে বেঁধে রাখার জন্যে আতোর সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অবশ্য জানা কারণটা মুখ ফুটে আলোচনা করেনি কেউ।

মারাং গ' ঘরে ঢোকে, প্রথমটা চোখে অন্ধকার, নিমেষের মধ্যে দৃষ্টি সইয়ে নিয়ে তালাকোড়ার পারকমের কাছে এসে দাঁড়ায় সে। তারপর তার হাত ধরে টেনে তুলতে যায়, 'ওঠ্ এবার, চাচো ছটিহার হয়ে গেলেই তোর বাপলা দেব। ডাঙোয়া কোড়ার বাপলা না হলে গায়ের রুয়ঃ ঝরে না, জ্বর যায় না; কিন্তু চাচো ছটিহারের আগে কি বাপলা দেওয়া চলে ? না, চাচো ছটিহারের আগে কোনো

হড়্ মাঁড়ি হলে আনআরি মেনে তার সৎকার হয়? চাচো ছটিহারের পরেই তো গিদর পুরোপুরি হড়্।'

দীর্ঘ আড়মোড়া ভেঙে দীঘল পারকম ছাড়ে। পরনের কিচরিতে কাছা দিয়ে কুঠলির বাইরে এসে দাওয়ার কোণে মাটির পাত্রে রাখা পরিষ্কার টল্‌টলে জলের কাছে উবু্ হয়ে বসে পড়ে সে। তারপর মুখ নিচু করে জলের বুকে ছায়া ফেলে চুলের ঝুঁটিটা কাঠের নাকি চালিয়ে সুবিন্যস্ত করে নেয়।

এই সুন্দর ঝুঁটি আজ দীঘলের মাথায় থাকার কথা নয়। কিছুদিন আগে এটাকে রক্ষা করতে সে বিদ্রোহী হয়েছিল। বিদ্রোহ সামাজিক ব্যাপারে। এবং তুচ্ছ প্রসঙ্গে। কিন্তু এটি ছাড়াও অনেক বিষয়ে আজকাল তার মাথা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়।

বাপ ভোগন খুবই রাগ করে, কড়া শাসনের ভয় দেখায়, আবার কখনো সখনো ঠাট্টা করে বলে, 'এ গিদরে তো সব ব্যাপারে গোলমাল বাধাবেই, সিধু কানহুর চেলা যে!'

আবার মারাং গ' রতনী মেঝেন ছেলের অনাচারের দরুন বকাবকি আরম্ভ করলে ভোগনই সামাল দেয়, 'ছেড়ে দে, কিছু বলিস না, এরা যে আজকালকার গিদরে। বাপলা হোক, নিজেদের গিদরে হোক, তখন দেখবি আবার পুরনো রাস্তা ধরে চলেছে। এমন বেয়াড়াপনা আমরাও কত করেছি!'

ভোগন টুডুর দ্বিতীয় পক্ষ, গড়ম আর দীঘলের হপন গ' মেরালী হাঁসদার বাপলা হয়েছে বছর তিন, আর মাত্র মাস তিনেক আগে সে একটি কোঁড়া গিদরের জন্ম দিয়েছে। ছেলেটি তালাকোড়া দীঘলের সৎ ভাই, সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে তার ডাকনাম হপন কোড়া, সংক্ষেপে হপন। আর একটি নাম ডাট্টো।

হপনের জন্মের পঞ্চম দিনে তার জনম ছটিহার পালিত হয়েছে। হড় পরিবারে গিদারের জন্ম মানে সারা আতোর পাঁচদিনের অশৌচ।

পঞ্চম দিন শ্বেতাঃবের থেকেই ভোগনের ওড়ায় ভিড়। আতোর হড়্‌বৃন্দ কুড়ি আর মায়ঝিউ ওড়ার রাচায় এসে জমেছে। প্রাঙ্গণের একদিকে যত হড়্ সারি দিয়ে বসেছে, আতোর নাপিত তাদের মস্তক মুণ্ডন করছে। সামাজিক মর্যাদানুযায়ী সর্বপ্রথম আতো নাইকী, তারপর কুড়ম নাইকী, মাঝি, নবজাতকের পিতা এবং তার পরিবারের পুরুষবর্গ। সে ক'জনের পর অপরাপর হড়্।

গড়মের মস্তক মুণ্ডন শেষ হলে ভোগন হাঁক পাড়ে, 'অতে তালাকোড়া,

তালা ওকারে ? ওরে তালাকোড়া, কোথায় গেলি রে তুই ?' ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত তাকায় সে।

ওড়ার দাওয়া থেকে কর্মব্যস্ত বাহা নেমে আসে, শ্বশুরের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'তালা ওড়ায় নেই।'

'কোথায় গেছে তবে ?' ভোগন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'সে পালিয়েছে।' অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাহা নরম হাসি হেসে বলে,

বিস্মিত ভোগন প্রশ্ন করে, 'কেন ?'

বাহা মেঝেনের অধরোষ্ঠে ক্ষীণ হাসির শ্যাম বিদ্যুৎরেখা, সে নতস্বরে উত্তর দেয়, 'মাথা মোড়াবে না বলে।'

অপরিসীম রাগত কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে ওঠে ভোগন, 'কি বললি, গিদরে হড়ের আনআরি মানবে না, তাকে আমি তুপুঞ করব, শালগাছের সঙ্গে বেঁধে তীর গেঁথে মেরে ফেলব।'

প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে উপস্থিত বছর তিরিশ বয়েসের কানহু মাঝি। দীঘলের আগমন সাপেক্ষে নিজের মাথাটা সে নাপিতের ক্ষুরের নিচে সমর্পণ করেছিল, হাত দিয়ে নাপিতের সেই ক্ষুরধরা হাতটা সরিয়ে মুখ তুলল সে, 'নাইবা মাথা মোড়াল, তাতে কি দীঘল বা তার বাপের জেত্ চলে যাবে ?'

ভোগন রাগত স্বরে প্রশ্ন করে, 'তবে তুই বা কেন মাথা মোড়াতে বসে গেলি ?'

নাপিতের হাতখানা আবার নিজের মাথার দিকে টেনে নিয়ে মুখভর্তি হাসি হেসে কানহু জবাব দেয়, 'ওঃ, আমার মাথায় যা সীঃ হয়েছে—বড্ড উকুন।'

ভোগন আর কানহুকে ঘাঁটাল না। এদের সবকটি ভাই বিশেষ উগ্র স্বভাব। সিধু কানহু ভৈরব আর চান্দো কেউ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু কি একটা গুণ আছে যেন, তাই ভয়ের সঙ্গে সমীহ না করে উপায় নেই।

আতোর বিপদে আপদে কানহু ভ্রাতৃবর্গই প্রধান সহায়। বিশেষত সে বিপদ যখন দীকু মহাজন অথবা থানার দারোগা দ্বারা আনিত। সবার আগে ভাইকটি এগিয়ে যাবে, তখন নিজেদের মাথা বা প্রাণের দাম তাদের স্মরণ থাকে না।

তবে তারা বিশ্বকুঁড়ে। গতর খাটিয়ে অন্ন সংস্থান করতে চায় না। সেদিক থেকে হড়্ নামের কলঙ্ক। জমিজিরেত কিছু আছে যা অধিকাংশ সময়ে পতিত থেকে যায়। আতোর হড়্রা যখন মহাসমারোহে শিকার যাত্রা করে ওরা কাছে এসে মস্করা করে। শিকারীদের সঙ্গ দেয় না।

যদিবা শিকারে যায় জঙ্গল ঘেরির সময় সহযোগিতা করবে না কিছুতেই। কাঁড়বাঁশ বা বর্শা চালাতে খুবই দক্ষ তবু সামনে দিয়ে বুনো শুয়োর হরিণ কিংবা চিতাবাঘ ছুটে গেলেও দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবে, অস্ত্রে হাত ঠেকাবে না কখনো। তাই ওদের দুঃখ কোনোদিনই ঘোচে না, বছরের অধিকাংশ সময়েই ছপরির ওপর খড় থাকে না। বর্ষাবাদলের দিনে আতোর মাঝিস্থানে গিয়ে চাটাই বিছিয়ে ঘুমোয়।

এ ধরনের অলস ও অকর্মা পুরুষের হড়্ সমাজে স্থান নেই। হড়্ মানে উদয়াস্ত পরিশ্রম, হড়্ মানে মাটি জঙ্গল আর ক্ষেতখামারের সঙ্গে দিবারাত্রি এক হয়ে থাকা, হড়্ মানে শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে বার্ধক্যের অন্তিম দিন অবধি মুখের রক্ত তুলে মহাজনের কাছে পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ দেওয়া ; কিন্তু ওরা এর কোনোটাই করে না। সেইজন্যে জন্মসূত্রে হড়্ হয়েও পরিচয়ের দিক থেকে হড়্ নয়।

তবে দীকু মোগল পাহাড়ী বা শাদা সাহেবও নয় তারা ; বরং ঐ কটি জাতের ঘোর বৈরী। মনে হয় সুযোগ পেলে তাদের একটিকেও তারা দুনিয়ার মাটিতে টিকে থাকতে দেবে না।

প্রকৃতিতে হড়্ না হলেও হড়ের একটি বিশেষ গুণ তাদের আছে ; প্রচণ্ড ক্রোধ, তবু মনে আনন্দের অভাব নেই। স্বল্প আহার ও অপ্রতুল আরামেই তুষ্ট, মুখের হাসি সহজে নেভে না। বাঁশী আর মাদল বাজিয়ে তারা দামিনের আতোয় আতোয় ঘুরে বেড়ায়, হড়্দের কাছে গিয়ে বলে, হড়্ একদিন ধরত্তির রাপাজ ছিল, আজও সে মনেপ্রাণে রাপাজ, হড়্ স্বাধীন, হড়ের মাথার ওপর আর কোনো রাপাজ নেই। সত্যি বলতে আচরণে হড়্ না হলেও তারা হড়কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাতে ফাঁকি নেই। সে অনুরাগে তিলমাত্র কার্পণ্য নেই।

ধাত্রী নীতু মেঝেন পাঁচদিনের গিদরে কোলে নিয়ে ওড়ার একটা কুঠলি থেকে বেরিয়ে এল। তার এক হাতে দুটি শালপাতার দোনা ; ছিদ্রহীন গঠন। একটি জলপূর্ণ, অপরটি শূন্য। শিশুর মস্তক সদ্যমুণ্ডিত। নীতু মেঝেনের পেছন পেছন নাপিতও কুঠলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাঙ্গণে দাঁড়াল। তার হাতে শিশুটির কর্তিত চুল। চুলের দলাটা নীতু মেঝেনের হাতের শূন্য পাত্রে রেখে দিয়ে অপর পাত্রটির জল নিয়ে সর্বসমক্ষে গিদরের মাথা ধুইয়ে দিল সে।

নবজাতকের নামকরণ আজই, ভৈরব মাঝি প্রশ্ন করে, 'কোড়া গিদরের ঞুতুম কি রাখা হচ্ছে ?'

ভোগন উত্তর দেয়, 'মূল নাম কিচর, কিচর আমার এক কাকার নাম, শিকার পর্বের সময় গিদরেকে তোরা কিচর বলে ডাকবি।'

'তা বেশ,' মাঝি ঘাড় নাড়ে, 'কিন্তু ওড়ার মায়জিউরা তো মূল নামে ডাকতে পারে না, তার জন্যে ভানা নামও একটা দিতে হবে?'

'ভানা ঞুতুম ভেবে রেখেছি', কেবলমাত্র মাঝি নয়, আরও অনেকের দিকে তাকিয়ে এবং অবশেষে নীতু মেঝেনের কোলে নবজাতক পুত্রের মুখের দিকে ঈষৎ সংকুচিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মুখে ফিকে হাসি নিয়ে ভোগন উত্তর দেয়, 'ভানা ঞুতুম ডাট্টো, গিদরে মুখে মিত্‌জোড় ডাট্টা নিয়ে নোরাপুরীতে এসেছে কিনা! আর এটাই তো আমার সবচেয়ে ছোটকোড়া, তাই ওড়ার সবাই হপন-কোড়া বলে ডাকবে।'

'ডাট্টো গিদরে!' সুরীন নাইকীর সদ্যমুণ্ডিত মস্তকের ত্বক পর্যন্ত আশঙ্কায় ঘর্মাক্ত ও শিহরিত হয়ে ওঠে, 'এ গিদরে আপাত আর ইঙ্গাৎকে খাবে। বাপ-মা দু-জনেই মরে যাবে। পেটে আসতে তো গ'র ডান লেগে গিয়েছিল। আই গ', কম মেহনৎ করে কি ডান ছাড়িয়েছি?' তারপর নাপিতের দিকে তাকিয়ে আদেশ দেয় সে, 'নরুন দিয়ে খুঁচিয়ে গিদরের ডাট্টা দুটো এখুনি তুলে দে, এ নিশ্চয়ই ডানের কাজ, দাঁত তোলার পর বাদবাকি বিধ করতে হবে।'

কানহু মাঝির বড় ভাই সিধু টিপ্পনী কাটে, 'না, শুধু ডাট্টা নয়, ক্ষুর দিয়ে গিদরের গলাটাও কেটে দে, তারপর ক্ষুরটা আমার হাতে দে, আমি গিদরের বাপের গলায় চালিয়ে দি, কেন ডাট্টা গিদরের জন্ম দিয়েছে ও! বুড়ো হাড়াম মিত্‌দিন পরে ধরতি ছেড়ে হানাপুরীতে যাবি, এখনো তোর বেঁচে থাকার শখ?'

সুরীন নাইকী সরোষে বলে ওঠে, 'চেং মাগিৎ সিধে,—কেন তুই এমন করছিস?'

সিধুর পরিবর্তে অপর এক ভাই ভৈরব বলে, 'এবার উঠে গিয়ে কুলাকোড়ার মুখে মারব এক লাথি।'

সর্বকনিষ্ঠ ভাই চান্দো বলে, 'মারব মারব কেন, আমিই ওকে মারছি।' কথাটা বলার পর সে তীরবেগে উঠে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় ভাই কানহু চান্দোর হাত ধরে বসিয়ে দেয়, 'বার বার বলেছি না তোদের, আমি কাটিংচুলুং মারধোর পছন্দ করি না। অল্প বিস্তর নয়, মারতে যদি হয় নাইকী আর ভোগন হাড়ামকে ধরে তুপুঞ কর্, তীর বিঁধে মেরে ফেল্,

তাতে আমার পুরো সায় আছে। এই হাড়াম হাড়গারগুলো না মরলে হড়্ সমাজের উন্নতি নেই, এরা সব দীকুদের পোষা সেতাঃ—পা-চাটা কুকুর! তাদের দেখে যত অনাচার শিখেছে।'

এরপর মুহূর্ত কয়েক গভীর নীরবতা, যেন এতগুলি মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রাঙ্গণে ঘোর শূন্যতা বিরাজ করছে।

শেষ পর্যন্ত অস্বস্তির ঘোর কাটাবার জন্যে গৃহকর্তা ভোগনই পুরনো সূত্র টেনে কথা বলে, 'গিদরের জন্মের আগে ওর ইঙ্গাৎ ওঝার ওষুধ খেয়েছিল, সেদিক থেকে ভোগন ওঝার নামেই নাম রাখা উচিত, কিন্তু বাপ আর ছেলের তো একই নাম হতে পারে না?'

গিদরে পেটে আসতে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেরালী মেঝেন। শরীর রক্তশূন্য, ঠিক যেন ডাইনী তার রক্ত চুষেছে। খাওয়া-দাওয়ায় ঘোর অরুচি। এমন কি পোয়াতী অবস্থায় মেয়েরা যে আম আর পেয়ারা গাছ খুঁজে মুইঃবেলে, অর্থাৎ কাঠ পিঁপড়ের কাঁচা ডিম খেয়ে মুখের রুচি ফিরিয়ে আনে, জ্যেষ্ঠা রিণিঃকে লুকিয়ে ভোগন তা সংগ্রহ করে এনে দিলেও সেদিকে তাকিয়ে দেখত না সে।

'তা ঠিক!' ভোগনের কথায় সায় দেয় আতো মাঝি ভৈরব, এবং অতঃপর ঈষৎ খুঁতখুঁতে গলায় বলে, 'কিন্তু গিদরের জনম ছটিহার তো কালই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল?'

'কেন?' কুঞ্চিত ললাটে নাইকী প্রশ্ন করে।

'আজ মাস বদলে গেছে, এক মাসে জন্ম, পরের মাসে জনম ছটিহার, এরকম আবার হয় নাকি?' বলার পর মাঝি মাথা নাড়তে থাকে, এমন অন্যায় অনাচারের নিদর্শন তার অভিজ্ঞতায় নেই।

শুনে নাইকী হাসল, 'মাস গাপা বদলাবেংকাল; আজ তো সাক্রান্ত?'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ!' সন্তুষ্টির ঘাড় নাড়ে আতো মাঝি ভৈরব।

হড়্ সমাজে পুরুষই প্রধান। মেয়েদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মূলত এক ধরনের সুখের সন্ধানে, যেখানে তার বিকল্প নেই। ধর্মীয় অথবা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে সে অস্পৃশ্যের সামিল। ব্যতিক্রমে জনম ছটিহার, যেখানে ধাত্রীয় সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালিকা। সে-ই একমাত্র কর্ত্রী।

পেথমমেলা ময়ূরীর মতো ধাত্রী নীতু মেঝেন চতুর্দিকে নেচে বেড়াচ্ছে। তার বয়েসের হিসেব যৌবনের পরিবেষ্টনে বাঁধা। দেড়কুড়ি পার হয়ে বড়জোর আরও

এক-দু বছর।

নীতু মেঝেনের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা পারিবারিক সূত্রে। ধাত্রী-কন্যা সে। শাশুড়ীও তাই। নীতু মেঝেন অবশ্য শ্বশুরালয়ে থাকে না। ঘরজামাই প্রথায় ভিন গাঁ দারে আতোর পাত্রের সঙ্গে বাপলা হয়েছে তার। জাওঞাই টুইলা মারাণ্ডীর পিতৃগৃহে কোনো অধিকার নেই। কিন্তু শ্বশুর পরিবারে সে পুত্রতুল্য। এবং উত্তরাধিকারী।

বাস্কে পরিবারের একমাত্র সন্তান নীতু। অতএব দশ বিঘে জমি ওড়া শুয়োরের খোঁয়াড় মুর্গীর খাঁচা হালের বলদ দুধেলা গরু দুটি অথবা আর কোনো স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা হবার আশংকা নেই।

নীতুর আপাত স্বর্গত, ভবিষ্যতে আবার বাপলা করে দু-চারটে গিদরের জন্ম দেবে সে সম্ভাবনার মূলটুকু দশ বছর আগেই কেটে গেছে, যখন শিকারে গিয়ে বুনো শুয়োরের দাঁতে পেট চেরা অবস্থায় আতোর হড়্রা তাকে পারকমে শুইয়ে বয়ে এনেছিল, তারপর মিত্ বার পে, এক দুই তিন, এই তৃতীয় দিনের মাথায় ওড়ায় একটা দীর্ঘস্থায়ী কান্নার রোল। কিছুদিন সারা আতোর অশৌচ পালন, তারপর সবাই ভুলেছে নীতুর বাপ হাগাৎ বাস্কেকে। নীতুও। নীতুর রাণ্ডি ইঙ্গাৎ এক নিকট সম্পর্কিত এরোয়েলকে বাপলা করে এখান থেকে বেশ দূরের একটা আতোয় চলে গেছে।

আতো ভাগনাডিহিতে নীতুর সংসার বলতে সে নিজে, জাওঞাই টুইলা মারাণ্ডী আর তাদের তিনটি গিদরে।। বড়টি কুড়ি, নাম পরায়ণী, সে এখন আতোর ঘোটুলের সভ্যা, গীতিওড়ায় রাত্রিবাস করে। সেখানে যাওয়ার পর থেকে তার শরীরটা কেমন সাঁই সাঁই করে বেড়ে চলেছে, পাশাপাশি দেখে মনে হয় না এখানো পর্যন্ত পূর্ণ যৌবনবতী নীতু মেঝেনের পেটের সন্তান। পরায়ণী এত তাড়াতাড়ি কেন অমন বড়সড় হয়ে উঠেছে তা নীতু জানে। সে-ও তো এককালে ঐ ঘোটুলে ছিল, আর সেখানে যাওয়ার পর থেকেই তার শরীরেও এমনি বাড়বাড়ন্ত। ঘোটুল মানে ছেলেমেয়েদের হঠাৎ বড় হওয়ার প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু ঘোটুল এখন বিলুপ্তপ্রায়। গীতিওড়াও প্রায় সব আতো থেকে উঠে যাচ্ছে। এই আতো ভাগনাডির গীতিওড়াতেই বা আর কটা কুড়ি শুতে যায়?

তবে মাসদুই যাবৎ নীতুর সংসারে একটা উটকো আপদ এসে পড়েছে। জাওঞাই টুইলা মারাণ্ডীর গ', নীতুর হানহার। ধাত্রী শাশুড়ী এখন বাধ্যতা-

মূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত। পিতৃপরিবারের সঙ্গে টুইলার আইনত কোনো সম্বন্ধ নেই, তবু দুঃসংবাদ পাওয়ার পর সেখানে গিয়ে সব দেখেশুনে মা-কে ভাগনা-ডিহিতে এনে রেখেছে।

টুইলার মা পারো বুঢ়ী ছিল এগারো আতো দূরের দারে আতোর ধাত্রী। দারে আতো নামেই আতো, এখনো তার জংলী ভাব ঘোচেনি। ভালুক বা নেকড়ে তো সর্বক্ষণের আবাসিক; আর এমনকি দিনের বেলা পর্যন্ত চিতাবাঘ গ্রাম প্রদক্ষিণে আসে। মাঝে মাঝে রাজমহলের পাহাড় থেকে বুনো হাতির দল নেমে সারা আতো ধূলিসাৎ করে দিয়ে যায়।

দারে আতোয় উর্বরা চাষের জমি আছে, কিন্তু ফসল ফলানো দুষ্কর। হয় হাতির দল, নয় হরিণের পাল, তাদের ভোগেই সব। যূথবদ্ধ বুনো শুয়োরের নেকনজর থেকেও অব্যাহতি নেই। অঘ্রানে ধান কাটা হয়েছে, তার আগে ফসল কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি, দারের আতোর পক্ষে এ ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। তবু সেখানকার হড় জমিতে চাষ দেয়, হাজার লক্ষ বছরের প্রাচীন জঙ্গল নির্মূল করার পর খুরপি আর কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে মাটিরই প্রায় সমবয়সী বৃক্ষ-লতাদির শেকড় তুলে ফেলে পতিত জমি উদ্ধার করে, সে শুধু হড় বসে থেকে দিন গুজরান করতে পারে না বলেই। নয়তো বাস্তব ক্ষেত্রে এত পরিশ্রমের প্রায় বারো আনাই বৃথা। তবু দারের একটি বিশেষ সুখ, যা অন্যত্র অতটা নয়, শিকারের জীবজন্তু প্রচুর। তারা যেন মরবার জন্যেই দারেতে যায়।

আবছা সান্ধ্যমুহূর্তে পারো বুঢ়ী আতোর দক্ষিণ সীমানায় জাহের স্থানের দেবদেবী ও বোঙাকে প্রদীপ দেখাতে গিয়ে কুচকালো বানার কবলে পড়ে। কাছাকাছি কোনো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জাহের স্থানের নির্জনতার মধ্যে মহুয়ার ফল খেতে এসেছিল বিশালবপু মোষের মতো বিরাটকায় ভালুক। তিন হাত দূরে দাঁড়িয়েও পারো বুঢ়ী দেখতে পায়নি। হঠাৎ একটা তুলোর বস্তার মতো নরম পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল যেন। তারপর সেই পাথরটা ডানের হাতের ছোঁয়া পাওয়া ধিরি বোঙার মতো তাকে সজোরে আলিঙ্গন করেছিল। ঐ পাথুরে অপদেবতা তাকে জড়িয়ে ধরার পর কিছুই আর মনে নেই তার।

চারটে দিন অজ্ঞান অবস্থায় কেটেছে, এবং শরীরের পাঁচ-সাত জায়গায় ভালুক খাওয়া ঘা শুকোতে আরও প্রায় মাস দুই গেছে। জংলী ঔষধি আর ওঝার তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁকে ঘা ক্রমশ শুকিয়েছে, কিন্তু একটি পা চিরদিনের মতোই হারিয়েছে। জ-জম্ জাঙ্গার পুরো জেল আর হড় মহাটিং বানা গলাধঃকরণ

করেছে। ডান পায়ের পাতা থেকে হাঁটু অবধি বিলুপ্ত। তবু পারো বুঢ়ীর দৃঢ় বিশ্বাস ওটা ভালুক ছিল না, ডানের গুণ করে দেওয়া ধিরি বোঙা। অপদেবতা প্রস্তর!

পারো বুঢ়ীর বাকি জীবনের দুর্গতির শেষ এখানেই নয়। অঙ্গহীনা ঠিটরা বুঢ়ীর মুখ দেখে ওড়ার কেউ আর ইদানীং শুভ কাজে বেরুত না। এমন কি দৈনন্দিন কাজকর্মেও। যাত্রাকালে পঙ্গু নারীর মুখদর্শন ঘোর অমঙ্গলসূচক। হড়ের জীবন মানেই পদে পদে বিপদ বিপত্তি। নিজের অপয়া মুখ দেখিয়ে পারো বুঢ়ীও নিজের নিকট আত্মীয়-পরিজন স্বামী পুত্র পৌত্রদের বিপদগ্রস্ত করতে চায় না।

তাই দিনের অধিকাংশ সময় পারো বুঢ়ী ওড়ার কাছাকাছি বাবলা জঙ্গলে ঢুকে বসে থাকত। মনে মনে অবিরত সেই ধিরি বোঙাটাকেই ডাকত সে। একমাত্র প্রার্থনা, এবার এসে ধিরি বোঙা তাকে একেবারেই শেষ করে দিয়ে যাক। কিন্তু তার পরিবর্তে তৃতীয় পুত্র টুইলা, পিতৃ পরিবারের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধ নেই, যে আতো ভাগনাডিহির ঘরজামাই, সে-ই তাকে ভাগনাডিহিতে তুলে নিয়ে গেছে।

টুইলা তার ইঙ্গাৎকে ওড়ার দাওয়ায় পারকম পেতে সারাদিন বসিয়ে রাখে, প্রতিটি কাজে গ-র মুখ দেখে যাত্রা করে, ফিরে এসে হাসিমুখে বলে, 'কোন বিপদ তো হয়নি।'

টুইলার সব ভাল, কিন্তু সে-ও ঐ সিধু কানহু ভৈরব আর চান্দো নামের ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের স্যাঙাৎ, এমন কি পারিবারিক ব্যাপারেও সে রিণিঃর কথা পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না। খুব সম্ভব তাদের পরামর্শেই পারো বুঢ়ীকে ভাগনাডিহিতে এনেছে সে।

চার

নবজাত শিশুটিকে ঠিক নিজের সন্তানের মতোই বুকের সঙ্গে আঁকড়ে রেখেছে নীতু মেঝেন, হড়্দের সামনে এসে গভীর ব্যস্ততার ভাব নিয়ে সারা দেহ দুলিয়ে ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে বসে থেকেই তোরা সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিবি নাকি? চান করতে যা? তোরা চান করে ফিরে এলে তবে তো আমি এই নাওয়াপেড়া গিদরে ডাটো আর তার ইঙ্গাৎকে নিয়ে পোখরীতে দাঃ কিনতে

যাব ?' কথাটা শেষ করার পর সে আবার অধিকতর আবেগের সঙ্গে নাওয়াপেড়া, হড়্ সমাজের নতুন কুটুম্বকে, বুকের নিভৃত ও নিরাপদ আশ্রয়ে গ্রহণ করে।

নীতু মেঝেনের সুরেলা কণ্ঠস্বরের সোহাগপূর্ণ ধমক খেয়ে সমবেত সব কটি হড়্ একসঙ্গে অতি ব্যস্ততার কলরব তোলে, 'দেলা দেলা দেলা, চল্ চল্ চল্, আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে, এত কড়া সিঞচান্দোর দিকে আর চোখ তুলে তাকানো যায় না!'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা স্নান সেরে ফিরে এল। একমাত্র পরিধেয় পরনের কিচরি খুলে গা মুছেছিল, তারপর আবার সেই ভিজে কাপড়ই কোমরে জড়িয়েছে, তবু পুকুরঘাট থেকে ভোগনের ওড়া পর্যন্ত আসতে সে গামছা গায়ের উত্তাপ আর রোদের তেজে শুকিয়ে গেছে।

হড়্কুল ফিরে এসে আবার ওড়ার প্রাঙ্গণেই বসল। জনম ছটিহার আতোর সার্বজনীন উৎসব, কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়। এতক্ষণে উৎসবের মাত্র দুটি পদ অতিক্রম করেছে, মস্তক মুণ্ডন আর শুচিস্নান, আরও অনেক বাকি। কিন্তু মায়জিউরা যতক্ষণ স্নান সেরে ও জল কিনে ফিরে না আসছে ততক্ষণ করার কিছু নেই।

এ সময়টুকুর সদ্‌ব্যবহার শুধুমাত্র মুখের সুদীর্ঘ চুটির ধোঁয়ায় আর চকমকি ঠোকার শব্দের দ্বারাই হতে পারে। দুটি মেয়ে একসঙ্গে হলেই সময়ের পাহাড় অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, অথচ এ সময়টা তাদের কি ভাবে কাটবে তা ভেবে পায় না সমবেত প্রায় পনেরো বিশটি হড়্।

উপরন্তু মায়জিউদের পুকুরে গিয়ে কেবল স্নান সেরে আসাই নয়, সেখানেও জনম ছটিহার অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ করণীয় আছে, যদিও তা বিশেষ দীর্ঘ পর্যায়ের নয়, কিন্তু মায়জিউদেরই তো ব্যাপার, মাঝে মাঝে গল্পের যতি, স্নানার্থিনী মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের নগ্ন শরীরের আলোচনা সমালোচনা, এ সবের পর মূল অনুষ্ঠান কতক্ষণে শেষ হবে বলা দুষ্কর। আজ কিন্তু মেয়েদের কিছু বলার নেই, অনুষ্ঠান তাদেরই, আর পুরুষরা আমন্ত্রিত, এমনকি গিদরের পিতা পর্যন্ত সেই পর্যায়ে।

নাওয়াপেড়া গিদরে ডাণ্টোকে বাঁ হাত দিয়ে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে রয়েছে নীতু মেঝেন, ডান হাতে দুটি শালপাতার পাত্র, এবং একটি তীক্ষ্ণাগ্র তীরের গায়ে দু-টুকরো সুতো জড়ানো। পাত্রের একটিতে সুনুম, সরষের তেল, অপরটিতে হলুদবাটা। এই তীরের সাহায্যেই নাওয়াপেড়ার নাড়িচ্ছেদ হয়েছিল।

নামেই পোখরী, মানুষের প্রয়াসে রচিত নয়, প্রায় পাঁচ বিঘে আয়তনের একটি ঢালু গর্তে বর্ষার জল জমে পুষ্করিণী। চৈত বোশেখে পোখরী গবাদি পশুর চারণভূমি। নির্জন দ্বিপ্রহর অথবা ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত সান্ধ্যলগ্নে ঐ জায়গাই আবার হড়্ যুবক যুবতীর পরম রমণীয় নিধুবন নিকুঞ্জ। আবছা আঁধারে মনে হয় স্থানে স্থানে নিক্ষিপ্ত সজীব প্রস্তরখণ্ড। শুধু মুখগুলি সনাক্ত করতে না পারাই যথেষ্ট সভ্য আড়াল। আর সুপরিচিত কয়েকটি জুটি হলে সে প্রশ্ন অবান্তর। হাত তিন চারের ব্যবধানই পরিপূর্ণ গোপনতার নৈতিক শিবিরস্বরূপ গ্রাহ্য হয়।

পোখরীর নির্দিষ্ট পাড় নেই। ঘাটও না। তবু তিন-চারটি বিশেষ জায়গা দিয়ে মানুষের জলে নামার চিহ্ন মথিত ঘাসপাতা আর ছোট ছোট আগাছায় স্বাক্ষরিত। এই ধরনের একটি ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল নীতু মেঝেন। তারপর নাওয়াপেড়াকে বুকে চেপে উবু হয়ে সে ঘাটের পাশে বসে পড়ল।

হলুদবাটা ভরা শালপাতার পাত্রেই এক টুকরো শালপাতায় তেলসিঁদুর। সেই শালপাতার সিঁদুরদানীটা বের করল নীতু। বাঁ অঙ্গুষ্ঠে সিঁদুর মাখিয়ে ঘাটের এক ধারে পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে পাশাপাশি পাঁচটা ফোঁটা দিল, তারপর ঘাড় উঁচু করে চতুর্দিকে বিজয়িনীর মতো দৃষ্টি নিক্ষেপের পর কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে বলল, 'তোরা সবাই ভালো করে দেখলি তো, দাঃ কেনা হয়ে গেছে ; সে সময় কাকপক্ষী বা কোনো জন্তুর ডাকে বাধা পড়ে যায়নি, বা আর কোনো দোষ হয়নি ?'

'বাইং বাইং বাইং—না না না !' সমর্থনসূচক সোৎসাহ জবাব সমবেত কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হল।

নীতু উঠে দাঁড়াল, শিশুকে বুকে নিয়েই ঘাটের এক পাশে নিজের পরিধেয়গুলি ছেড়ে রাখল, লাল রঙের পাঢান আর গোলাপী বর্ণের পঞ্চী। অসংকোচ নগ্নতা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। শুধুমাত্র গলায় সাতনরী ওলটকম্বল গাঁথা হার, যেটির দৈর্ঘ্য কণ্ঠের পাঁচ আঙুল নিচে পর্যন্ত সীমিত, বুকে উল্কির স্থায়ী অলংকার। হাত দুটি আভরণশূন্য। দু-কানে ছিদ্র অনেকগুলি, কিন্তু বিশেষ ভূষণ নেই।

নীতু মেঝেনের নগ্ন অবয়বের দিকে তাকিয়ে একজন প্রৌঢ়া মায়জিউ মন্তব্য করে, 'টুইলা রিণিঃর আবার বাপলা হতে পারে।'

উত্তর দিতে যায় নীতু, কিন্তু তার আগেই নিনকী মেঝেন বলে ওঠে, 'রোজই তো আয়ুপবেরে ওর নতুন নতুন জাওঞাইয়ের সঙ্গে বাপলা হয়, খবর রাখিস না ?'

প্রৌঢ়া মায়জিউ হাসতে হাসতে পাশের একটি অল্পবয়সী রিণিঃর গায়ে ঢলে পড়ে, 'তাই নাকি, তাহলে তো আজ সন্ধ্যেবেলায় ওৎ পেতে থাকব ?'

নীতু মেঝেনও সহাস্যে উত্তর দেয়, 'না, ওৎ পাততে হবে না, আমি তোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নতুন জাওঞাই দেখিয়ে দেব ; হয়তো তখন লোকটাকে নিজের জাওঞাই বলে চিনে পারবি।'

এবার একটি অনাবিল খিলখিল হাসির প্রবাহ, যার ফলে প্রকৃতিঘেঁষা অনেকগুলি নিরাবরণ রমণী-দেহের পারস্পরিক মৃদু সংঘর্ষ।

খুব সাবধানে গিদরে ডাট্টোকে স্নান করাল নীতু, তারপর তাকে বুকে নিয়েই নিজের স্নান শেষ করে এক হাতের নিপুণ কৌশলে ভিজে শরীরের জল মুছে কিচরি চড়িয়ে নিল। গায়ে তোলার পর পাঢান অথবা পঞ্চী কোনোটাই অগোছাল নয়।

এ কাজ শেষ করার পর নাড়িকাটা তীরের গায়ে জড়ানো সুতোর একটি খুলে হলুদবাটা মাখিয়ে নীতু সেটি গিদরের কোমরে বেঁধে দিল। বিড বিড করে মন্ত্র পড়ল তখন। বোঙার কবচ। তারপর তীরের গা থেকে দ্বিতীয় সুতোটা খুলে নিয়ে গুটি পাকিয়ে পোখরীর জলে ফেলে দিল। গিদরে ডাট্টোর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আপদ-বিপদের সলিল-সমাধি।

অতঃপর প্রসূতির স্নান। ভোগন টুডুর হপন রিণিঃ সেয়ালী তখনো নগ্ন শরীরে ঘাটের কাছে চুপ করে বসে। শরীর খুবই অসুস্থ। ডান-খাওয়া দেহে বলতে গেলে অবশিষ্ট কিছু নেই। তবু সূতিকাগারের অশৌচ কাটাবার জন্যে পোখরীতে আসতে হয়েছে। সারা পথটা নিনকী মেঝেনের গায়ে ভর দিয়ে হেঁটে এসেছে সে। নিনকীই পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে ধরে ধরে নিয়ে এসেছে তাকে। অপর কেউ ছুঁতে সাহস করেনি। ডানে খাওয়া মৃতদেহ অবধি সহজে কেউ স্পর্শ করতে চায় না।

কিন্তু নিনকীর কথা স্বতন্ত্র। সে বার বার ওড়া ছেড়ে আতো ছেড়ে আঙ্গির আপাঙ্গির হয়েছে। পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জাত খুইয়েছে, তারপর উচিত শাস্তি ভোগ ও উপযুক্ত জরিমানা দিয়ে আবার সমাজে স্থান পেয়েছে। এ হেন সাংঘাতিক মেয়েকে ডান কেন স্বয়ং বোঙা বুরুও কিছু করতে পারে না, বরং ভয়ই পায়। ঠাকুর-দেবতা বা ভূতপ্রেত তো শুধু ভালোমানুষকেই বিপদে ফেলবার জন্য আছে।

নিনকী মেঝেন সেয়ালীকে স্নান করিয়ে দিল। নিজের গায়ের পাঢ়ান দিয়ে

শুকনো করে গা মোছাল তার। মাথার জটা পাকানো চুল খুলে পাঢ়ানের সাহায্যে খুব ঘষে ঘষে মোছাল, যেন একটুও ভিজে না থাকে। তারপর সেরালীকে কিচরি পরাল সে। অসুস্থতা বশত সেরালীর ঘাড় মুহুর্মুহুঃ নেতিয়ে পড়ছে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

ইতিমধ্যে একজন বয়স্কা রমণী প্রশ্ন করে, 'শুনলুম হপন বছর লায়ঃবাহা বের হয়নি, পেটের ভেতর গিজড়ি হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, লায়ঃবাহা রের হয়ে যায়নি, পেটের ভেতর গিজড়ি হয়ে গেছে, সে কি ব্যাপার, সে কি ব্যাপার!' সঙ্গে সঙ্গেই জনকয়েক মায়জিউ আশঙ্কাপূর্ণ কাতরোক্তি করে ওঠে।

নিমেষের মধ্যে প্রায় সবকটি মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সুতীক্ষ্ণ স্বর ও ভঙ্গিমা সহকারে নীতু মেঝেন উত্তর দেয়, 'কে বললে হপন বছর পেটের ফুল বের হয়নি, পেটেই রয়ে গেছে, পচে গেছে ? পুরো ফুলটাই ঠিক মতন বেরিয়ে এসেছিল, সে তো আর কুকুর-বেরালকে খাইয়ে দিইনি, মাটির সরায় রেখে ওপর থেকে আর একটা সরা চাপা দিয়ে ঘরের মেঝেয় পুঁতে দিয়েছি। কেউ যদি দেখতে চায় তো ছপরির অত্ খুঁড়ে তাকে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'তবে সবাই যে বলে হপন বছর ডান লেগেছে ?' সেই রমণী আবার খুঁত-খুঁতে স্বরে জিজ্ঞেস করে।

'আডিতেৎ এম ফাসিয়ারা গেয়া!' দুর্বল শরীর, কণ্ঠস্বর রুগ্ন ও ক্ষীণ, তবু সেরালী যথাসাধ্য সতেজে প্রতিবাদ করে, 'খুব মিথ্যুক তো তুই, কে বললে আমায় ডান ধরেছে ? যার ডান লাগে তার কি জ্যান্ত কোড়া গিদরে হয় ?' তারপর নীতুর দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করে, 'ঐ গিদরে আমার পেট থেকে বেরিয়েছে না তোদের কারো পেট থেকে বেরিয়েছে ?'

'ওটা তো গিদরে—'

কি যেন বলতে চেষ্টা করছিল ঐ বুড়ি মায়জিউ, কিন্তু সেরালী তাকে বলার অবসর দেয় না, নিজের মানসিক উত্তেজনাবশে এক নাগাড়ে গেয়ে চলে, 'হ্যাঁ, ও কোড়া গিদরে, কুড়ি গিদরে নয়, তাহলে তিনদিনেই ওর জনম ছটিহার হত, আর আমরা ওড়ার বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলতুম, আজ থেকে এই গিদরের নাম মায়কু, পোখরীতে দাঃ আনতে যাবার সময় তোরা একে মায়কু বলে ডাকবি। আমার গ-র ঞ্তুমেই তো আমার কুড়ির ঞ্তুম হবে, এ কথা তো কাউকে শিখিয়ে দেবার দরকার নেই ?'

প্রবল উত্তেজনায় এতগুলি কথা বলার পর একটা বুকভাঙা গভীর নিশ্বাস ফেলে সেরালী প্রায় নেতিয়ে পড়ে। নিনকী মেঝেন তাড়াতাড়ি তার পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'আঃ, এবার চুপ কর না তুই, শুধু শুধু রেটেপেটে করে কি লাভ তোর, যে যা বলছে বলতে দে।'

চোখ দুটি বিস্ফারিত করে প্রায় অর্থহীন দৃষ্টিতে নিনকীর দিকে তাকিয়ে সেরালী কাতরোক্তি করে, 'আড্ডা রাবাং কানায়—রাবাং কানায়; আমার খুব শীত করছে।'

'জ্বর এসেছে বোধহয়?' নিজের গা থেকে পাঢ়ান খুলে সেরালীর গায়ে জড়িয়ে দিতে গিয়ে নিনকী অনুভব করে সেটা বেশ ভিজে। পাঢ়ান সরিয়ে নিয়ে পরক্ষণে পরনের পঞ্চী খুলে সেটিই হপন বহুর গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দেয়. তারপর ভিজে পাঢ়ানটি নিজে পরে সে।

সবারই স্নান শেষ। কিছুক্ষণের জন্যে পোখরীর জলে একত্রে অনেকগুলি উলঙ্গ নারীদেহের ছায়া পড়েছিল, সে ছায়ার দাগগুলো দু-হাতে জল ছিটিয়ে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেওয়ার পর তবেই তারা জল ছেড়ে ডাঙায় উঠেছে।

রাত্তিরে পোখরীতে জল খেতে এসে কোনো অপদেবতা যদি কারো ছায়া দেখে প্রলুব্ধ হয় তাহলে আর নিস্তার নেই। এ আতোয় অপদেবতার অভিসারে গর্ভবতী হওয়া নারী কয়েকজন আছে। মানুষের সংসর্গে তাদের পেটের গিদরে জন্মায়নি। তবে যে কোনো কারণেই হোক সেসব গিদরে জনম ছটিহারের আগেই মারা গেছে, ভবিষ্যতের সমস্যা হয়ে বেঁচে থাকেনি। প্রতি বছরই আতো ভাগনা-ডিহিতে হয় এমন দু-তিনটে ঘটনা। এ ঘটনা প্রায় সব আতোয়। তবে এ গিদরে বাঁচে না কখনো।

এখানকার বিধিবিধানযুক্ত কাজগুলি শেষ হওয়ার পর ডান হাতটা ওপর দিকে তুলে নীতু মেঝেন দ্রুত ত্বরিত স্বরে বলে, 'দেলা দেলা, তাড়াম তাড়াম ম্যা; চল্ তাড়াতাড়ি, ওদিকে হড়্রা সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।'

সেরালীকে এখান থেকে ওড়ায় তুলে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা, তার হেঁটে যাওয়ার শক্তি আছে বলে বোধ হয় না।

নিনকী মেঝেন যুক্তি দেয়, 'একটা পারকম এনে হপন বহুকে শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে, হাঁটতে তো পারবে না। এত রুয়ঃ যে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে!'

কথাটা শোনা মাত্রই শরীরের অবশিষ্ট শক্তি সব এক করে সেরালী উঠে দাঁড়ায়, তারপর ডান হাতটা ঝুঁকিয়ে নিনকীর কাঁধে ভর দিয়ে বলে, 'না, আমি

হেঁটেই বেশ যেতে পারব, আমায় শুধু একটু ধরে ধরে নিয়ে চল।'

একবার পারকমে শুয়ে ওড়ায় ফিরতে হলেই সর্বনাশ, ডাইনী অথবা অপদেবতার দুষ্কর্মের দরুন সেরালীর এ অবস্থা কিনা আবার নতুন করে তিন আতোর ওঝার সামনে তার পরীক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ এই রুগ্ন শরীরে আর একবার মৃত্যুর সামনে দাঁড়ানো।

ইতিমধ্যে দীঘল ওড়ার রাচায় এসে বসেছে। মস্তক মুণ্ডিত হওয়ার ভয়ে বেশি দূরে যায়নি সে। এমনকি ওড়ার বাইরেও না। তার নিজের কুঠলিতে অনুসন্ধান হতে পারে ভেবে বড় ভাই গড়মের ঘরে গিয়ে লুকিয়েছিল। হিলি বাহা মেঝেন জানত সে কথা।

পোখরীতে যাওয়ার আগে বাহা জানান দিয়ে গেছে, 'হড়্রা সবাই চান করে ওড়ায় ফিরে এসেছে, আর তোর মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার ভয় নেই, এবার রাচায় গিয়ে বস, আমি চান করতে যাচ্ছি।'

বাপের তিরস্কারের জের এড়াবার জন্যে দীঘল এসে ওড়ার রাচায় একটি নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে বসল, সিধু কানহু ভ্রাতৃবর্গের ঠিক মাঝখানটিতে। ভোগন বার কয়েক তার মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল কিন্তু কোনো কথা বলল না।

দীঘলের দিকে হাত বাড়িয়ে কানহু তার নিজের অর্ধদগ্ধ চুটিটা এগিয়ে দেয়, 'তুই পালিয়ে গিয়েছিলি কেন, তোকে নিয়ে আমাদের কত রেটেপেটে হল! মাথা মুড়োবি না, তা উঠে দাঁড়িয়ে বললেই তো পারতিস, তারপর কে তোর দিকে ক্ষুর নিয়ে আসে দেখা যেত? ঐ ক্ষুর দিয়েই তার গলাটা কেটে ধড় থেকে নামিয়ে দিতুম।'

এত কথার দীঘল উত্তর দেয় না কোনো।

সিধু এবার বলে, 'আজ শ্বেতাংবেরে একজন ভিন্ আতোর হড়্ আমাদের জাহের স্থানের ওদিকের জঙ্গল থেকে মড়ে কুলাই মেরেছিল। ঠিক ছাই রঙের তোয়োর মতন বড়!' মাটি থেকে হাতখানেক উঁচুতে নিজের ডান হাতটা শূন্যে সমান্তরালভাবে চালিত করে সে শেয়ালের আকারের খরগোস পাঁচটির বর্ণনা দেয়, তারপর বলে, 'সেই হড়ের কাছ থেকে আমরা মিত্‌জোড় কুলাই আদায় করেছি, এখান থেকে ছুটি হলে তিকিনবেরায় ডাভির জঙ্গলের দিকে যাব, মহুয়ার খুব ভাল পউরও আছে, আর ঐ জিনিসটা—। আজ হাটবার, চেষ্টা করলে

দু-চারটে ভালবাসার শিকার কি আর পাওয়া যাবে না ?'

বড় ভাই সিধুর এ প্রস্তাবে তৃতীয় ভাই ভৈরবও যোগ দেয়, 'কুড়ি বাদ দিয়ে তো কোড়ার জীউই নয়, তুইও আমাদের সঙ্গে যাবি, গেলে এত সুখের সন্ধান পাবি যে তা কোনোদিন ভুলতে পারবি না।'

উদাস ভাবে ঘাড় নাড়ে দীঘল, বলে, 'বাইং, আমার যাওয়া হবে না।'

'কেন ?' এতক্ষণ কথোপকথনের মাঝে প্রায় নীরব শ্রোতা কানহু এবার প্রশ্ন করে।

সঠিক উত্তর দেয় না দীঘল, কোনো উত্তরই না। কানহু সিধুদের আমন্ত্রণে ইতিপূর্বে কয়েকবার আতোর বাইরে গেছে সে। ভালই লেগেছে। ওদের যজ্ঞ কখনো নারীহীন সম্পন্ন হয় না। শেষ আহুতির স্মৃতি মনের মধ্যে সুখের রেশ রেখে যায়।

কিন্তু ইদানীং দীঘলের কি যেন হয়েছে, বাহা ভিন্ন আর কাউকেই ঠিক পছন্দ হয় না। হড়ের মনে প্রেমের সূক্ষ্ম আবেশ বা অনুভূতি নেই। চরমতম দেহ সান্নিধ্য ছাড়া সে সংজ্ঞার্থ সম্পূর্ণ অর্থহীন। অবান্তর। অন্যান্য মেয়েগুলির সঙ্গে তুলনা করে দীঘলের মনে হয় ঐ দৈহিক সূত্রেই বাহার কাছে সে যা পেয়েছে তা অতুলনীয়। সবার সম্মিলিত সুখদানের ওজন বাহার একার দানের তুলনায় নগণ্য। ওদের পাশ থেকে সরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত অতল বিস্মৃতিতে সমাধিস্থ হয়। আগে কিন্তু এ স্মৃতি বেশ কিছুদিন থেকে যেত, আর একটি নতুনের আগমনে আগেরটি অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত।

গড়মের রিণিঃ -বাহা, তার পরিচর্যা, তাকে দৈহিক সুখে সুখী করা বাহার কর্তব্য। এ ব্যাপারে সংসারে কোনো অশান্তি হয়নি। এরোয়েলের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের অনুযোগ বাহার সম্বন্ধে গড়ম করেনি কখনো। কিন্তু দীঘল জানে গড়মের অতিরিক্ত বার-টানের জন্যে বাহা তাকে বিশেষ পছন্দ করে না। তাই অপর পক্ষে গড়মের বার-টান দিন দিন বেড়ে চলেছে, বাড়ি সম্বন্ধে সে আজকাল একান্তই উদাসীন। আর দীঘলের বাইরের আকর্ষণ কমছে, কারণ বাহার সর্বস্ব তারই জীবনপাত্রে নিবেদিত হচ্ছে।

দীঘলের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে কানহু রসাল সুরে মন্তব্য করে, 'তোর আজকাল ঘরের খাবারই বেশি ভাল লাগে তা আমি জানি, তবু চেত্ মতলব আমা, কি তোর ইচ্ছে পরিষ্কার করে বল্ না ?'

এবারও জবাব দিল না দীঘল, অন্যমনস্ক চোখে কানহুর মুখের দিকে তাকিয়ে

একটু আনমনা হাসি হাসল সে।

ছেলে কোলে হপন বহু সেরালী ছপরির ওসারায় এসে বসেছে। শারীরিক অসুস্থতার দরুন তার পিঠ দেওয়ালের আশ্রয়ে ঠেকানো। স্নান সেরে আসার পর নীতু মেঝেন ওড়ার সর্বত্র গোবরজলের ছড়া দিয়ে ধারতি পবিত্র করেছে। ছড়া দেবার সময় হপন বহুর শরীরটাকে অব্যাহতি দেয়নি, গিদরের দেহও না। বাচায় সমবেত নারী-পুরুষের অঙ্গও সেই সুপবিত্র বারিতে তিতিত।

এ পর্ব চুকিয়ে নীতু মেঝেন অপেক্ষাকৃত বড মাপের দুটো শালপাতার দোনায় ভুট্টার আটা গুলে নিল। ছপরির ভেতরে গিয়ে একটি দোনার তরল পদার্থে পস্থৃতির পারকমের পদচতুষ্টয় নিষিক্ত করে এল সে। তারপব দ্বিতীয় পাত্রটির আটাগোলা জল দিয়ে প্রতিটি অভ্যাগত ও অভ্যাগতার বক্ষদেশ লেপন করল। মর্যাদানুক্রমে সর্বপ্রথম নাইকী ও নাইকী রিণিঃ, এবং সর্বশেষ হপন বহু সেরালী ও গিদরে ডাটো।

এরপরই ভোগনের জ্যেষ্ঠা রিণিঃ বতনী মেঝেন নিমপাতার সঙ্গে সেদ্ধ করা মাড়ভাত নিয়ে এল। দু-একজন অভ্যাগতা মায়জিউ ত্বরিতে উঠে পড়ে শাল-পাতার ছোট ছোট দোনায় প্রসাদ বিতরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই একটিমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে পুজোর প্রসাদ স্পর্শ ও গ্রহণের ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে ব্যবধান নেই। মায়জিউ ও কুড়ি, এরাও হড়ের সমান অধিকারিণী। বরং তাদেরই অগ্রাধিকার। এ ক্ষেত্রে দেবী জাহেরেরা এবং সাধারণ প্রায় সমান সমান।

অবশ্য প্রতিটি হড়ের ওড়ার বাসকক্ষের এক কোণে ভিতর নামে চিহ্নিত দেবালয়ে রক্ষিত মারাংবুরু ও ওকর বোঙার প্রসাদ গ্রহণে মেয়েদের নিষেধ নেই। সে কেবল পরিবার অন্তর্ভুক্ত মেয়েরাই। বিবাহিতা পরগোত্র কুড়ি সে মর্যাদা বর্জিত। কিন্তু তৃতীয় গৃহদেবতা গুপ্ত বোঙার প্রসাদ গ্রহণে একমাত্র গৃহকর্তা ও তার কোড়া গিদরেদেরই অধিকার। গুপ্ত বোঙাটি কে তা গৃহকর্তা ভিন্ন আর কেউ জানে না, কিসে সে বোঙার অনুরাগ বিরাগ, কি বা পুজোর মন্ত্র, তা গৃহকর্তারই অধিগত বিষয়। মৃত্যুকালে এ প্রসঙ্গে সমূহ জ্ঞান জ্যেষ্ঠপুত্রকে অর্পণ করে যাবে সে। গৃহদেবতা শুধুমাত্র পুরুষের ব্যবস্থাধীন। মেয়েদের পক্ষে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকা।

নিজের চাচো ছটিহারের উৎসব প্রাঙ্গণে বসে দীঘল টুডু ডাট্টোর জনম ছটি

হারের দিনটি স্মরণ করছে। চোখের সুমুখে যত চিত্র আর বিগত উৎসবের স্মৃতি-চিত্র যেন একটি মাত্র সূত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেদিন বাহার উৎসাহের সীমা ছিল না, আপাতদৃষ্টিতে আজও নেই। কিন্তু আজ যেন তার ঐ আনন্দোজ্জ্বল মুখের কোথা থেকে একটা ম্লান ছায়া উঁকি দিচ্ছে!

আজ দীঘলের পক্ষে এ যেন পরগোত্র হয়ে যাওয়ার নির্দেশ। তার বয়ো-প্রাপ্তির নিদর্শন। এইবার চতুর্দিক থেকে বাপলার প্রস্তাব আসতে আরম্ভ করবে। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাহলেই হড়্ সমাজের সন্দেহ ঘনীভূত হবে দীঘল আর বাহার সম্পর্ক ডাঙোয়া এরোয়েল ও হিলির নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সীমিত কিনা? ভ্রাতৃবধূর প্রতি অবিবাহিত দেওরের যতটুকু অধিকার তা কি অতিক্রম করে গেছে ভোগন টুডুর ডাঙোয়া কোড়া দীঘল টুডু? এরপর ভ্রাতৃবিরোধ, সামাজিক ধিক্কার ও কঠোর শাসন। হড়্ সমাজের শাসনের নির্দেশ রক্তের রেখায় ঘোষিত হয়।

'হাণ্ডি ন্যান ভালা?' কাঁসার পাত্রভর্তি পানীয় এনে বাহা দীঘলের সামনে দাঁড়াল, মুখে বিচিত্র আবেশময় মৃদু ও অর্থময় হাসি।

দীঘল যেন ঘুমের মাঝে চমকে ওঠে, তারপর হাত বাড়িয়ে পানপাত্র নিতে গিয়ে তার অনুভব হয় বাহার সর্বাঙ্গে এখনো পর্যন্ত তার নিজের গায়ের গন্ধ লিপ্ত। এ গন্ধ বাহা ইচ্ছে করেই মুছে ফেলেনি, বরং যেন স্থায়ী ও গভীরতর করার জন্যেই আগ্রহী।

বাহা এখানো সামনে দাঁড়িয়ে, দীঘল গভীর তৃপ্তির সঙ্গে পানপাত্রে চুমুক দেয়। হড়্ নারীরা বোঝে কিসে পুরুষের পরিতৃপ্তি, দীঘলের সম্বন্ধে বাহা তা আরও ভালভাবে জানে। সেই আয়োজনে কোনোদিন ত্রুটি রাখে না সে।

দীঘলের মনে হল, বাহার আবির্ভাবে এই দুপুরেও যেন গভীর রাত নেমে এসেছে, যখন সমস্ত পৃথিবী স্নিগ্ধ আবেশে সুপ্ত, আর তাদের যুগল চেতনা পরস্পরকে সুখী করার আগ্রহে উন্মুখ!

পাঁচ

নিহত জীবটা আতোর প্রধান সড়কের পাশে সরলভাবে শায়িত। মাটির ওপর উবু হয়ে বসে ভৈরব মাঝি নিজের হাতের সাহায্যে সেটিকে মেপে চলেছে। অবশেষে তার নিজেরই ঘোর সন্দেহ। প্রথমবার মাথার দিক থেকে আরম্ভ

করেছিল সে, এবার লেজের দিক থেকে মাপতে শুরু করল।

হড়ের আতো বলতে গ্রামের প্রধান পথটির দু-ধারে সারিবদ্ধ কুটির। অধিকাংশের পশ্চাৎভাগ রাস্তার দিকে। শালের সাতটি খুঁটির ওপর দাঁড় করানো দোচালা। মাঝখানে এক সারিতে তিনটি আর দু-কিনারে চারখানি। মাটির দেওয়ালের গায়ে গোবর-মাটির প্রাথমিক প্রলেপ। তার ওপর থেকে রঙীন মাটির আস্তরণ। কুটিরের চালে ধানের খড় অথবা পাহাড়ী ঘাসের আচ্ছাদন। চৌচালা কুটিরও একেবারে অনুপস্থিত নয়। নির্মাণ-পদ্ধতি একই। প্রতিটির গায়ে পরিপাটি যত্নের চিহ্ন।

আতোর প্রবেশপথের কাছে মাঝিস্থান। চৌচালা চণ্ডীমণ্ডপ বিশেষ। ভেতরের দুটি খুঁটিতে ঠেসান দেওয়া দু-খণ্ড সিঁদুর-চর্চিত পাথর। হড়্ সমাজের আদি দম্পতি পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুঢ়ীর প্রেত-প্রতিভূ দুই মাঝি বোঙা। চালার ওপর থেকে দুটি শিকের সাহায্যে লম্বিত মৃৎপাত্রে পানীয় জল। প্রেত যুগলের উদ্দেশে নিবেদিত।

আতোর অপর প্রান্তে এবং সম্পূর্ণ নিভৃতে জাহেরস্থান। সযত্নে সৃষ্ট এই কৃত্রিম অরণ্যভূমি হড়্ সমাজের অধিকাংশ দেবতা ও অপদেবতাবর্গের আবাস। শাল মহুয়া নিম কদম ইত্যাদি বৃক্ষের পাদদেশে বিগ্রহের বিকল্পে শিলাখণ্ড। জাহেরস্থানের নেত্রী দেবী জাহেরেরা। তারপর দেবতা মারাংবুরু, অপদেবতা মড়েকো তুরুইকো—অর্থাৎ পাঁচ-ছয় বোঙা। সর্বাগ্রে জাহেরেরার পুজো, পরবর্তী অধ্যায়ে অপরাপর দেবদেবী আর বোঙা।

আতোর প্রধান রাস্তা, উপরন্তু মঙ্গলবারী হাট, স্বভাবতই ভাগনাডিহির হড়্ মায়জিউ কোড়াকুড়ি গিদরে ছাড়া আশপাশের পাঁচ-সাতটা আতোর সর্বশ্রেণীর মানুষ উপস্থিত। যেন মেলার যাত্রী যথাস্থানে এসে জমেছে। তবু এখনো বিশেষ বেলা বাড়েনি।

ভিড় যথেষ্টই, কিন্তু রুদ্ধশ্বাস শৃঙ্খলার দরুন এতগুলি বিভিন্ন বয়েসের মানুষের সমষ্টি যেন সিকিভাগ বলে বোধ হচ্ছে। এই জীবটির অভাবিত দর্শনে সকলেই নির্বাক। মনের বিস্ময় কিছুটা কেটে যাওয়ার পরই হয়তো মুখরতা ফুটবে। তাও হট্টগোলস্বরূপ নয়।

বার বার দু-বার একই মাপ, অতএব ভৈরব মাঝি এবার নিঃসন্দেহ হয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর পর একটা নিশ্বাস ফেলল সে, শ্রান্তি এবং স্বস্তির। সবার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি অপাঙ্গে মেখে বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলল, 'বারগ্যালবার

তিঃ ; পাক্কা বাইশ হাত মাপের রাজ বিং। এতবড় সাপ এর আগে আমি কখনো দেখিনি!'

ভৈরব মাঝি এতবড় সাপ দেখেনি, কিন্তু এ আতোর কে-ই বা দেখেছে? বিস্ময়বিদ্ধ নারী পুরুষ প্রথমটা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করল, তারপর পরস্পরের উদ্দেশে সরব প্রশ্ন, এ ময়াল বা পাহাড়ী বোড়া এল কোথা থেকে? এবং কোন্ পথে? সাপটির আদি নিবাস কি রাজমহল অথবা বারহারোয়া গিরি-শ্রেণী? অথবা বারাহাটের অন্তর্গত পাহাড়ী অঞ্চল? দৈর্ঘ্যে বাইশ হাত! দু-বাহু প্রায় সম্পূর্ণ প্রসারিত করে বেড় দিয়ে ধরলে তবেই প্রস্থের অনুমান হতে পারে। সাপ নয়, যেন শাখাপ্রশাখাহীন বিশাল এক শালগাছ, আকাশ-ছোঁয়া।

ভাদ্র এখনো শেষ হয়নি, শ্লথগামিতা এবং প্রায় অনড় অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরে পড়ে থাকার দরুন সাপটির গায়ে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ। বৃহদাকার সাপের দর্শন ব্যাপারে ভাগনাডিহি অথবা আশপাশের হড় বিশেষ অনভিজ্ঞ নয়। এ ধরনের সাপ তারা পাহাড় আর জঙ্গল খুঁজে শিকার করে। খাদ্য হিসেবে সাপের মাংস অতুলনীয়, অমৃতসমান সুখাদ্য।

আবার অনেক সাপ জলার ধারের বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে গা মিশিয়ে তৃষ্ণার্ত জীবকে গলাধঃকরণের আশায় প্রতীক্ষা করে। ভেতরে বিষের থলি নেই খুব সম্ভব, মাংস সবিশেষ উপাদেয়, এবং গায়ের পুরু চর্বির অসংখ্য গুণ। পুরনো বাতব্যাধি ও পুরুষত্বহানির বিরুদ্ধে তো রামবাণ!

অপর কেউ সাপটির আগমন-স্থানের ব্যাপারে মুখ খোলার আগে সিধু এগিয়ে আসে, 'তোর কি মনে হয় মাঝি, এ রাজ বিং কোথা থেকে এল?'

অদূরবর্তী কোনো পাহাড় বা জঙ্গলের নাম করতে চায় না ভৈরব মাঝি, চিন্তার ফলে গাম্ভীর্যপ্রাপ্ত মুখাকৃতি নিয়ে বলে, 'আড্ডী আড্ডী দূরের বুরু—অনেক অনেক দূরের একটা পাহাড়।'

কিছু কৌতুক এবং কিছু কৌতূহল কানহুর; প্রশ্ন করে, 'সে বুরুটা কোথায়? এমন বড় বড় বিং সেখানে নিশ্চয় আরও রয়েছে?'

একটা আলোচনা ও গবেষণার সূত্র পাওয়ার পর সুরীন নাইকী এবার মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে, 'বাইং বাইং, আর মিত্‌টে বিংও সেখানে নেই। পিলচুদের মিতজোড় কোডাকুড়ি পশ্চিম দিকে যে হারাঠা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আগুন বৃষ্টি থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, সেই বুরু দান্দেরে এটা এতদিন লুকিয়ে বসে ছিল। তারপর হঠাৎই বেরিয়ে এসেছে।'

এই বিচক্ষণ ও সুচিন্তিত উত্তর শুনে সিধু কানহু এবং আর সবাই সবিশেষ সন্তুষ্ট। কিন্তু আতো মাঝি অথবা অপর কোনো গণ্যমান্য হড় উপস্থিত থাক না থাক সিধু কানহুর সমক্ষে, অন্য কেউ মুখপাত্রের ভূমিকা নিতে পারে না। শুধু ভাগনাডিহি নয়, আরও দশ-বিশটা আতো মিলিয়ে তাদের সমান প্রতিপত্তি, এবং নানা কারণে ইদানীং তা বেড়েই চলেছে ক্রমশ। কি হড় আর কি কুড়ি, সিধু কানহু রা কাড়লে সবাই একসঙ্গে সমর্থনের জন্যে হাত তোলে।

সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর উঁচুতে নিয়ে গিয়ে কানহু সগর্ব পুলকের সঙ্গে ঘোষণা করে, 'আজ এখানে যারা রয়েছে, যে কোনো আতোর হড় আর কুড়ি, হাট ভাঙলে সন্ধ্যেবেলা ভাগনাডিহিতে তাদের ভোজ হবে, বিং জেল দাকা আর পউর— সাপের মাংস ভাত আর মদ। তারপর সব কোড়াকুড়ি একসঙ্গে মিলে নাচবে।'

এ প্রস্তাব অথবা নির্দেশ সমর্থনের অভাবে বাতিল হবার নয়, উপরন্তু যে ব্যাপারে সিধু কানহুই সবিশেষ উৎসাহী অগ্রণী।

সাপটি বিরাট, সৃষ্টির আদি যুগে জন্ম, এ-ও যেন অত্যুক্তি নয়। কোন্ পথে ভাগনাভিহিতে আবির্ভাব, তা সুদীর্ঘ এবং সুচিন্তিত গবেষণার অবসর রাখে।

সন্ধ্যেবেলা পানোৎসবের আয়োজন ঘোষিত হওয়ামাত্র এক বয়স্কা মায়জিউ সোৎসাহে হাততালি দিয়ে ওঠে, 'এয়া কোড়াকো, আপে দঃ তুমদাঃ টামাক তিরিও রুইপে, কুড়িকো এনেঃ মাঃ—ওরে ছেলেরা, তোরা মাদল নাকাড়া আর বাঁশী বাজা, মেয়েরা নাচবে।'

হাটযাত্রী হড়, অনেকের সঙ্গেই বাদ্যযন্ত্র, ভাঙা হাটে খানিকক্ষণ নৃত্যগীতের পর তবেই তারা আতোর পথ ধরে। আর তিরিও, অর্থাৎ বাঁশী, সে তো তীর-ধনুকের মতোই হড়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী, বিরহ ও মিলনক্ষণের পরম বান্ধব, নিরালা জনপদ ও বিপদসংকুল বনপথে বিশ্বস্ত সহচর।

হড় রমণীর কণ্ঠের সঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্ত, পায়ে নৃত্যের ছন্দভঙ্গিমা আনার জন্যেও আরাধনা করতে হয় না।

ভাগনাডিহির যে হড়বৃন্দ এখানে উপস্থিত তারা এখনো হাটে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে ওড়া থেকে বেরোয়নি, রাজ বিং-এর খবর পেয়ে আতোর যত্রতত্র থেকে ছুটে এসেছে। তাদের সঙ্গে মাদল আর নাকাড়া নেই, তবে অনেকেরই কোমরের কষিতে তিরিও। ভিন্ গাঁয়ের হড়রা মাদল আর নাকাড়ায় ঘা দিল, আর তিরিও বাজল অনেকগুলো।

নরম গলায় গুঞ্জন করতে করতেই মেয়েরা গানের কথা বেঁধে ফেলেছে,

নাকড়া আর মাদলের তালে তালে পা ফেলতে আরম্ভ করা মাত্রই তা সুরছন্দে মিলিত হয়ে গেল। পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে রাস্তার ওপরই নাচতে শুরু করেছে তারা।

সুরের লহরীতে সে গানের শব্দ প্রস্ফুটিত—'আমাদের আতোর বীর হড়্রা বাস্তু দানবকে হত্যা করেছে, এবার আমাদের সুখের দিন আসছে। আমরা আমাদের ফুলের মতো নরম আর সুবাসিত শরীর দিয়ে হড়ের সেবা করব। রতি পরী রংগোরুজি বোঙা, যে শিকারের সময় হড়্দের প্রেরণা যোগায় আমরা তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওগো আমাদের বীর হড়্রা বাস্তু দানবকে হত্য করেছে।'

এই দলে বাহাকে নাচতে দেখে দীঘল স্থির থাকতে পারে না, তার নিজের কাছে তিরিও নেই এখন, পাশের এক মুখচেনা হড়ের হাত থেকে তিরিও টেনে নিয়ে সে বাজাতে আরম্ভ করে।

বাহা একবার চোখ তুলে দীঘলের দিকে তাকায়। তার সঙ্গে দীঘলের দৃষ্টি-বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীঘলের তিরিও পর্যন্ত যেন সবিশেষ সুরাবিষ্ট হয়ে পড়ে। নিজের প্রয়াসে সৃষ্টি করা সুরের মোহে সে নিজেই আচ্ছন্ন। সেই ভাবে সে যেন বাহাকেও আপ্লুত করতে চায়।

নাচের মাঝেই বাহা একবার পায়ে ছন্দ ও গলায় সঙ্গীত নিয়ে দল ছেড়ে দীঘলের কাছে চলে আসে, তারপর খুব নিচু কণ্ঠস্বরে বলে, 'সাপটাকে যদি তুই মারতিস তাহলে আজ আমার সুখের শেষ থাকত না।' কথাটা বলেই সে আবার নাচের দলে গিয়ে মিশে যায়, মনে হয় এক মুহূর্তের জন্যেও দলছাড়া হয়ে আসেনি। সামগ্রিকতার ছন্দ ভাঙেনি।

গত গ্রীষ্মে শিকারোৎসবে গিয়ে দীঘল একটিও বড় শিকার পায়নি। মাত্র দুটি তিতির আর একটা শেয়াল। যদিবা গায়ে বাঘের নখের আঁচড় কিংবা বুনে শুয়োরের দাঁতের ঘা নিয়ে সে আতোয় ফিরত তবু মান থেকে যেত। পরগণ বোঙা আর রতি পরী রংগোরুজি বোঙার কাছে মানত বৃথা হয়ে গেছে তার তারা দু-হাত বাড়িয়ে পুজো নিয়েছে, কিন্তু প্রতিদান দেয়নি।

শিকারোৎসবের সময় হড়্ পুরুষের বীরত্ব গাথাই আতোয় ফেরার পর তার প্রণয়িনীর কাছে প্রতীক্ষিত সংবাদ। ওড়ার প্রবেশপথের কাছে বাহা দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকেছিল দীঘল।

বাহা দীঘলের পিছু পিছু এসে বলেছিল, 'তুই কিছু মারতে পারিসনি?'

'না।' ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর দিয়েছিল দীঘল।

তারপর বাহা তিনদিন দীঘলের কাছে আসেনি। কথা বলেনি। অভিমান প্রকাশের কালই তিনদিন। সে সময় অতিক্রম করলে তো বিরাগ অথবা বিদ্বেষ! বাহা অবশ্য তা দেখায়নি!

কিন্তু সে যাত্রায় গড়ম বাঘ মেরেছিল, বাপ ভোগন শিকার করেছিল হাতি। যদিও তারা একা নয়। তবু তাদের গর্বে বাহা নিজেকে গরবিণী বলে মনে করেনি। তার শুকনো ফুলের মতো মুখ সজীব হয়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল।

বাহার এখনকার কথাটা দীঘলের মনের গভীরে গিয়ে আঘাত করে, এর পর তার মুখের তিরিওর স্বর নিজের কানেই বেসুরো কাঁটার মতো ফুটতে থাকে। বাঁশীটা ফিরিয়ে দেয় সে।

দানব নিধনের সময় দীঘল যেতে পারেনি, খবরটা অনেক দেরিতে তার কানে পৌঁছেছে। সে তখন ওড়ার পাশে ভিট জমিতে মকাইয়ের ক্ষেত নিড়ানী দিতে ব্যস্ত। সঙ্গে বাপ ভোগন আর হপন গ' সেরালী। গতকাল ভোর থেকেই বড়ভাই গড়মের পাত্তা নেই, বাপের হুকুমে বোরিও বাজারের মহাজনের কাছে সুদের মোহলৎ চাইতে গিয়ে এখনো ফেরেনি।

একটা পূর্ণবয়স্ক শুয়োর গলাধঃকরণ করে সাপটা পোখরীর ধারে পড়ে ছিল। তখনো পর্যন্ত পুরো শিকারটা উদরস্থ হয়নি, গলা ও মুণ্ডু আততায়ীর মুখের বাইরে। নিথর নিশ্চল সাপটা একটি বিরাট বৃক্ষকাণ্ডের মতো পড়ে থেকে ভেতরে ভেতরে ভোজনের ক্রিয়া সম্পন্ন করে চলেছে।

উষালগ্নে পোখরীতে জল আনতে গিয়েছিল কোন্ এক মধ্যবয়সী মায়জিউ, দূর থেকে বিং দেখে প্রথমটা চিনতে পারেনি সে, চেনার পরও বিশ্বাস হয়নি। ইতিপূর্বে গাছের গুঁড়ি ভ্রমে কেউ কেউ হয়তো সেটাকে মাড়িয়েই পোখরীতে গেছে। জল নিয়ে আবার তাকে মাড়িয়েই ওড়ায় ফিরেছে। একটু বেঁহুশ থাকলে ঐ মায়জিউও বোধহয় তাই করত।

মায়জিউয়ের কাছে খবর পেয়ে ভৈরব মাঝি পোখরীতে এসেছে। এসেছে আরও অনেকেই, সাপটা কিন্তু তখনো অনড় অবিচল। মনে হয়তো পালানোর বাসনা, কিন্তু সে সময়টা সামর্থ্যের অভাব। তারপর ভাগনাডিহির হড়ের শিকার-চিন্তা। অনেকের ধনুকেই জ্যা চড়ে, কারো বা হাতের কুঠার ঝলকে ওঠে, শুধু মাঝির নির্দেশের অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে সিধু হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে বলে, 'না না, এভাবে মারলে

চামড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে। এ চামড়া আমরা রাজমহলের পুঁটিয়া সাহেবের কাছে বিক্রি করে আসব, অনেকে শাদা পয়সা দেবে। মড়ে পোও পয়সা—পাঁচটা শাদা পয়সা। পাঁচ টাকা! মোটা কাছি নিয়ে আয়, গলায় ফাঁসি টেনে মারতে হবে।'

সিধুর প্রস্তাব যথার্থ। রাজমহলে থাকেন দেড় হাজার বর্গমাইল ব্যাপী দামিনঈকোহ্ এলাকার পর্যবেক্ষক মিস্টার পনটেট। বাঘের চামড়া, বুনো হাতির দাঁত আর কলাগাছের থামের মতো চারটি পা, ভালুকের চামড়া, এসব জিনিস কোনো হড় বিক্রি করতে গেলে মুক্ত হস্তে দাম দেন তিনি। বাঘের চামড়া দু-তিন টাকা, হাতির দাঁত দশটাকা জোড়া, চারটে পায়ের প্রতিটি দু-টাকা দরে কেনার পর ব্যবসায়ী হড়কে চুরুট উপহার দিয়ে তবে বিদায় করেন। হরিণের চামড়া সংগ্রহের প্রতি পুঁটিয়া সাহেব বিশেষ আগ্রহী নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তা বিক্রি করতে নিয়ে গেলে খালি হাতে ফেরে না। দু-চার আনা সে অবশ্যই পায়, অধিকন্তু বিদায়কালে চুরুট।

পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করানো, হিংস্র পশু নিধন, ইত্যাদি ব্যাপারে মিস্টার পনটেটর প্রবল উৎসাহ। তাঁর লক্ষ্য কিন্তু অন্যত্র, জঙ্গল বিলীন করে আবাদী জমি তৈরি ও বসতি স্থাপনা, যাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেভিন্যু তহবিলে অধিক তংকা জমা পড়ে। অধিকন্তু প্রজাবর্গের আনুগত্যলাভ। স্নেহের শাসনে নিবিড় বন্ধন দেওয়াই সাহেবের উদ্দেশ্য।

এ ব্যাপারে বহুকাল আগেই রাজমহলের সহকারী কালেক্টর আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড আদিবাসী পাহাড়ীদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে উদ্যম সফল হয়নি। কয়েক দশক পরে বীরভূম জেলা ও মেদিনীপুর অন্তর্গত সামন্তভূমি থেকে আমন্ত্রিত হড়দের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দামিন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাসের অধিকার দান করেছে। আর সেই সূত্রে প্রচুর সুখ-সুবিধের অঙ্গীকার, যা অধিকাংশই পুথিগত, তবু যাযাবর হড়ের নতুন ভূমিতে অভিযানের উৎসাহ প্রশমিত হয়নি।

রাজমহল ও ভাগলপুর জেলার কালেক্টরের পদে উন্নীত মিস্টার আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকলে হয়তো কোম্পানীর নতুন উদ্যমের প্রতিবাদই করতেন, কারণ আজীবনকাল তিনি প্রায় পাঁচহাজার বর্গমাইলব্যাপী পার্বত্য এলাকা ও তরাই অঞ্চল থেকে হড়ের উৎখাতের প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

তাঁর দৃষ্টিতে ছিল হড়্ স্বাধীন প্রকৃতির বিভীষিকা, পাহাড়ীরা প্রকৃতির সরল শিশুর মতো। হড়্ চিরদিনের সমস্যা ও শিরঃপীড়া, আর পাহাড়ীরা নির্বিবাদী।

পাহাড়ীদের শ্রী ও সম্পদবৃদ্ধি এবং দামিনঈকোহ্ অঞ্চল থেকে হড়্ সম্প্রদায়ের বিতাড়ন সম্বন্ধে যে স্বপ্ন চোখে নিয়ে ক্লীভল্যাণ্ডের মৃত্যু হয়েছিল তা সফল হয়নি। পাঁচহাজার বর্গমাইল পার্বত্য ভূভাগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হড়ের প্রবাহ ক্রমশই বেড়েছে, তাদের আগমনে অব্যাহতি আসেনি। সমুদ্রগামী নদীর মতো হড়ের ধারা প্রবাহের দুর্নিবার বেগ।

হড়্ পুরাণে কথিত, হড়্ স্থির হয়ে এক জায়গায় থাকেনি কখনো। পৃথিবীর সর্ব প্রান্ত প্রদক্ষিণ করেছে। রক্তে দ্রাবিড়ীয় ধারা, কিন্তু প্রকৃতি ও স্বভাবে বিশিষ্ট-জাতি বিশেষ। নিজস্ব রীতির কৃষ্টি-সম্পন্ন চলমান মানব-সম্প্রদায়। যাযাবর নয়, তবু যেন রক্তে চিরনূতনের সন্ধান-তৎপরতা।

হাজারীবাগ জেলায় দুই প্রধান হড়্ রাজ্য—ছৈ আর চম্পা। মুসলমান বাদশা ইব্রাহিম আলি তেরোশ' চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে সে দুটি গ্রাস করেন, পরে তিনি তা করদ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু যে হড়্ চিরদিন সর্বাংশে স্বাধীন তার অন্তরে সে প্রস্তাব এবং উপহারের প্রতিশ্রুতি গ্রাহ্য হয়নি। ছৈ ও চম্পা রাজ্যের হড়্ প্রাচীন অধিকারের মোহ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ অজানার উদ্দেশে পদযাত্রা করে; এমন এক ঘন বনানী যেখানে কোনো অ-হড়্ রাজকীয় আধিপত্য অথবা উৎপাত নেই, পর্বত ও জঙ্গলের দুরূহতা ভেদ করে সরকারি তহশিলদার প্রবেশ করতে না পারে, যেখানে রাজ্যের বেগার সিপাহীর তালিকাভুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাস্তি।

সর্ব ব্যাপারে আদর্শ এই পার্বত্য সানুদেশ। মাথার ওপর কোথায় মোগল বাদশাহীর ছায়া সে সন্ধান হড়্ কোনোদিন পায়নি। গভীর ঘনান্ধকার জঙ্গলের নতুন অধিবাসী হড়্ তো দূরের কথা, ঐ উঁচু পাহাড়গুলি যারা কয়েক হাজার বছর ধরে অধ্যুষিত করে রেখেছে, সেই পাহাড়ী সম্প্রদায়ের কাছেও বাদশাহী ফরমান কি বস্তু তা অজানা।

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম পদার্পণ, তারপর ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে হড়্ বাহিনীর দামিন অঞ্চলে প্রবেশ। বিশেষতঃ বিহার ও বঙ্গদেশের কয়েকটি স্থান, যা একদা হড়্ভূমি রূপে চিহ্নিত ছিল, সেই সব অঞ্চলের কিছু শত শতাব্দী প্রাচীন আবাসিক। ওদিকে বর্ধমান বীরভূম ও মেদিনীপুর, এদিকে হাজারীবাগ মানভূম মুঙ্গের আর ভাগলপুর।

হড়্ সম্প্রদায়ের স্থান পরিবর্তনের প্রাথমিক কারণ কুমারী বনানীর সান্নিধ্য উপভোগ। দ্বিতীয় কারণ পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলির জমিদার ও মহাজনবর্গের অত্যাচার। হড়্ জাতি কোনো জমিদারের আধিপত্য পছন্দ করে না, মহাজনও অসহ্য; কিন্তু এই দুই রাহু কেতুর গ্রাস থেকে তার কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহের অস্থি মজ্জা ও রক্ত কখনোই অব্যাহতি পায়নি। তাদের ভয়ে হড়্ দেশান্তরী, আর তারা হড়ের সন্ধানে হন্নে সারমেয়তুল্য।

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম আগত হড়্ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে এই পাঁচ হাজার বর্গমাইল পার্বত্য এলাকার মধ্যে দামিনঈকোহ্ নামে চিহ্নিত দেড় হাজার বর্গ মাইলে যে সংখ্যায় আত্মবিস্তার করেছে, তার তুলনায় আদি অধিবাসী পাহাড়ীর সংখ্যা নগণ্য। নৃকুলবিত্থার সশংক প্রশ্ন, পাহাড়ী কি ক্ষীয়মাণ উপজাতি? আদমসুমারীর উত্তর, এ আশংকা অমূলক, তবে দ্রাবিড় সম্প্রদায়ভুক্ত হড়েরই সংখ্যাধিপত্য। এবং বৃদ্ধিও গাণিতিক হারে।

রাজমহলের নিকটবর্তী বারাহাট। আঠারো'শ পঁয়ত্রিশ সালে মিস্টার পনটেট যখন দামিন এলাকার পর্যবেক্ষক পদের ভার গ্রহণ করেন তখন আরণ্যক অধিবাসী বলতে ঘন জঙ্গলে বন্য হাতির দল আর অজস্র চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু। তারপর মাত্র যোলো বছরের ব্যবধান আঠারো'শ একান্ন, সেখানে প্রায় পাঁচশ' আতো, যেগুলির একমাত্র আবাসিক হড়্। অবশ্য দীকু ও মোগল-রূপী কাঁটাগুল্মও এই অবসরে আত্মপ্রকাশ করছে।

হড়ের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সৃষ্ট শস্যসম্পদপূর্ণ শ্যামলী বসুন্ধরা, গোসম্পদ আর মহান শিল্পী অংকিত চিত্রপটের মতো সুন্দর ওড়াগুলি। পূর্ণিমা নিশীথে সেখানে সুরের লহরী, নৃত্যের সজীবতা, জীবনের অনাবিল কলকোলাহল। এদিকে এসে পড়লে মিস্টার পনটেট এখানো স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর পরিক্রমাব্যস্ত ঘোড়াটিও যেন অভ্যস্ত নিয়মে এখানেই বিশ্রামের অনুসন্ধান করে।

হড়ের আতো যেন বিশ্বস্ত স্নিগ্ধতার আকর।

পাঁচটা শাদা পয়সা দিয়ে দামিনের পুঁটিয়া সাহেব সাপের চামড়া কিনবেন, শুধু তাই নয়, বিক্রি উপলক্ষ্যে যে কজন হড়্ তাঁর সঙ্গে রাজমহলে গিয়ে দেখা করবে তাদের সকলকেই একটা করে চুরুট উপহার দেবেন তিনি—সাহেবী চুটি! উপরন্তু একটা নতুন ও আশ্চর্যজনক জিনিস পাওয়ার আনন্দে হয়তো বলবেন, রাত্তিরে তাঁর ওড়ায় অতিথি হয়ে দারু আর দাকা খেয়ে পরের দিন সকালে

ভাগনাডিহি ফিরতে। খোশমেজাজে থাকলে এমন ভোজ দু-একবার দিয়েও-ছেন তিনি। তাঁর অতিথিপরায়ণ চিত্তে উদারতার সীমা নেই।

পুঁটিয়া সাহেব লোক ভাল, কিন্তু তাঁর অধীনে ঐ যে মোগল সাজাওয়ালা, সে মামদোটা মোটেই সুবিধের নয়। হড়ের চিরকেলে শত্রু আর দীকুদের দালাল। বিশেষত তার সঙ্গে আবার দারোগার ষড়। আর তাদের যত দরদ পাহাড়ীদের ওপরই। পুরো দামিন এলাকা জুড়ে অমন চারটে সাজাওয়ালা, স্বভাবের দিক থেকে তারা সবাই একে আর একজনের ছায়া। এবং কায়ার দিক থেকে সব কটিই ঘোর শয়তান।

সাজাওয়ালা চায় না পুঁটিয়া সাহেবের সঙ্গে কোনো হড়্ দেখা করে, কথা বলে। কিন্তু যতই ব্যস্ত থাকুন, হড়ের মাদল আর বাঁশীর আওয়াজ পেলে সাহেব নিজেই ওড়া থেকে বেরিয়ে আসেন, কথা বলেন।

সারা দামিনের প্রতিটি হড়্ জানে পুঁটিয়া সাহেব তাদের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি, হড়্কে তিনি সত্যি সত্যিই ভালবাসেন, এবং মানুষের পরিপূর্ণ মর্যাদা দানে কার্পণ্য নেই তাঁর।

ছয়

সাপের হার্তা বেদাগ হওয়া চাই, তাই তার গলায় ফাঁসি টেনে মারা হয়েছে, এবার চামড়াটা আস্ত বজায় রেখে ভেতর থেকে হাড় মাংস সব কেটে বার করতে হবে।

চুটির ধোঁয়ায় মগজ ভরে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তার পর কানহু পরামর্শ দেয়, 'খুব ধারাল কাপি আর কাইদা দিয়ে মোচার ভেতর থেকে কেটে হার্তা উলটে নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়াতে হবে। হার্তায় দাগ পড়ে গেলেও সাহেব পুরো দামে কিনে নেবে, কিন্তু তেমন খুশি হবে না। বিংয়ের মোচা থেকে শুকুরীটা আগে টেনে বার কর।'

কথার শেষে কানহু নিজেই নিহত সাপটার মুখের দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃত শুয়োরের ঘাড় ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়, কিন্তু তা এক চুলও নড়ে না। সবিস্ময়ে আঁৎকে ওঠে সে, 'আই গ', শুকুরীটা বিংয়ের মোচার সঙ্গে একেবারে সেঁটে গেছে! আয় তো আরও বারপে হড়্, দু-তিনজন আয় দেখি?'

তাতেও অসুবিধে, এতগুলি মানুষ একসঙ্গে শুয়োরের গলাটা ধরার জায়গা পায় না। অবশেষে স্থির হয় গলায় দড়ি বেঁধে তিন চারজনে সেটা টেনে বার করবে, আর সেই সময় জনকয়েক সাপটাকে চেপে ধরে রাখবে।

কথাটা শুনে উৎসাহী মায়জিউ আর তরুণী ও যুবতী কুড়িরা এগিয়ে আসে, বলে, 'আমরা বিংটাকে চেপে ধরে থাকব, হড়্রা তার মোচা থেকে শূকরী টেনে বের করবে।'

'চেৎ চিকায়দা—কি বলছিস?' ভৈরব মাঝি সতিরস্কারে মেয়েদের দূরে সরিয়ে দেয়, 'ছি ছি ছি! কুড়িদের শিকার ছুঁতে নেই, তা জানিস না?'

ভৈরবের রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে সিধু একটু হেসে বলে, 'হড়ের অনেক পুরনো আনআরি বদলে ফেলতে হবে, তা না হলে হড়্ বড় হবে না।'

'আনআরি বদলালে হড়্ দীকু হয়ে যাবে।' শুয়োরের গলায় দড়ির ফাঁস লাগাতে লাগাতে ভৈরব মাঝি উত্তর দেয়।

কানহু সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে যায়, কিন্তু সিধুর কথার প্রতিবাদ করার বদলে ভৈরবের উক্তির প্রতিবাদ করে সে, 'না, হড়্ কখনো দীকু হবে না। হড়্কে দীকুদের চেয়ে অনেক বড় হতে হবে, তাদের শায়েস্তা করতে হবে।'

শুয়োরের মুণ্ডটাই কেবল মুখের মধ্যে নেবার অবসর হয়নি, তার আগে গলায় ফাঁসি নিয়ে সাপটা মরেছে, কিন্তু পুরো জীবটাকে টেনে বার করা হলে দেখা গেল শুধুমাত্র চামড়া ঢাকা করোটি ভিন্ন সমস্তই লো-বো; অস্থিহীন মাংসপিণ্ড। দেহে হাড়ের নিরাপত্তা নেই, কাঁচা মাটির তালের মতো মাংসপিণ্ডে যথেচ্ছ আকার-আকৃতি দেওয়া সম্ভব।

'উঃ, বিংয়ের ডাট্টায় কি ভয়ংকর জোর, বুনো শূকরীর ডাট্টাও এর কাছে হার মানে!' সাপের পেট থেকে নিষ্কাষিত শুয়োরের কায়িক অবস্থা দেখে ভৈরব মাঝি শিহরিত গলায় মন্তব্য করে।

এতক্ষণে দীঘল একটা কথা বলে, 'হ্যাং, ডাট্টা নয়, জাম্বের জোর—দাঁত নয় রে, আসল জোর চোয়ালের।' বলতে গেলে এই প্রথম কথা বলল সে, এ পর্যন্ত বিদেশী পথিকের মতোই নিশ্চুপ ও অন্যমনস্ক ভাব নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ছিল। বাহার মুখের একটা ক্ষোভোক্তি শোনার পর তার তিরিওর সুর কেটে গেছে, কথা হারিয়ে গেছে। মনের অস্বস্তি যেন কিছুতেই ঘোচে না।

একটা মেয়ের সামান্য মৌখিক অনুযোগ একজন শক্তসমর্থ হড়্কে কিরকম কাবু করে ফেলে তাই ভেবে নিজেই আশ্চর্য হয় দীঘল। মনটা একটু প্রতিহিংসা-

মুখর হয়ে ওঠে, আজ রাত্তিরে গড়ম যদি না আতোয় ফেরে এর উচিত জবাব দেবে সে। সুখের সঙ্গে হোক, দুখের সঙ্গে হোক, এই সমুচিত উত্তর বাহা চিরদিন মনে রাখবে।

কিন্তু এই মৃত শুয়োর কার সম্পত্তি, কেউ তো এখনো অধিকার সাব্যস্ত করতে এগিয়ে এল না? এ দুশ্চিন্তা আতো মাঝির। আসল ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ হওয়া চাই। কিন্তু কার শুয়োর, সন্ধ্যের আগে তার পাত্তা পাওয়া যাবে না। আতোর শুয়োরগুলো যখন যে যার খোঁয়াড়ে ফিরবে তখনই অনুপস্থিতের হিসেব ধরে সমস্যার সমাধান হতে পারে। সাপের চামড়া বিক্রির দাম থেকে ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। মস্তবড় শুয়োর, দাম অন্তত একটা শাদা পয়সা। তবু আতোর সার্বজনীন তহবিলে পুরো চারটে শাদা পয়সা জমা পড়বে।

হড়্ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিহ্নিত করার গরজ নেই বিশেষ। নদী অথবা ঝিলের মাছ, অরণ্য এবং পার্বত্যাঞ্চলের জীবজন্তু, বৃক্ষগুল্ম ফুল ও ফল মুক্তাকাশের বিহঙ্গকুল ইত্যাদি সব কিছু সির্সিজাওই প্রদত্ত সামগ্রীস্বরূপ সার্বজনীন সম্পদ। সেদিক থেকে সাপের চামড়া বা মাংসের ওপর ভাগনাডিহির সমস্ত হড়ের সমান অধিকার।

এখন হয়তো সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না, তবু ভৈরব মাঝি একবার উপস্থিত সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি চালিত করে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে জিজ্ঞেস করে, 'এই বিং খাওয়া শূকরীটা কার?'

সবাই পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করে, কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না। মিছে দাবিও জানায় না কেউ।

ভৈরব মাঝি আবার বলে, 'যার শূকরী সে কাল সকালের মধ্যে আমায় জানালে সাপের চামড়া বিক্রি করে তার দাম চুকিয়ে দেওয়া হবে।'

সিধু মন্তব্য করে, 'সবাই শুনেছে।'

নিখুঁত অবস্থায় অর্ধেকটা চামড়া ছাড়ানো হয়েছে। সাপটার গায়ে প্রচুর পরিমাণ পীতবর্ণ পাকা চর্বি, অল্প টানেই চামড়াটা বাহ্যিক পরিধেয়ের মতো খুলে আসছে, কোথাও চিমড়ে মাংসের দংশন নেই, তবু কানহু বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে অন্যদের সহযোগে চামড়া ছাড়ায়, 'হুঁশিয়ার, সাবধান, খুব সাবধান!'

ইতিমধ্যে দক্ষিণের মাঠের দিকে সবার দৃষ্টি পড়ে। একসঙ্গে দল বেঁধে জন

তিরিশ লোক এদিকে আসছে। উপরন্তু প্রায় সমসংখ্যক মেয়ে। পুরুষগুলির ভঙ্গি সবিশেষ উত্তেজিত। কারো হাতে তীক্ষ্ণাগ্র বর্ষা। কারো বা কাঁধে ধনুক, পিঠে তীরের তূণীর। হড়্ নয় ঐ আগন্তুকের দল, তারা মালের পাহাড়ী।

হাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রেখে ভাগনাডিহির হড়্রা এবং আরও পাঁচ সাত আতোর যত মায়জিউ হড়্ আর কুড়ি ঐ লোকগুলির দিকে সগর্বে তাকিয়ে রইল। তারা এসে দেখুক কেমন এক আশ্চর্য জীব শিকার হয়েছে।

হড়্ আর মালেরদের সম্পর্ক চির-বৈরী। খুব পরিস্ফুট না হলেও বিরোধ সর্বক্ষেত্রেই। বিদেশী পোণ্ড রাজার বশংবদ মালেরদের স্বাধীনচেতা হড়্ সহ্য করতে পারে না। হড়্ বৃদ্ধদের তিক্ত স্মৃতিতে এ বিষয়ে খানিকটা বিশেষ ইঙ্গিতও আছে।

তবু আতো ভাগনাডিহির মঙ্গলবারী হাটে বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকা থেকে মালের পাহাড়ীদের শুভাগমন হয়। আসে দূর রাজমহল, বা নিকটবর্তী বার-হারোয়া অথবা বাগ্নাহাটের পাহাড় থেকে। তিনপাহাড়ের পার্বত্যভূমি মাড়িয়ে আসার ব্যাপারেও বৈরাগ্য নেই। এইটুকুই সম্পর্ক, তাছাড়া হাটের মধ্যে অল্প-বিস্তর বিনিময়-ব্যবসা।

কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে কোনো পক্ষেই বিশেষ আগ্রহ নেই। পরস্পরের সওদায় বিনিময় উপযোগী বস্তু তেমন থাকে না। এদের যা, ওদেরও তাই। কোন্ হড়ই বা পাহাড়ীর কাছ থেকে চাকভাঙা মধু নিয়ে একখণ্ড কিচরি দেবে, কিংবা একটি ধাতু নির্মিত পাত্র, অথবা উতিন সনুম—সরষের তেল? বনজঙ্গলে ঘুরে হড়্রাও যথেষ্ট মধু সংগ্রহ করে। তবে একটি জিনিসে পাহাড়ীদের সবিশেষ লোভ; ঐ উতিন সুনুম। একবাটি তেল সংগ্রহের জন্যে তারা বোধহয় সবচেয়ে দামী জিনিসটা দিয়ে যেতে পারে।

পাহাড়ীদের প্রকৃত বিনিময়-ব্যবসা হড়্রমণীদের সঙ্গে। পাহাড় খুঁজে তারা নানা রঙের পাথর নিয়ে আসে। বিশেষত তিনপাহাড় আর রাজমহলের পাহাড়ীরা। তারা বলে খুব দামী পাথর, নীলা চুনি পান্না; কাঁচা পাথর, পাকা পাথর। হড়্ মেয়েরা তাদের কাছ থেকে পাথর নেয়, বিনিময়ে দেয় ধান আর ঢেঁকিতে ভাঙা পরিষ্কার চাল, কিংবা সরষের তেল।

ঐ দুটি জিনিস পাহাড়ীদের চিরকালই নিতে হবে, দালু পাহাড়ের বুকে ধান বা সরষের চাষ হয় না। আর গতর খাটিয়ে ফসল ফলাবে সে জীব পাহাড়ীরা কস্মিনকালেও নয়।

পাহাড়ী মানে আলস্য, পাহাড়ী মানে অলস এবং উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ, পাহাড়ী মানে চুরি ডাকাতি, পাহাড়ী মানে শ্বেত মার্জারের পদলেহন। ঐ ইংরেজ নামের বিদেশী শত্রু, হড়্ যার নামকরণ করেছে পোণ্ড পুষি।

পাহাড়ীরা কাছে এল। হড়্দের তুলনায় খর্বকায়; দেহে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পেশীর প্রত্যক্ষ স্বল্পতা। গাত্রবর্ণ ঈষৎ বাদামী। শরীরের অনুপাতে হাত ও পা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ যেন। দ্রাবিড়ীয় মুখাকৃতি, বিশেষত উচ্চতাবিহীন নাসিকার স্থূল ভূমিদেশ দেখে তাই মনে হয়। ভাষায় দ্রাবিড়ীয় শব্দাবলীর আধিক্য, এবং অপভ্রংশ। পুরুষগুলির মাথায় তৈলচর্চিত সযত্নরচিত সুদীর্ঘ বেণী, তাতে রঙীন ফিতে। শুধুমাত্র মুখ অথবা মাথার দিকে তাকিয়ে নারী পুরুষের ভেদাভেদ নির্ণয় করা কঠিন। পুরুষের রোমহীন মুখাবয়বে নারীর ভাববৈচিত্র্য।

নিহত এবং অর্ধেক চামড়া ছাড়ানো সাপটাকে কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করার পর পাহাড়ী সর্দার গুণীশ মালের রাজকীয় ভঙ্গিতে ভৈরব মাঝিকে কাছে ডাকল, 'তুই তো মাঝি, এদিকে শুনে যা?'

ভৈরব মাঝির হাতে রক্তমাখা কাপি, সেখান থেকেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি মাঝি।'

সর্দারের গলা ও বুক সরকারি চাপরাশ শোভিত, যা মাসিক তংকাভোগীর মর্যাদা ঘোষণা করে। চাপরাশটা নেড়েচেড়ে ঠিক করে নেয় সে, তারপর বাঁ হাতে ধরা সুচিক্কণ ফলার বর্শাটা হাতবদল করে বলে, 'এ সাপ এখানে এল কোথা থেকে; এটা তো আমার গিদরি পাহাড়ের ফসল, আমি একে কতদিন পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি?'

একটি পাহাড়ে একটি গ্রাম, কুটির-সংখ্যা পঁচিশ থেকে এক সওয়াশ'। সর্দারই পাহাড়ের সর্বময় অধিকর্তা, এবং এতবড় অচলায়তন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পাহাড়ের যাবতীয় বন্য পশু পক্ষী ও সরীসৃপ পাহাড়ী ফসল নামে অভিহিত।

'কোথায় তোর গিদরি পাহাড়?' অবজ্ঞাপূর্ণ অজ্ঞতা দেখিয়ে ভৈরব মাঝি প্রশ্ন করে।

'বারাহাট পাহাড়ের মধ্যে।' কথা বলতে বলতে দীর্ঘাঙ্গী বাহা মেঝেনের ওপর গুণীশ মালেরের দৃষ্টি পড়ে। বার দুই লোভাতুর চোখে তার দিকে তাকায় সে, তারপর আবার বলে, 'নেহাৎ দিনের বেলা এসেছি তাই, রাত হলে কথা না বাড়িয়ে সাপ কেড়ে নিয়ে যেতুম। তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু।'

উপস্থিত হড়্‌রা সর্দারের কথার মর্মার্থ ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু একটা বিরক্তিমাখা দৃষ্টি হেনে বাহা অন্য মেয়েদের পেছনে সরে দাঁড়ায়।

বাহার পাশেই ছিল হাজারবার ওড়া আর আতো ছেড়ে আস্থির হয়ে যাওয়া নিনকী মেঝেন, রমণী পরিবেষ্টিত সর্দারের দিকে তাকিয়ে সে রাগতস্বরে পার্শ্বোক্তি করে, 'অতগুলো নাগিনী নিয়ে রয়েছে তবু নতুন নাগিনী ধরার শখ, আমায় পাহাড়ে নিয়ে চলুক না, সাপ ধরতে আসা চিরদিনের মতন ঘুচিয়ে দিয়ে আসব।'

পাহাড়ী সর্দারের কথার উত্তর দিতে গিয়ে ভৈরব মাঝি সগর্বে বলে, 'হড়্‌ চুরি করে না, মিছে কথাও বলে না; চুরি ডাকাতি করে মালেররা, আর মিছে তো সবসময়ই বলে।'

সর্দার বিবাদের ভাষায় বলে, 'এ সাপ কি আমার গিদরি পাহাড় থেকে আসেনি?'

'বা-ই-ং!' খুব জোরের সঙ্গে ঘাড় নাড়ে ভৈরব মাঝি, 'না, এই সাপ হারাঠ পাহাড় থেকে ভাগনাডিহিতে এসেছিল, মারাংবুরু আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আচ্ছা বেশ, দেখা যাবে এ সাপ কার।' সর্দার গুণীশ মালের যেন ধমক দিয়ে কথা বলে।

গুণীশ মালেরের ধমক গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে ভৈরব মাঝি বলে, 'হ্যাঁ, তা দেখা যাবে, কিন্তু রাত্তিরে হড়ের আতোয় হাড়গারের মতন ঢুকলে তাকে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না। মিথ্যেবাদীর জড়—!'

সর্দার তিক্ত হাসি হাসে, 'আমি চেতে মালের পাহাড়ী, সবচেয়ে উঁচু জাত মিছে কথা বলি না। আমি বের গোঁসাই আর পাঁচ গোঁসাইয়ের দিব্যি নিয়ে বলছি, এ সাপ আমার গিদরি মালার ফসল—আমার গিদরি পাহাড়।' বলতে বলতে সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে, তারপর আবার বলে, 'রাত্তির অব্দি আর অপেক্ষা করার দরকার নেই, নে, তোরা এখুনি সাপটাকে তুলে নিয়ে চল্‌।' তারপর আবার সে ভৈরব মাঝির দিকে চোখ ফিরিয়ে আনে, 'সবাই শুনে নে, আমার নাম সর্দার গুণীশ মালের, আমি আমার নিজের গিদরি পাহাড়ের ফসল তুলে নিয়ে যাচ্ছি।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল কানহু, তামাশা দেখছিল, এবার ছুটে এসে হাতের রক্তমাখা সুতীক্ষ্ণ কাপিটা গুণীশ সর্দারের গলায় ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'তোর না

সর্দার গুণীশ মালের নয়, চিলিমিলি সাহেবের হপন। আর তোর ঐ বাপ চিলিমিলি সাহেব পোণ্ড সে তার হপন ; শাদা কুকুরের বাচ্চা। হড়ের হাত থেকে সাপ নিয়ে যেতে হয় লড়াই করে, কেড়ে নিতে হবে।'

সর্দারের ছ'টি পত্নী, জন পাঁচ উপপত্নী, সবাই হাজির এখানে, সর্দারের গলার ওপর কানহুর হাতের ধারালো কাপি বসে থাকতে দেখে তারা একসঙ্গে হাউমাউ করে উঠল। কানহুর কথা শেষ হওয়ামাত্রই হড়ের মাদল আর নাকাড়া যুদ্ধ দামামার রব তুলেছে। বহিরাগত হড়ের অনেকের সঙ্গেই তীরধনুক, প্রস্তুত হচ্ছে তারা। ভাগনাডিহির হড়্ অস্ত্রের সন্ধানে ওড়ার দিকে ছুটেছে।

কণ্ঠে সবিশেষ গাম্ভীর্য, অথচ খুব নরম স্বরে কানহু জিজ্ঞেস করে, 'যুদ্ধ করতে চাস সর্দার ? তাহলে তোর পাশ থেকে মেয়েদের সরে যেতে বল, তারপর চল ঐ মাঠে।'

সর্দার গুণীশ মালের কানহুর অস্ত্রধরা হাতটা নিজের গলার ওপর থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে ; পরাজিত কিন্তু অপমানবোধশূন্য স্বরে উত্তর দেয়, 'না, যুদ্ধ করব না।'

সর্দার গুণীশ মালেরের উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কানহু সাপের রক্তমাখা কাপিটা তার গলার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে উদার গলায় বলে, 'তবে তোরা এখান থেকে চলে যা, আমাদের এখন সাপের চামড়া ছাড়াতে হবে।'

পত্নী উপপত্নীবর্গ ও অন্যান্য সঙ্গী সঙ্গিনী এবং অনুচর পরিবৃত হয়ে সর্দার গুণীশ মালের চলে গেল। আজ হাটবার, কিন্তু হাটের পথ ধরল না, একেবারে আতো ভাগনাডিহি ছেড়েই চলে গেল বুঝি ! উপস্থিত যত হড়্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে যেন সারা পথটা এক নতুন বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ছায়া ছড়াতে ছড়াতে বিদায় নিচ্ছে, যা তাদের চিরন্তন রীতি।

চিলিমিলি সাহেবের ঐ বাচ্চাগুলোকে কানহু কোনোদিনই বিশ্বাস করতে পারে না, সহ্য করতে পারে না। সে ঘৃণা করে তাদের। শুধু সে-ই নয়, প্রতিটি হড়্। এ মনোভাব নানা গল্প আর উদাহরণের ভেতর দিয়ে তাদের পিতৃ-পিতামহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে।

পাহাড়ী মানে বিশ্বাস-ঘাতকতা, পাহাড়ী মানে শ্বেত মার্জারের চর, যে মার্জার চিরদিন হড়ের শত্রু। কেবল একটা পুঁটিয়া সাহেব নিয়ে সব পোণ্ড পুষির বিচার হয় না। হড়ের বংশানুক্রমিক স্মৃতিতে শাদা বেরালের যে পরিচয় লেখা

আছে তা কখনো ভুলে যাওয়ার মতো নয়। পোড়া ঘায়ের দাগ কোনোদিন মেটে না।

সাত

ষোলোই জুলাই সতেরোশ' আশি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারল ওয়ারেন হেসটিংসের ভাগলপুরে পদার্পণ। যদিও এ যাত্রায় ভাগলপুর তাঁর লক্ষ্য নয়, বারাণসীর উদ্দেশে গঙ্গাপথে যাত্রা, সঙ্গে সাতশ' ফৌজের নৌবহর। অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ওয়ার্ড।

হেসটিংসের উপস্থিত শিরঃপীড়া বারাণসী। রাজা চৈত সিং সবিনয়ে তাঁর প্রণয়পাশ এড়িয়ে চলেছেন, সেইজন্যে একটা আশু সাক্ষাৎ প্রয়োজন।

বারাণসী যাত্রী হেসটিংসের প্রথম বিশ্রাম রাজমহলের ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাসাদ সংগিদালানে। সেখানে চারদিন অতিবাহিত করার পর তিনদিন গঙ্গাপথে উজান বেয়ে তারপর ভাগলপুর।

ভাগলপুরে পৌছতে দুপুর পার হয়েছে। সময়ের গতি বিকেলের দিকে, তবে মাসটা জুলাই, তাই মনে হয় সারা দিনটাই যেন বাকি। সন্ধ্যে সাতটা না বাজলে অন্ধকার হয় না। তারপরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সন্ধ্যের ঘোর, মধ্যরাত উত্তীর্ণ হয়েও ঠিকমতো রাতের নিঝুমতা নেই।

শহরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রায় পঁচাত্তর একর জমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে খেলাৎ পেয়েছেন ক্লীভল্যাণ্ড। মাঝখানে উঁচু টিলায় মোগল যুগের একটি ক্ষুদ্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ। তারই ওপর তাঁর কুঠি। নবনির্মিত।

কুঠি-প্রান্তরের উত্তরে খরপ্রবাহিনী গঙ্গা। পশ্চিমে টিলাকুঠি ঘাট নামের মহাশ্মশান। এ এলাকাটুকু ছাড়িয়ে পশ্চিমাংশে পুরাণে বর্ণিত চম্পাইনগরী। চাঁদ সওদাগরের নিবাস, দাতা কর্ণের রাজধানী কর্ণগড়, এবং তারই উত্তর উপকণ্ঠে প্রাচীন উপনগর নাথনগর।

শহর ভাগলপুরের তুলনায় ঐ দুই অঞ্চল প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আধুনিক ব্যস্ততাভারে সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভাগলপুর শহরের নাম কোম্পানীর সর্বত্র সুপ্রচারিত, কিন্তু সেইসঙ্গে অসংস্কৃত পথঘাট, প্রাসাদ অথবা পাকা বাড়িহীন শহর, চোরডাকাতভীতি এবং বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত সর্পভয়ের কথাও কোম্পানীর

নথিপত্রে লেখা রয়েছে। শহরের সবিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে দু-চারজন প্রচীন ঘরানার জমিদার এবং নগর কাজি।

কুঠির প্রধান ফটকের কাছে এসে ঘোড়া থামালেন হেসটিংস, 'এই আপনার কুঠি ?'

আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড ঘাড় নেড়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে তোপের শব্দে হেসটিংসের স্বাগত ঘোষিত হল।

হেসটিংস সুপ্রসারিত ফটক পেরিয়ে অনিবিড় বনাচ্ছন্ন কুঠি-প্রান্তরে প্রবেশ করলেন। কয়েকটি পোষা হরিণ ও নীলগাই চরে বেড়াচ্ছে। লোহার খাঁচায় একজোড়া চিতাবাঘ! গোড্ডা অঞ্চলের পাহাড়ীদের কাছে ক্লীভল্যাণ্ডের প্রাপ্ত উপহার। পিলখানায় তিনটি হাতি আর আস্তাবলে ঘোড়া সাত-আটটি। গোরু মোষের গোয়াল। বিভিন্ন বৃক্ষশাখায় ময়ূর ময়ূরী। খুব ঘন ঘন কেকারব হেসটিংসের কানে এল।

জালের খাঁচায় হাঁস মুর্গী। উপরন্তু মাথায় সোনালী ঝুঁটি চীনে মুর্গী ও হাঁস। ছেড়ে রাখার উপায় নেই, দিনদুপুরেও শেয়ালের উৎপাত। গঙ্গা থেকে ভামও সেই লোভে উঠে আসে। আর রাতে নেকড়ে। তাদের উৎখাত করতে হলে কুঠিবাড়ির প্রকৃতিপুষ্ট ভাবও ঘুচিয়ে দিতে হয়। গাছে গাছে অজস্র পাখি। আর অনেক পাখি খাঁচায় বন্দী, যারা প্রকৃতির সহজ ডাকে সাড়া দিতে আসে না, অথবা এ দেশটাকে স্বদেশ বলে মনে করে না।

খেজুর তাল শাল মেহেগনি দেবদারু শিশু শিমুল ইত্যাদি বৃক্ষসমূহের গা ঘেঁষা রাস্তা অশ্বপৃষ্ঠে মাড়িয়ে টিলার নিম্নপ্রান্তে এলেন হেসটিংস। প্রায় পঁচাত্তর ফুট উঁচুতে প্রাসাদ, ওপরে উঠতে শতাধিক প্রশস্ত সিঁড়ি।

ক্লীভল্যাণ্ড ঘোড়া থেকে নেমে হেসটিংসের পাশে এসে দাঁড়ালেন, তারপর কুঠির দিকে একটি আঙুল তুলে সসংকোচে বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, ওপরে যাবার জন্যে ডুলির ব্যবস্থা আছে।'

প্রস্তাব শোনার পর হেসটিংস কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে ক্লীভল্যাণ্ডের মুখের দিকে তাকালেন, 'ডুলি! আপনি কি আমায় রোগী হিসেবে গণ্য করেছেন, এত লোকের চোখের সুমুখে ডুলিতে চড়িয়ে দুর্বল প্রমাণ করতে চান ?'

'না, না, ইওর এক্সেলেন্সি। আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড শশব্যস্ত উত্তর দেন।

তারপর খুব সহজ নিশ্বাসেই হেসটিংস অগুনতি সিঁড়ি ভাঙেন এবং কুঠির বারান্দায় উঠে এসে প্রায় দু-মিনিট অবধি চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মন্তব্য করেন,

'দেখছি আপনি এখানকার প্রিন্স, কলকাতার ইংরেজ বাদশা ওয়ারেন হেসটিংস-কেও ছাড়িয়ে গেছেন? ইচ্ছে হচ্ছে আপনার সঙ্গে বাসস্থান বদলে নিই', প্রাণহীন কলকাতা আমার আর মোটে ভাল লাগে না।'

হেসটিংসের মন্তব্য হয়তো সাধারণ প্রশংসামূলক উক্তি, অথবা ভেতরে গভীর অর্থ নিহিত। ক্লীভল্যাণ্ডের বিপুল ঐশ্বর্য তাঁর দৃষ্টিতে চৌর্যকৃত মনে হয়েছে নাকি? অবশ্য ক্লীভল্যাণ্ডের যা বেতন তাতে এমন রাজকীয় ঠাটবাট অসম্ভব। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অর্থার্জনের অজস্র উপায়, তবে তা চুরি পর্যায়ের কোনোটাই নয়। এ ধরনের সুযোগদান কোম্পানীরই নিজের কর্মচারীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। এবং সকলেই প্রায় অসংকোচে সুযোগ গ্রহণ করেছেন। রবার্ট ক্লাইভ পথিকৃত, হয়তো এরই আকর্ষণে তিনি সামান্য কেরানি থেকে গভর্নর জেনারেলের পদ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। স্বয়ং হেসটিংসও তাঁর অনুগামী।

হেসটিংসের মন্তব্যের উত্তর এড়িয়ে ক্লীভল্যাণ্ড সমীহপূর্ণ অনুযোগের ভাষায় বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, লাঞ্চের সময় তো পার হয়ে গেছে, আপনি অনেকক্ষণ অভুক্ত রয়েছেন!'

আমার খিদে রাস্তাতেই হজম হয়ে গেছে.' হেসটিংস উত্তর দেন, 'তবে আমার আপনাদের কথা স্মরণ রাখা উচিত ছিল, ভুলে গিয়েছিলাম বলে লজ্জিত। চলুন, লাঞ্চে বসে গল্প করা যাবে।'

বহিঃপ্রকোষ্ঠে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ভোজনালয়ে গিয়ে বসলেন হেসটিংস। প্রথমাবধি তাঁর কুঠির নির্মাণ-শৌকর্যের দিকে দৃষ্টি পড়েছিল, প্রায় সর্বত্রই গথিক নিদর্শন। সপ্রশংস কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আপনার শিল্পরুচির আমি ঈর্ষা করি। যুদ্ধ আর কূটনীতি পর্যন্ত শিল্পের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু কেউ তা সুনজরে দেখে না। আমার বিশ্বাস আপনার এই টিলাকুঠি ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক মর্যাদা পাবে, আপনিও একটি ঐতিহাসিক চরিত্রস্বরূপ গণ্য হবেন।'

মুখে স্মিত হাসি, কিন্তু নিরুত্তর রইলেন ক্লীভল্যাণ্ড। ঘোড়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়ানো এবং ঊর্ধ্বতনের সামনে মুখ খোলা বিশেষ বিপজ্জনক।

খাবার টেবিলে বসে হেসটিংস কিছুক্ষণ কাঁটা চামচ আর ন্যাপকিন নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, এবং সেই সময়টুকু বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনায় মগ্ন রইলেন তিনি।

ঈষৎ ক্ষুণ্ণ স্বরে ক্লীভল্যাণ্ড অনুযোগ করেন, 'আমায় ক্ষমা করুন ইওর এক্সেলেন্সি, কিন্তু আপনি তো প্রায় অভুক্তই রয়ে গেলেন ?'

হেস্টিংস ঘাড় নাড়েন, তিনি স্বভাবতই অল্পাহারী, উপরন্তু কদিন যাবৎ অনিয়মের দরুন শরীরও কিঞ্চিৎ কাহিল। এখানে দিনকয়েক বিশ্রামের পর বারাণসী পাড়ি দিতে হবে। সুদীর্ঘ পথের জলযাত্রা। তার পরবর্তী কালের শ্রম ও মানসিক ভারগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা চিন্তা করে এখন থেকেই বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন।

কিন্তু ক্লীভল্যাণ্ডের প্রশ্নের জবাব দেবার সময় এসব প্রসঙ্গের ধারে-কাছেও গেলেন না হেস্টিংস, মৃদু হাসিসহ বললেন, 'এই বিপুল আয়োজন দেখেই আমার দেহ আর দৃষ্টির খিদে মিটে গেছে। আমি এমনিতেই একটু কম খাই, উপরন্তু আমার মনে হয় চল্লিশ বছর পার হওয়ার পর অভিজ্ঞতার পদগুলো মনের মধ্যে এত বেশি জমা হতে থাকে যে তার ওপর আরও কিছু চাপাতে গেলে পরিপাকে গোলযোগ হবে।' তারপর এই টেবিলে বসেই ভোজ্য-তালিকার শেষ পদস্বরূপ তিনি এক পাত্র পাঁচশ' বছরের প্রাচীন ওল্ড পোর্ট ওয়াইন গ্রহণ করলেন।

বহুক্ষণ যাবৎ একটি প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন ক্লীভল্যাণ্ড, তারই সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন তিনি, কিন্তু সরাসরি বক্তব্যের কাছে না এসে একটু দূরত্ব রেখে প্রশ্ন করলেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, রাজমহল আপনার কেমন লাগল ?'

'মন্দ কি, ভালই!' হেস্টিংস গাম্ভীর্য ত্যাগ করে মৃদু হাসলেন। তারপর আবার বললেন, 'আপনার জেলার মধ্যে পড়ে তো, তাই আমার ভাল না লেগে উপায় কি ? তবে এ দেশ যতই ভাল লাগুক, আমার স্বদেশের মতো তো নয় ?'

'তা তো ঠিকই, ইওর এক্সেলেন্সি!' তৎক্ষণাৎ সায় দেন ক্লীভল্যাণ্ড, তারপর তিনি মুহূর্তেক বিরতি দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'সেখানে পাহাড়ীদের দেখলেন ?'

বাঁ চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে হেস্টিংস একবার পানপাত্রে চুমুক দিলেন, 'আপনি যেসব পাহাড়ী সর্দারদের মাসিক দশটাকা পাঁচটাকা তনখা দিয়ে সরকারি উর্দির কবলে নিয়ে এসেছেন, তাদের কেউ কেউ সদলবলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জহুরা নামের একজন সর্দার আমায় কিছু দামী পাথর আর একজোড়া ময়ূর উপহার দিয়েছিল। আর মধুর ভাঁড় তো প্রায় সবার হাতেই—!'

'তারা সবাই ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত আর খুনী,' সোৎসাহে ক্লীভল্যাণ্ড বলে যান, 'কিন্তু আমাদের কাছে সদয় ব্যবহার পেয়ে আর কিছু কিছু শর্ত মেনে নেওয়ার পর তাদের সাবেক অত্যাচার অনেক কমে গেছে। কি ভয়ংকর জীবই না ছিল ঐ সর্দার জহুরা!' কথার শেষে ক্লীভল্যাণ্ডের সারা শরীরে বিভীষিকার তরঙ্গ খেলে যায়।

সেই সময় রাজমহলের অ্যাসিসটেণ্ট কালেক্টার আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড, বয়স তাঁর মাত্র বাইশ। নিয়ত পাহাড়ীদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে তাদের সমূলে উচ্ছেদের জন্যে তিনি কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। রাজমহলের আশপাশে কয়েকটি পাহাড়ে অভিযান পরিচালিত করে পাহাড়ীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন, কিন্তু অভিলষিত ফল লাভ হয়নি।

প্রায়ই পাহাড়ের নিম্নভূমিতে পাহাড়ীদের আক্রমণ। প্রতিটি গ্রাম উত্যক্ত। জনজীবন তটস্থ। পাহাড়ীরা গ্রাম আক্রমণ করে, অগ্নি সংযোগ শস্য লুণ্ঠন গবাদি পশু অপহরণ নারী ধর্ষণ ইত্যাদি কয়েকটি নিয়মিত কাজ সম্পন্ন করার পর দু-চারজন মানুষকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রেখে যায়। ঘাটোয়াল জমিদারের বরকন্দাজ বাধা দিতে পারে না।

পাহাড়ীদের মূল লক্ষ্য দেশী গৃহস্থের বর্ধিষ্ণু গ্রাম, এবং হড়্ সুঁতারদের নতুন বসতি। ঝড়ের বেগে আসে, কাজ সমাধা করে ঝঞ্ঝাগতিতে দুর্ভেদ্য পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়।

আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের প্রতিরোধ যত দৃঢ়, পাহাড়ীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে ততই শ্রীবৃদ্ধি। তারপর এই প্রতিযোগিতার চরম পর্যায়ে এসে একদিন দিন দুপুরে সর্দার জহুরার নেতৃত্বে প্রায় চারশ' পাহাড়ীর খোদ রাজমহল শহরের বুকে অত্যাচারের তাণ্ডবনৃত্য হয়ে গেল। সেদিন সর্দার জহুরার শক্তি ও কর্মপদ্ধতির সমূহ পরিচয়। লুণ্ঠন-শেষে দশ-বারোজন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার। তারপর প্রতি একশ' গজ অন্তর এক একটি মানুষকে হত্যা করে নিজের প্রস্থানের পথ রক্তস্বাক্ষরিত রেখে গেল সে। সঙ্গে যুবতী বন্দিনী পাঁচ-ছ'টি।

এরপর ক্লীভল্যাণ্ডের বিরাটতর আয়োজন। সমস্ত বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ করে পাচশ' দেশী সিপাহী ও একশ' বৃটিশ সৈনিক সমভিব্যাহারে সর্দার জহুরার পাহাড়ে উঠে তাকে সদলে আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাঠালেন তিনি।

সর্দার জহুরা আত্মসমর্পণ করল না, দু-চারজন পারিষদসহ নিজেই সন্ধির

শর্তাদি আলোচনা করতে এল, এবং সেই রাতের জন্যে ক্লীভল্যাণ্ডকে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ।

জিদ চেপে গিয়েছিল ক্লীভল্যাণ্ডের। জিদের বশেই সম্পূর্ণ নির্ভীক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সৈন্যদল ফেরত পাঠিয়ে একাই পাহাড়ে রয়ে গেলেন।

ফৌজী লেফটেন্যান্টকে ডেকে ক্লীভল্যাণ্ড বললেন, 'যদি তৃতীয় দিনের মধ্যে না ফিরি তো ধরে নেবেন যে আজই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়ে গেছে। আর যদি সত্যি সত্যিই জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারি তাহলে জানবেন পাহাড়ী সমস্যার যথাসাধ্য সমাধান করে আমি ফিরেছি।'

তারপর জহুরার পক্ষ থেকে ক্লীভল্যাণ্ডের পূর্ণ সমাদর, কিন্তু এ-ও সে তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, হাজার হাজার বছর ধরে এই তাদের জীবনযাত্রার রীতি। তবে সন্ধি যদি হয় পাহাড়ী আর বৃটিশ পরস্পরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত হবে, কিন্তু অন্য জাতের ব্যাপারে এ শর্তরক্ষায় পাহাড়ীরা বাধ্য থাকবে না।

এ ধরনের সন্ধি অসম্ভব, তবু ক্লীভল্যাণ্ড তখুনি আলোচনার ইতি দিলেন না, সন্ধির একটা সূত্রই পরবর্তীকালে শতধা হতে পারে। তাই শর্তাদির প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে অপরাপর বিষয়ে এলেন তিনি।

ক্লীভল্যাণ্ড প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা জহুরা, যে মেয়েগুলোকে ধরে এনেছ তারা কোথায়?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট ওল্টায় সর্দার জহুরা, 'তারা নেই।'

তাহলে কি সর্দার জহুরা আবার তাদের যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়েছে, কিন্তু এ খবর তো সরকারি সূত্রে ক্লীভল্যাণ্ডের কাছে আসেনি? জহুরার জবাব পরিষ্কার উপলব্ধি করতে না পেরে তিনি সাশ্চর্যে জিজ্ঞেস করেন, 'তার মানে?'

'তাদের নিয়ে দু-একদিন ফুর্তি করার পর পাহাড়ের ওপর থেকে গভীর খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের অবস্থা এমন সচ্ছল নয় যে বাইরের মানুষকে চিরদিন পুষতে পারি। তারা পাতালে গিয়ে গোঁসাইয়ের কৃপায় ভালই আছে।' কথার শেষে তৈল-চিক্কন বেণী সমেত মাথা নেড়ে সর্দার জহুরা হাসে, তারপর সেই বিকট হাসি থামলে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মহুয়ার মদ্যভাণ্ডে চুমুক দেয় সে।

বৃথা প্রশ্ন, তবু ক্লীভল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করেন, 'তাদের রাজমহলে ফিরিয়ে দিয়ে এলে না কেন?'

'তাতে লাভ কি হত?' প্রতিপ্রশ্ন করে সর্দার জহুরা, তারপর নিজেই বলে,

তাদের কেউ ঘরে নিত না, সারাটা জীবন ভিক্ষে করে কাটাত। তাছাড়া লুঠের মাল ফেরত দেওয়ার নিয়ম আমাদের মধ্যে নেই।'

ক্লীভল্যাণ্ড নীরব কিছুক্ষণ, চিন্তা করেন; এমন হৃদয়হীন বর্বর নরসমাজের সঙ্গে কোনো সভ্য রাজকীয় শক্তির সখ্যতা সম্ভব নয়। সন্ধি অসম্পূর্ণ রেখে রাজ-মহলে ফিরে যাবেন তিনি। তারপর বৃহত্তর বাহিনী এনে জহুরাকে সদলে নিধন করবেন।

কিন্তু একটা জহুরা ও তার কিছু অনুচরের শাস্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ পাহাড়ীকে শায়েস্তা করা কি সম্ভব? এর জন্মে বিপুল আয়াসের প্রয়োজন। পাহাড়বাসী প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে চতুর্গুণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এতখানি সাধ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নেই। থাকলেও বণিক রাজশক্তি এ ধরনের ক্ষতির ব্যবসায়ে নামতে রাজী হবে না।

চিন্তাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক নিয়েই ক্লীভল্যাণ্ড প্রথমবার ফিরে এলেন। তারপর বহুবার পাহাড়ে গেছেন তিনি। জহুরার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছে। তারই মধ্যস্থতায় আরও পঁচিশজন পাহাড়ী সর্দার আর অনেকগুলি উপসর্দারের মাসিক তন্‌খা বেঁধে দিয়ে সরকারি আওতায় এনেছেন। চোরের সাহায্যে চোর নিপাত, এই নীতি স্মরণ করে তেরোশ' পাহাড়ী ডাকাত সংবলিত রক্ষীবাহিনী, হিল রেঞ্জার ট্রুপ গড়েছেন।

রক্ষীবাহিনী হাতে বন্দুক চায়, কিন্তু আপাতত তাদের সাবেকী অস্ত্র, হাতে বর্শা আর কাঁধে তীরধনুক দিয়ে সেই চাহিদায় ক্লীভল্যাণ্ড স্তোক দান করেছেন। এ কেবল পারস্পরিক বিশ্বাস উৎপাদনের সূত্রপাত, কিন্তু এত অল্প দানে চিরন্তন শান্তিক্রয় আশা করা যায় না, আরও বহুবিধ প্রলোভনের পাশে জড়িয়ে তাদের বন্ধুত্বে স্থায়িত্ব আনতে হবে, যেন হঠাৎ আবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ না হয়।

আট

ক্লীভল্যাণ্ডের শিহরণ হেসটিংস লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন, 'জহুরার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তো মনে হল সে আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে, আর তাকে খুব খারাপ মানুষ বলেও বোধ হল না?'

বিশেষ দ্রুততার সঙ্গে উত্তর দিলেন ক্লীভল্যাণ্ড, 'না ইওর এক্সেলেন্সি, খারাপ তারা কেউ নয়, পরিস্থিতি আর দারিদ্র্য তাদের দিয়ে নিষ্ঠুর কাজ করিয়েছে। আমার মনে হয় তাদের বর্তমান পরিবেশ যদি বদলে যায় ভবিষ্যতে তারা বৃটিশের একান্ত বিশ্বস্ত প্রজায় পরিণত হবে। এখন তো দেখছি নিজেরাই শক্রর কবলে পড়ে রয়েছে!'

হেসটিংস উত্তর দিলেন না, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ক্লীভল্যাণ্ডকে বলে যাওয়ার সুযোগ দিলেন তিনি।

'পাহাড়তলীর সুঁতাররাই পাহাড়ীর প্রধান শত্রু।' সবিশেষ উত্তেজনার সঙ্গে ক্লীভল্যাণ্ড বলে চলেন, 'কে এই সুঁতাররা? এরা তো সম্পূর্ণ বর্বর! এ অঞ্চলে নতুন আমদানী; হাজারীবাগ বীরভূম আর মেদিনীপুর জেলা থেকে এসে পাহাড়তলীর জঙ্গল কেটে বসবাস আরম্ভ করেছে। কে ঐ বর্বরগুলোকে ডেকে এনেছে? সাপের চেয়েও ভয়ংকর, বাঘের চেয়েও হিংস্র; তারা সাপ খায়, বাঘ খায়। সংস্কৃতি বা সভ্যতা বলতে কিছু নেই। প্রাগৈতিহাসিক কালের মানব-সভ্যতার ধারক আর বাহক বলে তারা দাবি করে, কিন্তু নিজেদের একটা অক্ষর পর্যন্ত নেই।'

ক্লীভল্যাণ্ডের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে হেসটিংস প্রশ্ন করেন, 'আমি সুঁতারদের সম্বন্ধে রাজমহলে শুনে এসেছি; কিন্তু পাহাড়ীদের ব্যাপারটা আপনি কি যেন বলছিলেন?'

নিজের মূল বক্তব্য একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন ক্লীভল্যাণ্ড, কারণ প্রায় বছরখানেক আগে পাহাড়ীদের উন্নতিকল্পে কাউন্সিলে প্রস্তাব পাঠিয়েও উত্তর পাননি তিনি। এর অর্থ সে প্রস্তাব হয়তো বা উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি বললেন, 'ইতিপূর্বে হিল ট্রাইব সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, কাউন্সিলের সেক্রেটারি তার প্রাপ্তি-সংবাদটা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত চিঠির উত্তর আসেনি। আমার মনে হয় যে, ইওর এক্সেলেন্সি নেটিভ রাজাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় সেক্রেটারি সে চিঠিখানা আপনার সামনে উপস্থিত করতে পারেননি?'

পানপাত্র আবার হাতে তুলে নিয়ে একটি চুমুক দিলেন হেসটিংস, তারপর ক্লীভল্যাণ্ডের চোখে না পড়ে এমন নীরব ও রেখাশূন্য হাসিতে মুখটি এক নিমেষের জন্য চিত্রিত করেই গম্ভীর মুখাবয়ব নিয়ে উত্তরে বলেন, 'কোন্ চিঠির কথা বলছেন, যার একটা অংশ ছিল, It is but constant with our own

principles of justice and humanity to use every means in our power to avoid a state of warfare; why should they be denied to this unfortunate people? আপনার এই চিঠির সঠিক তারিখটা আমার মনে পড়ছে না, তবে নভেম্বর সতেরোশ' আশিতে লেখা?' কথার শেষে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্লীভল্যাণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সলজ্জ ভঙ্গিতে হেসে হেসটিংসের বন্ধন থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিলেন ক্লীভল্যাণ্ড, 'হ্যাঁ, ইওর এক্সেলেন্সি, এই চিঠির কথাই বলছি। আপনার পড়ার অবসর হয়নি, এ ধরনের অর্বাচীন মন্তব্য করার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত।'

'না, দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই' 'হেসটিংস বলেন, 'প্রায় ন-মাস পার হয়ে যাওয়ার পরও জরুরী চিঠিপত্রের উত্তর না পেলে যে কোনো লোকের এ ধারণা করার অধিকার এসে যায়। যাক্, এখন তো আমি সমুখে উপস্থিত, আপনি অসংকোচে সমস্ত বিষয়ে সরাসরি আলোচনা করতে পারেন। আপনার যা প্রস্তাব তা আবার বলুন?'

ক্লীভল্যাণ্ডের বক্তব্য বিপুল, প্রস্তাব অনেকগুলি, উপরন্তু বহুকাল যাবৎ তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চিত থেকে বিবিধ চিন্তা ও পর্যালোচনার শাখা প্রশাখায় বর্ধিত। হেসটিংসের হাস্য ও পরিহাসময় উদার ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ, কিন্তু তবুও ভয়, বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে না পারলে হয়তো মধ্যপথেই নেতি-বাচক রায় দিয়ে হেসটিংস সব সম্ভাবনার মূল কেটে প্রশ্নের সমাধান করবেন।

হেসটিংসের প্রাথমিক চিন্তা দেশীয় রাজা মহারাজা আর নবাববর্গকে কোম্পানীর করপুটে আবদ্ধ করা, শাসন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচী।

রাজমহল অম্বর দুমকা আর গোড্ডা পার্বত্যাঞ্চলের আদি অধিবাসী পাহাড়ী। এই দেড় হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ডের স্থান-পরিচিতি দামিনঈকোহ্। পার্শী শব্দ: অর্থ, পার্বত্য সানুদেশে ঘন বনানীপূর্ণ প্রকৃতির শ্যামলী অঞ্চল। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পার্বত্যভূমিও দামিনভুক্ত।

দামিনঈকোহ্র প্রকৃত আদিবাসী পাহাড়ী। রাজমহল আর গোড্ডায় তাদের পরিচয় মালের পাহাড়ী। ভাষা এবং অঙ্গসৌষ্ঠবে দ্রাবিড়ীয়, সামাজিক রীতিনীতিও কতকটা তদনুরূপ।

ওদিকে অম্বরভূমি এবং দুমকার পর্বতশ্রেণীতে মাল পাহাড়ীদের বসবাস। মালার অর্থ পাহাড়। তাদের ভাষা ও সভ্যতা কতকাংশে হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। মূলত তারা গোঁসাই নামধেয় সূর্যের উপাসক। পরবর্তী স্তরের

দেবী ধারতি মাই ও সিংহবাহিনী।

মালের এবং মাল পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে গরমিল প্রখর। বৈরিতাও সুস্পষ্ট। তবু বিভেদ যতই থাক, মূল প্রসঙ্গ স্বভাবে তারতম্য নেই। উভয়েই ঘোর অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়। সাধারণত অলস, কিন্তু প্রকৃতি রীতিমতো হিংস্র। কয়েক হাজার বছর আগে ভারতে আগত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাং এদের যে অপরাধপ্রবণ উপজাতি স্বরূপ বর্ণিত করে গেছেন এতকাল পরেও তাতে তিলমাত্র সুষ্ঠু বিবর্তন নেই।

প্রায় অকৌতুহলী স্বরে হেসটিংস প্রশ্ন করেন, প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ, 'এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—?'

এ বিষয়ে ক্লীভল্যাণ্ড প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি উত্তর দিলেন, 'পাহাড়ীরা চিরদিনই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী। এক একটা পাহাড় এক একজন সর্দারের স্বশাসিত রাজ্য। বন্য জন্তু শিকার আর পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে বন পরিষ্কার করার পর অল্প পরিশ্রমে যেটুক বজরা এবং জনারের ফসল পাওয়া যায়, তাই সম্বল। তারপর পরিপূরক জীবিকাস্বরূপ পাহাড়তলীর গ্রামগঞ্জে চুরি ডাকাতি গোরুমোষ হরণ।'

'কিন্তু তারা তো আপনার বিশেষ ভক্ত ?' হেসটিংস মৃদু হেসে প্রশ্নাকারে বললেন।

ক্লীভল্যাণ্ড উত্তর দিলেন না, সলজ্জে মাথা নত করলেন।

'তারপর ?' হেসটিংস জিজ্ঞেস করেন।

উত্তরে ক্লীভল্যাণ্ড আবার বলে চলেন, 'আমি চিন্তা করে দেখেছি, দামিন-ঈকোহ্‌র তরাই অঞ্চল থেকে সুঁতারদের সরিয়ে দিয়ে পাহাড়ীদের সেখানে নামিয়ে আনতে হবে। দামিনঈকোহ্‌র শাসন-ব্যবস্থা কোম্পানীর নিজের হাতে নেওয়া দরকার, দেশী জমিদার থাকবে না কেউ। পাহাড়ীরা হবে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ প্রজা। যে যতটা জমি চাষ করতে পারবে ততখানি তার নামমাত্র খাজনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তারপর সাধারণ আইন আর কাজির আদালতের আওতা থেকে পাহাড়ীদের মুক্তি দিয়ে তাদের জন্যে নিজস্ব আদালত গড়ে দিতে হবে। তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের বিচার করবে।'

সুদীর্ঘ আলোচনার অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে হেসটিংস প্রশ্ন তোলেন, 'কিন্তু দামিনঈকোহ্‌ থেকে উচ্ছেদ করলে সুঁতাররা যাবে কোথায় ? আমি রাজমহলের কাছে পাহাড়তলীতে তাদের গ্রাম দেখেছি, চাষের জমি দেখেছি, দূর থেকে মনে

হয় কোনো বড় শিল্পীর তুলিতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ! তাদের সংসার কোথায় তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলবেন?

হেস্‌টিংসের তুলনায় নিজের পদের বিপুল নিম্নতা এবং ব্যবধান ভুলে ক্লীভল্যাণ্ড তর্ক তোলেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে নেই। মাত্র বিশ পঞ্চাশ বছর বসবাসের ফলে বহিরাগতদের কায়েমী স্বত্ব অর্জন হয় না। তারা কোথায় যাবে সে চিন্তা-ভাবনা তাদের। ইচ্ছে হয় সীমান্ত প্রদেশের দিকে চলে যেতে পারে, বা কোনো মরুভূমিতে গিয়ে বসবাস করবে। মোটের ওপর যেসব অঞ্চলে পাহাড়ীদের হাজার হাজার বছরের অধিকার, সে জায়গা তাদের জন্যেই চিহ্নিত করে দিতে হবে।'

ক্লীভল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ মনোভাব উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে হেসটিংস যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, 'মনে করুন স্থঁতাররা যদি সহজে সরে যেতে রাজী না হয়?'

'তাহলে যুদ্ধ হবে, ক্রুশেডের মতোই ধর্মযুদ্ধ।' দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন ক্লীভল্যাণ্ড।

ক্লীভল্যাণ্ডের উত্তর শুনে হেসটিংসের অন্তঃকরণে বিপুল হাসির প্রবাহ, কিন্তু সে হাসি নীরবেই পানপাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেন তিনি, তারপর বলেন, 'বেশ, আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী যদি সব কাজ করা যায় তার ফল কি হবে বলে মনে করেন?'

পূর্বচিন্তিত উত্তর দেন আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড, উক্তিতে সামান্যতম দ্বিধা অথবা জড়তা নেই, 'তাহলে পাহাড়ীরা খুব শিগ্‌গির সুসভ্য উপজাতি হিসেবে পরিচিত হবে যার সমস্ত কৃতিত্ব আমাদের।'

ক্লীভল্যাণ্ডের কথায় অবুঝ প্রত্যয়ের পরিপূর্ণ নিদর্শন লক্ষ্য করে হেসটিংস বিস্ময় অনুভব করেন। হয়তো বা তারুণ্যের জিদ্! তবু তিনি শিথিলভাবে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি মনে করেন এতে পাহাড়ীদের মানসিক বিবর্তন আনতে পারবেন? জাতির চরিত্র কি সহজে বদলে দেওয়া যায়?'

হেসটিংসের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ক্লীভল্যাণ্ড মাথা নিচু করেন, কিন্তু এই ভঙ্গির ভেতর থেকেও যেন আত্মবিশ্বাসে উদ্ধত আর এক বিশেষ ভঙ্গিমা গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়েছে। খুব ধীর এবং সমীহ আনুগত্যের সঙ্গে তিনি জবাব দেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, আমি বিশ্বাস করি পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্রেরও আমূল পরিবর্তন হয়।' তারপর কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করে তিনি বলেন, 'ইংল্যাণ্ডের

ইংরেজ আর ইংল্যাণ্ড থেকে যে ইংরেজ ভারতে এসেছে, স্বভাবের দিক থেকে তারা একরকম কিছুতেই নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন হেসটিংস, ক্লীভল্যাণ্ডের মন্তব্য তাঁর অন্তরের কোথায় গিয়ে আঘাত করে যেন, কিন্তু সে আহত ভাব সামলে নিয়ে সস্নেহে বলেন, 'মিস্টার ক্লীভল্যাণ্ড, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের ওপর রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি নির্ভর করে না। হিন্দু বৌদ্ধ বা মুসলমান যুগের শাসকরাও ঐ পাহাড়ী জাতটাকে স্থায়ী শিরঃপীড়া মনে করে চিরদিনই এড়িয়ে গেছে।'

হেসটিংসের কথা শুনে ক্লীভল্যাণ্ড অপদস্থ বোধ করেন, তাঁর উৎসাহী ও উজ্জ্বল মুখভাব নিমেষের মধ্যে নির্বাপিত প্রদীপশিখার মতো তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভাগলপুর শহরের সুজাগঞ্জ এলাকায় নিয়মিত দাসদাসী বিকিকিনির হাট বসে। কাজির কাছে নফর আর বৌণ্ডী ক্রয়বিক্রয়ের দলিল দস্তাবেজ পঞ্জীবদ্ধ হয়, সে সময় নতুন প্রভুর কাছে আত্মবিক্রিত দাস-দাসীদের দেখেছেন ক্লীভল্যাণ্ড, নিজেকেও তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও কাজের অধিকার-রহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিলমোহর অঙ্কিত নফরের অতিরিক্ত আর কিছু মনে হয় না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ক্লীভল্যাণ্ডের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসটিংস ধীরে ধীরে বললেন, 'মিস্টার ক্লীভল্যাণ্ড, দেশ শাসনের ব্যাপারে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। নৈতিক দিক থেকে আমি যদিও বা আপনাকে সমর্থন করি, কিন্তু কার্যত সব ব্যাপারে সায় দেওয়া শক্ত। পেটি রাজা আর নেটিভ জমিদার, তারাই তো আমাদের রক্ষাকবচ! ভারতে এখন আমাদের রাজ্য-বিস্তার চলেছে, পূর্ণমাত্রায় শাসন বজায় রাখতে হলে ঐ দুই হাতিয়ার হাতছাড়া করলে চলবে না। এজন্যে তাদের খুশি রাখা প্রয়োজন। তা না হলে ভবিষ্যতে যে দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা দেবে সারা ইংল্যাণ্ডের মানুষ উঠে এলেও সে পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না।'

বোধহয় অগত্যাভাবেই ক্লীভল্যাণ্ড স্বীকার করেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, আমি এতটা তলিয়ে চিন্তা করিনি।'

ক্লীভল্যাণ্ডের কথায় কর্ণপাত না করে হেসটিংস চিন্তাসমাবৃত স্বরে বলে চললেন, 'এ ছাড়া আমাদের প্রায় বাধ্য হয়েই দেশী সিপাহীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হচ্ছে। আজ হোক, বা একশ' বছর পরেই হোক, বিদ্রোহ অবধারিত। সেদিন ঐ কুকুরমুখো রাজাগজা আর হায়না স্বভাবের জমিদাররাই আমাদের বাঁচাবে, কারণ ধনী ব্যক্তিরা চিরদিন রাজশক্তির পা ঘেঁষে থাকতে চায়, আর

তাদের কাছে স্বজাতির রক্তের চেয়ে মিষ্টি অন্য কিছু নেই। রাজশক্তির পদচ্ছায়াই ধনী ব্যক্তিদের সবচেয়ে আরামদায়ক জায়গা। স্বজাতির রক্তেই তাদের স্বাস্থ্যপুষ্টি!'

হেসটিংসের তুলনায় নিজের পদের বিপুল নিম্নস্থতা ভুলে ক্লীভল্যাণ্ড প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি ভারতবাসীদের ঘৃণা করেন?'

ক্লীভল্যাণ্ডের অনধিকার প্রশ্নে হেসটিংস বিরক্ত হলেন না, কারণ তিনিই সম্যক আলোচনা অবতরণ করেছেন: উত্তর দিলেন, 'না মিস্টার ক্লীভল্যাণ্ড, সাধারণ ভারতীয়দের আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি। ভারতীয় পণ্ডিত বা দার্শনিকদের জ্ঞানের বিপুলতায় বিস্ময় বোধ করি। এখানকার শিল্পীরাও অতুলনীয়, কিন্তু ধনী মানুষগুলো ভয়ংকর জীব সব। যে দেশে ব্যাপক পর্যায়ের শিল্প নেই, বৈদেশিক বাণিজ্য নেই, সে দেশে কেউ যখন ধনী হয়ে ওঠে, সে সম্পদ আশ-পাশের জনসাধারণের রক্ত শোষণের ফল। আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে ঐ রক্ত-চোষা কুকুরগুলোকে পুষতে হবে। এরপর কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাদের গলায় যদি খেতাবের বগলস পরিয়ে দেওয়া যায় তো আর কোনো কথাই নেই!' '

হেসটিংস স্থগিত দিতে কি যেন বলতে গেলেন ক্লীভল্যাণ্ড, 'ইওর এক্সেলেন্সি—

হঠাৎ খুব ক্লান্তি অনুভব করছেন হেসটিংস, সারাদিন শরীরের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে, মনও এখন বিশ্রামমুখর। উপস্থিত প্রসঙ্গে বিরতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন করেন, 'মিস্টার কালেক্টার, আপনার বয়েস কত হল?'

বিনীত দম্ভের সঙ্গে ক্লীভল্যাণ্ড উত্তর দেন, 'বয়েসের দিক থেকে আমি সাতাশ বছরের প্রাচীন জীবন-সেতুর ওপর এসে দাঁড়িয়েছি।'

হেসটিংস আবার গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন, 'যেদিন আপনি সাতান্ন হবেন, ততদিন অবধি যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আবার আলোচনা করার বাসনা রইল।'

· 'ইওর এক্সেলেন্সির অনুগ্রহ আর প্রতিশ্রুতির জন্যে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ', কথাটা বিমর্ষ স্বরে ক্লীভল্যাণ্ড বলেন, 'কিন্তু আমার জীবনে তিরিশ বছর বয়েস আসারও সম্ভাবনা নেই। সেই বয়েসের জন্মোৎসব আমায় কবরের মধ্যে শুয়ে থেকে পালন করতে হবে।'

'তার মানে?' চমকিত স্বরে হেসটিংস প্রশ্ন করেন।

হাসবার চেষ্টা করেন ক্লীভল্যাণ্ড, তারপর উত্তর দেন, 'একজন স্ুঁতার আমার

মুখ দেখে কথাটা বলেছিল। তার নাকি অনেক আশ্চর্য শক্তি আছে!'

হেসটিংস উত্তেজিতভাবে বলেন, 'আপনি এসব বুজরুকি বিশ্বাস করেন? এই ধরনের দুর্বলতার জন্যে আমি আপনাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করতে পারি। তার আগে ঐ লোকটা কে তা আমায় ভাল করে খোঁজ নিতে হবে।'

সবিশেষ অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন ক্লীভল্যাণ্ড, আকস্মিক উক্তি সামাল দেবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি, বললেন, 'তেমন কেউ নয় ইওর এক্সেলেন্সি, সে একটা মূর্খ সুঁতার!'

নয়

ভাগলপুর শহর হেসটিংসের বিশেষ পছন্দ নয়। শহরের পত্তনই হয়নি ভাল করে। মনে হয় বনবাদাড়। এর চেয়ে বরং বাংলাদেশের গণ্ডগ্রামও শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে হেসটিংস আলাপ করতে চান। দুর্ধর্ষ পণ্ডিত আর মৌলবী। তাঁরা এসে ভাগলপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা শুনিয়ে গেছেন। অধিকাংশই পৌরাণিক উপাখ্যান। প্রমাণ খুঁজতে গেলে এক মাইল গভীর মাটি খুঁড়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে, কিন্তু সে উৎসাহ কার আছে?

তবু হেসটিংস একদিন সময় করে শহর ঘুরে এলেন। চম্পাইনগর ও নাথনগরের জৈন মন্দির, এবং শহর ভাগলপুরে গঙ্গাঘাটে বুড়োনাথ শিবমন্দির। আর ওদিকে খঞ্জরপুরে শাজাহানপুত্র সাহ সুজার সৈন্যাধ্যক্ষ খঞ্জরীবেগের মকবরা। তাতারপুরের দিকে দু-একজন গাজী পীরের পীঠস্থান। আর কোনো দ্রষ্টব্য স্থানের হদিস নেই।

লোকে বলে ভাগলপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা, কিন্তু সে প্রমাণের তাগিদে শীতকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। হেসটিংসের স্থিতিকাল আর মাত্র দু-তিনদিন, যতক্ষণ পর্যন্ত না কলকাতা থেকে বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী এসে পৌছচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যেন তাঁর কর্মহীনতার অবরোধে পড়ে দম বন্ধ হয়ে এসেছে। টিলাকুঠিতে প্রথম প্রবেশের সময় মনে হয়েছিল জায়গাটা বুঝি মুক্ত প্রাণের আকর, এখন উপলব্ধি হচ্ছে সর্বত্রই জনজীবনহীন শ্মশানের স্তব্ধতা।

তবু ভাল, ক্লীভল্যাণ্ডের চমৎকার লাইব্রেরি রয়েছে। ফরসির নল মুখে দিয়ে প্রায় অষ্টপ্রহর লাইব্রেরিতেই বসে থাকেন হেসটিংস, মাঝে মাঝে মনের মধ্যেকার

বিরক্তি স্তব্ধ কণ্ঠে বর্ষাকালীন কেকারবে কান পেতে দেন, অথবা দাত্যূহকণ্ঠের একতারা শ্রবণে চেতনা মগ্ন করেন, তাতেই একঘেয়েমি অপনোদনের প্রয়াস।

প্রাতরাশ শেষ করে হেসটিংস লাইব্রেরি-ঘরে এসে বসেছেন। ক্লীভল্যাণ্ড তাঁকে নিজের হাতে বই বেছে দিচ্ছেন। কদিন একত্রবাসের ফলে তাঁর কথাবার্তা বেশ সহজ হয়ে এসেছে। মনের কথাগুলি খুব স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন তিনি ; বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, আমি বই সংগ্রহ করতে ভালবাসি, কিন্তু বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে পড়তে পারি না। কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হয় লেখকের চেয়ে আমার বেশি কিছু বলার আছে, এবং তা আরও গুছিয়ে বলতে পারি। তা যে কোনো বিষয়েরই বই সম্বন্ধে হোক না কেন !'

আলবোলার নল মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে হেসটিংস উত্তর দিলেন, 'আমার কিন্তু বিপরীত। এমনকি হাতের কাছে যদি অ্যালফাবেটের বইও এসে যায় পাতা উল্টে দেখি এ-ও যেন নতুন ! কেবল বই সংগ্রহ করলেই বা ঘাঁটলেই পাঠক হওয়া যায় না ; শিক্ষিতের জগতে লেখকের চেয়ে প্রকৃত পাঠকের সংখ্যা অনেক কম।' তারপর হেসে বললেন, 'আমি অবশ্য নিজেকে একজন সত্যিকার পাঠক মনে করি। আমার ধারণা আপনি চেষ্টা করলে বেশ ভাল লেখক হতে পারবেন, কারণ লেখকের যা গুণ তা আপনার আছে ; অপরের রচনার প্রতি অনীহা, বিশেষত যারা সমসাময়িক কালের লেখক। লেখক যখন পাঠক তখন সে খুবই অধৈর্য।'

আরও কিছু বলতেন হেসটিংস, কিন্তু হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে একান্ত উৎকর্ণভাবে কি যেন শুনতে লাগলেন, তারপর ক্লীভল্যাণ্ডের মুখের দিকে সপ্রশ্নে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার ক্লীভল্যাণ্ড, কোথায় যেন বাজনা বাজছে না ?'

ক্লীভল্যাণ্ডও শুনেছেন, হেসটিংসের তুলনায় তাঁর শ্রবণশক্তি অধিক তীক্ষ্ণ, এবং এই ধরনের বাজনার ব্যাপারে কান দুটিও সবিশেষ অভ্যস্ত। মনের মধ্যে বিস্ময়ের প্রবাহ, কিন্তু এ ভাব গোপন রেখে সরল মুখাকৃতি করে তিনি জবাব দেন, 'হ্যাঁ, আমিও তা শুনেছি ইওর এক্সেলেন্সি, কুঠির প্রধান ফটকের কাছে বাজনা বাজছে। সুঁতাররা এসে বাজাচ্ছে।'

'তারা এখানেই এসেছে নাকি ?' হেসটিংস প্রশ্ন করেন।

ক্লীভল্যাণ্ড বললেন, 'অনুমতি পেলে খবর নিয়ে আসি, বোধহয় তারা আপনার কাছেই এসেছে !'

হেসটিংস উত্তর দিলেন না, তবে তাঁর মুখভাবে কৌতূহলের চিহ্ন, তা লক্ষ্য করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্লীভল্যাণ্ড।

টেবিলের ওপর থেকে একটা ক্ষুদ্রাকৃতি দূরবীন তুলে নিয়ে হেসটিংস দক্ষিণের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কুঠির প্রধান ফটকের দূরত্ব এখান থেকে কম নয়। খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না। অধিকন্তু সারা প্রান্তর বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষশ্রেণীতে আকীর্ণ।

তবু দূরবীনের ভেতর দিয়ে হেসটিংস সাধ্যমতো দৃষ্টি চালিত করলেন। কিছু কিছু দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। তাতেই সর্বাঙ্গীণ পরিবেশের কিঞ্চিৎ ধারণা হয়।

নারী ও পুরুষ মিলিয়ে অন্তত হাজার ব্যক্তির সমাবেশ। শিশুও অনেকগুলি। আদিবাসী সুঁতার। পুরুষের পরনে ক্ষুদ্রাকৃতি গামছা। কৃষ্ণ-আম্রাভ নগ্ন উর্ধাঙ্গ। মাথায় রুক্ষ চুলের চূড়াকৃতি ঝুঁটি। কারো কারো অঙ্গে অস্থিগাঁথা অলংকার। অধিকাংশ ব্যক্তির হাতেই ধাতুবলয়, আর কানের পাশে পুষ্পগুচ্ছ। অনেকেই বংশীধারী, এবং কাঁধে ধনুক, পিঠে বাঁশের তৈরি তূণীর। কেউ কেউ গলায় ঝুলিয়ে ঢোল অথবা মাদল বহন করছে। কারো বা বাঁ কাঁধের পাশে বিরাটবপু ঢাক লম্বমান। অথবা কাড়ানাকাড়া। সুদীর্ঘ ভেরী অথবা শৃঙ্গ-নির্মিত ক্ষুদ্রাকৃতি তূর্য বহনকারী ব্যক্তিও দলে রয়েছে।

মেয়েদের পোশাক লুঙ্গির মতো আজানুলম্বিত অধোবাস, তবে মাঝখানে সেলাই নেই। উর্ধাঙ্গের পরিধেয় একখানি গামছা। শিথিল পরিধানভঙ্গির জন্যে দেহ অনেকটা অনাবৃত। কারো বা একটি, কারো উভয় বক্ষই দৃশ্যমান। হাত কান ও গলা ধাতু নির্মিত অলংকার শোভিত। বাহু ও বুকের মুক্ত অংশে উল্কির বাহুল্য। খুব টান করে বাঁধা সিঁথিহীন কেশপাশ। মাথার পেছনে বহুবর্ণ পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত কবরী।

শিশুদের মধ্যে বালকগুলি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কোমরে কড়ি গাঁথা অথবা ঝিনুক সমন্বিত কালো সুতোর ঘুনসী। বালিকাদের পরিধানে ছোট্ট একটি রঙীন গামছা।

খবর নিয়ে ক্লীভল্যাণ্ড ফিরে এলেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, সুঁতাররা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে।'

'আমার সঙ্গে কেন?' বিস্ময়হীন স্বরে হেসটিংস প্রশ্ন করেন।

ক্লীভল্যাণ্ডের মুখের পাশে অতিসূক্ষ্ম হাসির রেখা, বললেন, 'ভাগলপুর শহরের

পূর্ব দিকে মৌজা বাগ্নারী ও সাবোর, আর দক্ষিণে মৌজা মুজাহাদপুর সিকন্দারপুর। ঐ সব গ্রামের সুঁতাররা খবর পেয়েছে বিলিতি রাজা তাদের শহরে অতিথি, তাই তারা দেখা করতে এসেছে। ওদের নেতা হয়ে এসেছে তিলকা মুর্মু নামের একজন সুঁতার, যে নিজেকে এসব অঞ্চলের রাজা বলে দাবি করে। সুঁতাররা বাবা তিলকা মাঝি নামে তাদের রাজার পরিচয় দেয়।'

হেসটিংস মৃদু হেসে ভ্রূভঙ্গি করলেন, 'কি বললেন আপনি, রাজা তিলকা মুর্মু? এও দেখছি এক শিরঃপীড়া! মনে হয় ভারতবর্ষে ভিখিরি আর রাজার সংখ্যা সমান সমান?'

মুহূর্ত খানেক নীরবতার পর ক্লীভল্যাণ্ড কি যেন বলতে গেলেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি—'

বাধা দিয়ে হেসটিংস বললেন, 'একজন গণ্যমান্য রাজা প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এসেছে, আমার উচিত সপারিষদ গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করা।'

'আদেশ হলে তাকে এখানেই ডেকে আনাতে পারি?' অনুমতির অপেক্ষায় ক্লীভল্যাণ্ড হেসটিংসের মুখের দিকে তাকান।

হেসটিংস সহাস্যে বলেন, 'না, হাজার হোক তিনি একজন রাজা, এভাবে ডেকে পাঠানো প্রথাসম্মত নয়, তাতে রাজা অপমান বোধ করতে পারেন। ক্যাপ্টেন ওয়ার্ড আর ক্যাপ্টেন ব্রাউনকেও খবর পাঠিয়ে দিন, আমার সঙ্গে গিয়ে তাঁরাও রাজার অভ্যর্থনা করবেন।'

পোণ্ড রাপাজ, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের রাজার কাছে এগিয়ে এল বাবা তিলকা মাঝি। বয়েস সঠিক বোঝা যায় না, অনুমান হয় প্রৌঢ়। পেশীবহুল নাতিদীর্ঘ অবয়ব। কাঁধে ধনুক আর তীরপূর্ণ তূণীর। ডান হাতে এক হাত দীর্ঘ বাঁশের বাঁশী।

বাঁশীটি হাতবদল করে ডান হাতের মুঠি কপালে ঠেকিয়ে ঈষৎ গ্রীবা ঝুঁকিয়ে বাবা তিলকা মাঝি নমস্কার জানাল, 'জোহার পোণ্ড রাপাজ—শ্বেত রাজা নমস্কার।' তারপর একবার পিছু ফিরে সঙ্গীদের উদ্দেশে কি যেন বলল সে।

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি উঠল একটা, 'জোহার জোহার জোহার!'

'দুরুপ ম্যা হড়্—সব বসে পড়্।'

বাবা তিলকা মাঝির নির্দেশে নীরবে বসল সবাই। তারপর তার ইঙ্গিতে দু

তিনজন হড় হেসটিংসের সুমুখে রাজকীয় উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে এল। একজোড়া সুপুষ্ট শুয়োর, কয়েকটি মুর্গী এবং দু-হাঁড়ি মহুয়ার মদ। প্রসন্ন মুখভঙ্গি করে হেসটিংস উপহারের দ্রব্যাদি গ্রহণ করলেন।

দোভাষীর মাধ্যমে আলাপ। রাজায় রাজায় কথা।

তিলকা মাঝি বলল, 'রাজা, এরা তোকে গান শোনাবে, নাচ দেখাবে, তুই আমাদের গাঁয়ের অতিথি।'

সম্মত হলেন হেসটিংস, 'বেশ তো।'

বাদ্যযন্ত্রগুলির ঐকতানের সঙ্গে সঙ্গে হড় রমণীরা দাঁড়িয়ে উঠে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে গোলাকৃতি রচনা করে। মুহূর্তের মধ্যে মুখে গান বাঁধল তারা: পোণ্ড রাপাজ ইঞা আতোরে হৈ একানা, হৈ একানা। শ্বেত রাজা আজ আমাদের গ্রামে অতিথি, আমাদের অপার সৌভাগ্য। বিভিন্ন বাজনার সম্মিলিত স্বর, অনেকগুলি রমণীকণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী এবং নৃত্যছন্দের সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রণে অপূর্ব রমণীয় পরিবেশ বেশ ভালই লাগছে হেসটিংসের। প্রায় তন্ময় তদ্গতচিত্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

অত্যন্ত কাছেই রয়েছেন ক্যাপ্টেন ব্রাউন, অন্যমনস্কের মতো হঠাৎ উচ্ছ্বাস-ভরে বলে উঠলেন, 'বিশেষ গরীয়ান কৃষ্টির উত্তরাধিকারী এই লোকগুলো খুবই সত্যবাদী সৎ সাহসী আর নিয়মানুবর্তী।'

কথাটা কানে যেতে বিরক্তি কষায়িত চোখে ক্লীভল্যাণ্ড একবার ক্যাপ্টেন ব্রাউনের দিকে তাকালেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না তিনি, কারণ হেসটিংস তাঁর পাশেই উপস্থিত।

নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর হেসটিংস সদয় কণ্ঠে বাবা তিলক মাঝিকে প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের যদি কোনো আবেদন বা অভিযোগ থাকে তা বলতে পার?'

না।—ঘাড় নাড়ে তিলকা মাঝি।

আবেদন। কার কাছে আবেদন?

অভিযোগ। কিসের অভিযোগ?

রাজার কাছে রাজার আবেদন থাকে না। রাজার বিরুদ্ধে রাজার অভিযোগ অথবা অনুযোগ হয় না। রাজার সঙ্গে রাজার বিরোধ থাকতে পারে, এবং আছেও তা। বারারী সাবোর সিকন্দারপুর, মুজাহীদপুর, এসব মৌজা হড় রাজ্যের অঙ্গীভূত ভূখণ্ড, এবং স্বয়ং বাবা তিলকা মাঝি তার রাপাজ। এককালে খোদ

ভাগলপুর শহরও হড়েরই ছিল। প্রথমে দীকু এবং পরবর্তীকালে মোগল তা ছিনিয়ে নিয়েছে।

হড়ের হাতে যেদিন উপযুক্ত শক্তি সঞ্চিত হবে ভাগলপুর শহর সে আবার ফিরিয়ে নেবে। ঐ যে বুড়োনাথ আর শ্রীদুর্গার মন্দির, সেটি প্রকৃতপক্ষে মাঝি-স্থান। হড়ের আদি পুরুষ ও নারী, পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুঢ়ী, যারা মানুষের পেট থেকে জন্মায়নি, হাঁসের ডিম ফুটে বেরিয়েছিল, তাদের নামাঙ্কিত দেবালয় ঐ মাঝিস্থান। দীকুরা তা কেড়ে নিয়ে নিজেদের মন্দির বানিয়েছে। আর চিলিমিলি সাহেবের এই টিলাকুঠি ছিল হড়ের প্রাচীন গড়, টিলাগড়। সামনেব ঐ ঢিবি ভাঙলে তার এক লক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বিরোধ? বিরোধের সূত্র অনেক। হড়্ নিজের রাজ্যে বাস করে, কিন্তু বারারী সাবোর সিকন্দারপুর আর মুজাহীদপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে চিলিমিলি সাহেব খাজনা দাবি করে কিসের অধিকারে? কোন্ আইনে শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী হড়্দের ধরে নিয়ে গিয়ে সে জেলখানায় পুরে মুনিষ খাটায়, সপ্তাহে দুটো দিন মাংস খাওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে মেথরের কাজ করায়?

বিরোধ আরও আছে, কিন্তু সেসব ব্যাপারে তিলকা মাঝি পোণ্ড রাপাজের কাছে আসেনি। অতিথি রাজাকে শিষ্টাচার অনুযায়ী নিজের রাজ্য পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সে। বিরোধের ফয়সালা যথাস্থানে এবং যথাযথরূপে হবে। প্রয়োজনে তীরধনুক আর কাপিবল্লম নিয়ে হাজার হাজার হড়্ কোম্পানীর ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে।

বাবা তিলকা মাঝির সুদীর্ঘ বক্তৃতা হেসটিংস মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর কপট খেদের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এ যাত্রা তো আমার পক্ষে তোমার রাজ্যে যাওয়া সম্ভব হবে না, হয়তো কালই আমি এখান থেকে চলে যাব।'

বাবা তিলকা মাঝিকে সদলবলে বিদায় দিয়ে হেসটিংস কুঠির দিকে ফিরলেন। আবার লাইব্রেরি-ঘরে এসে বসলেন তিনি। তারপর ফরসির নল হাতে তুলে নিয়ে ক্লীভল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে ধীর স্বরে বললেন, 'মিস্টার ক্লীভল্যাণ্ড, দামিনঈকোহ্র শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব আমি সমর্থন করলাম। তবে খুব আল্গা হাতে রাশ টানবেন। শত্রুকে কাবু করতে হলে প্রথম দিকে বন্ধুত্ব প্রদর্শনের চেয়ে বড় অস্ত্র আর নেই।'

ক্লীভল্যাণ্ড তখুনি কোনো উত্তর দিলেন না, বিজয়ের সগর্ব এবং উৎফুল্ল হাসি হাসলেন তিনি, কিন্তু সম্পূর্ণই নিঃশব্দে।

দশ

আকাশ মেঘহীন। শুক্লা সপ্তমীর খণ্ডিত চাঁদ আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে সমানভাবে ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে রেখেছে। এত অল্প আলো থাকার দরুন তারার পরিপূর্ণ সত্তার নষ্ট হয়নি। তারাগুলি সবিশেষ উজ্জ্বল। আকাশের ছায়াপথ গভীর রেখায়িত।

নীতু মেঝেনের ভালুক খাওয়া পঙ্গু শাশুড়ী ওড়ার দাওয়ায় খাটিয়ার ওপর বসে। দাওয়ার মেঝেয় নীতুর দুই উদোম উলঙ্গ ছেলে চাটাইয়ে শুয়ে রয়েছে। জিয়েৎ, অর্থাৎ ঠাকুমার কাছে আকাশের উপকথা শুনতে শুনতে কখন যে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে সে হুঁশ নীতুর শাশুড়ী পারো বুঢ়ীর নেই। নীতুর মেয়ে পরায়ণী ভাইবোনের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে বড়; বয়েসের উপযুক্ত জায়গাতেই গেছে এখন। আতো ভাগনাডিহির উৎসবের মাঠে।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারাগুলির দিকে আঙুল তুলে রেখে পারো বুঢ়ী বলে চলেছে, 'ঐ যে চারটে ইপিল, ওগুলোকে বলে বুঢ়ী পারকম, আর তাদের পেছনে তিনটে তারা তিন চোর। ওরা বুড়ির খাটিয়ার নিচে থেকে আগুনের মালসা চুরি করতে এসেছে।' তারপর আকাশের দিক থেকে হাত নামিয়ে এনে ভোরবেলার বৃহস্পতি আর শুক্র তারা দুটির উল্লেখ করে বলে, 'সে দুটো হল চোরখেদা ইপিল। তাদের দেখলেই চোর তারাগুলো পালিয়ে যায়। আর মানুষ চোরও যখন আকাশের গায়ে চোরখেদাদের ফুটে উঠতে দেখে তখনই কাজ সেরে চম্পট দেয়। পালাতে না পারলে সকাল হলেই ধরা পড়ে যাবে যে! কি রে শুনছিস তো?'

পারো বুঢ়ীর গড়মকোড়া দুটি, অর্থাৎ পৌত্রদ্বয় সাড়া দেয় না, তাদের গভীর নিশ্বাস পারো বুঢ়ীর কানে আসে, তবু নিজের মনেই বকে চলে সে, 'ঐ যে সিঞচান্দো আর ইন্দাচান্দো, সূর্য আর চাঁদ, তারা জাওঞাই আর রিণিঃ—বর বউ। আর ছোট বড় ইপিলগুলো তাদের কোড়া গিদরে আর কুড়ি গিদরে। আগে দিনেরবেলাও অনেক তারা ফুটে থাকত, সেগুলো ছিল সূর্যের ছেলে।'

অনেককাল আগে একবার সূর্য আর তারার তেজে এই পৃথিবীটা পুড়ে যেতে বসল। সব মানুষ মিলে চাঁদ সূর্যের পুজো করে প্রার্থনা করল, আমাদের বাঁচাও! সূর্য আর চাঁদের দয়া হল মানুষের কষ্ট দেখে। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ

করল সব ছেলেমেয়েদের গিলে ফেলবে।

তারপর সূর্য দিনের বেলার সমস্ত তারাকে খেয়ে ফেলল। চাঁদ কিন্তু রাতের তারাদের একটা ঝুড়ির মধ্যে পুরে রান্নাঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। রাত্তিরবেলা তাদের বেরিয়ে এসে আকাশের বুকে খেলা করতে দেখে সূর্য বুঝতে পারল চাঁদ তাকে ঠকিয়েছে। তখন সে রেগেমেগে একটা কাপি দিয়ে চাঁদকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে লাগল।

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চাঁদ সূর্যের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, কেঁদে বলল, 'আমায় তুই প্রাণে মারিস না, আমার দুটো সুন্দরী মেয়েকে তোকে দিয়ে দিচ্ছি।'

তখন সূর্য বলল, 'বেশ, তাহলে তুইও মাসে দু-বার আস্ত হয়ে উঠবি।'

'সেই থেকে মাসে দু-বার করে আকাশে আস্ত চাঁদ দেখা দেয়। আর ঐ যে ভোরবেলার ভুরখা ইপিল, চোরখেদা তারা দুটো, সে দুটো সূর্যকে দিয়ে দেওয়া ঞাদের মেয়ে, তাই দিনেরবেলায়ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেখা যায়। কিরে, তোরা শুনছিস তো?'

সাড়া নেই। এতক্ষণে যেন পারো বুঢ়ীর খানিকটা হুঁশ. হয়েছে, সে সখেদে বলে, 'এমন সুন্দর গল্প তোরা সবটা শুনলি না, ঘুমিয়ে পড়লি? আবার তো কালই বলবি যে, একটা গল্প বল্!'

এবার পারো বুঢ়ীও নিজের প্রায় জড় শরীরটা কোনোমতে খাটিয়ার ওপর গড়িয়ে দিল। কিন্তু শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েও তার চোখে ঘুম নেই। সারাটা দিন জড়ের মতো কাটাতে হলে অনিদ্রা-রোগ অবধারিত। ঠায় বসে থাকতে গিয়ে তবু বা শ্রান্তিতে ঝিমুনি আসে, কিন্তু ঘুমের আয়োজন ও প্রয়াস করলেই দু-চোখ সম্পূর্ণ বিনিদ্র। তখন সারা চেতন ও অবচেতন মনটা যেন অধিক তৎপর হয়ে সর্বত্র ছুটে বেড়ায়।

মাঝিস্থানের কাছে দক্ষিণের মাঠে সর্প-নিধন কৃতিত্বের উৎসব। জায়গাটা ওড়া থেকে কাছেই, তাই পারো বুঢ়ীর কানে উৎসব-প্রাঙ্গণের বাজনাবাদ্যি এসে ঢুকছে। বিবিধ হাল্লা আর গানের ফিকে রেশও শুনতে পাচ্ছে সে। নীতুর ছেলে দুটো সন্ধ্যেবেলাই খেয়েদেয়ে ফিরেছে। ওড়ায় ফেরত পাঠাবার সময় তাদের হাতেই নীতু শাশুড়ীর জন্যে অনেকখানি সাপের মাংস আর পরিমাণ মতো ভাত ও মদ পাঠিয়েছে।

অতখানি মাংস পারো বুঢ়ী খেতে পারেনি, ভাতও না। তবে মদ সবটাই খেয়েছে,-পেলে আরও গেলে। নীতু বা টুইলা যদি একবার ওড়ায় ফেরে সে

আরও একটু মদ চেয়ে নেবে। বাড়িতেই তো কয়েক হাঁড়ি রয়েছে, কিন্তু নিজে খাটিয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে শিকে থেকে পেড়ে নেবার শক্তি নেই

কিন্তু নীতু বা টুইলা সারা রাতের ভেতর ওড়ায় ফিরবে না ; সে আশা করাও বৃথা। নিশি রাত্তিরে কে যে কখন কোথায় কার সঙ্গে পড়ে থাকবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। নীতু হয়তো আজকের রাতের মতো কোনো নতুন বর জুটিয়ে নেবে, আর টুইলা একটা নতুন বউ। আবার কাল সকালেই কিন্তু তারা যে যার বর বউ ; টুইলার রিণিঃ নীতু, আর টুইলা তার ঘর জাওঞাই, যে অধিকারে নীতুর এই ওড়া, চাষের জমি, শুয়োর মুর্গী, গোরু বলদ সবই টুইলার।

ওড়ার উঠনে দু-চারটে গাছপালার ছায়া। সেই ছায়ার বুকে জোনাকীর টিপ্ টিপ্ জলা নেভার দরুন এক ধরনের চকিত আলো-আঁধারি, তার মধ্যে কে যেন এসে ঢুকেছে পারো বুড়ী স্পষ্ট দেখতে পেল না। তাই সে জিজ্ঞেস করল, 'কে রে ওখানে ?'

পরিষ্কার গলায় নীতু সাড়া দিল, 'আমি গ'।'

আর একজন কে রয়েছে না, ঠিক নীতুর পেছনে, তার গলার চাপা শব্দ শুনতে পাওয়া গেল ? টুইলা নয় কিন্তু, কতকটা যেন বহিরাগতের মতো কণ্ঠস্বর!

পারো বুড়ী আবার প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ রে বহু, তোর সঙ্গে আর কে এসেছে ?'

উত্তর দিতে অস্বস্তি, তার দরুন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে নীতু, তারপর জবাব দেয়, 'সঙ্গে কানহু মাঝি, আমরা পউর নিয়ে যেতে এসেছি।'

'ও, আমাকেও একটু দিয়ে যাস তো!'

আর বুঝতে বাকি নেই, নীতু আজ বাউণ্ডুলে কানহুটার প্রেমের শিকার হয়েছে। কিন্তু টুইলা কোথায় রয়ে গেল ? পাঁচজনের চোখের ওপর দিয়ে ওরা দু-জন একা একা ওড়ায় এসে ঢুকল ? শয়তান কানহুর এই প্রথম এ ওড়ায় আসা নয়। টুইলার প্রাণের বন্ধু হিসেবে অনেকদিন সে এখানে এসে পানভোজন করেছে। পরম সুখে রাত কাটিয়েছে। টুইলা মদের নেশায় অচেতন হয়ে পড়ার পর কানহু আর নীতুর মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে সে বিষয়ে পারো বুড়ীর স্পষ্ট অনুমান।

এসব ব্যাপার চোখ মেলে দেখার অপেক্ষা রাখে না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিই অজস্র দৃষ্টির উৎস। কুমারী কুড়ির না হয় এ ব্যাপারে একটু আধটু ছুট থাকে, কিন্তু নীতু তো মায়জিউ, ছেলেপুলেও রয়েছে তার। আজকালকার মেয়ে

বাইরের কুড়িয়ে আনা সুখ আঁচলের নিচে লুকোতে জানে না!

পারো বুঢ়ীকে এক পাত্র পউর দিতে এল নীতু।

বাটিটা হাতে নেবার জন্যে পারো বুঢ়ী অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও কষ্টপূর্ণ আয়েসের সঙ্গে উঠে বসল, 'বহু, টুইলা কোড়া কোথায়?'

'পরায়ণীর আপাৎ তো মাঝিস্থানে রয়েছে।' নীতু সহজ স্বরে জবাব দেয়।

'পরায়ণীর বাপ মাঝিস্থানে, তাই তোরা একা একা খালি ওড়ায় সুখ করবি বলে এসেছিস!' কথাটা সম্পূর্ণ শব্দহীন ভাষায় মনে মনে বলে নেওয়ার পর কিঞ্চিৎ রুষ্টস্বরে পারো বুঢ়ী প্রশ্ন করে, 'তোরা দুজনে কি এখন এই ওড়ায় থাকবি?'

কানহু উঠোনে দাঁড়িয়ে, কথাটা স্পষ্ট শুনল সে। ওড়া থেকে মদ নিয়ে যাবার জন্যে একাই আসছিল নীতু, কোথা থেকে যেন কানহু তার সঙ্গ নিয়েছে। দু-একবার স্বাদ পেয়ে লোকটা বড় বেশি সুযোগ নিতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু আজ রাত্তিরে নীতুর তাকে খুশি করার মোটেই ইচ্ছে নেই। মদের হাঁড়ি নিয়ে সে এখুনি মাঝিস্থানের মাঠে ফিরে যাবে, সেখানে জাওঞাই টুইলা তার অপেক্ষা করছে।

শাশুড়ীর কথার উত্তর না দিয়েই মাথায় মদের হাঁড়ি নিয়ে নীতু মেঝেন ওড়া থেকে বেরিয়ে গেল। তার পেছনে লোভী কানহু।

ওড়ার চৌহদ্দি তখনো ছাড়ায়নি, ইতিমধ্যেই কানহু হঠাৎ নীতুর হাত চেপে ধরল, 'এই চাঁদের পরী, অত ব্যস্ত কেন, একটু বস এখানে, গল্পসল্প করি?'

নীতু ঝাঁকানি দিয়ে কানহুর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, 'সব সময় পরের বউঝির পেছনে ঘুরে বেড়াস, এত যদি মেয়েমানুষের লোভ তো বাপলা করিস না কেন? তোদের চারটে ভাই-ই সমান।'

'কে আমাদের সঙ্গে বাপলায় রাজী হবে, আমাদের কি ওড়া আর জমি-জিরেত আছে?' নীতুর একটা হাত চেপে ধরে রয়েছে কানহু, কথা বলতে বলতে অন্য হাতটা বাড়িয়ে তার মাথার ওপর থেকে পউর-র হাঁড়ি ছিনিয়ে নেয় সে, বলে, 'এবার তুই বস এখানে, নয়তো হাঁড়ি ভেঙে দেব। আমার তিন ভাই আজ যে যার নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে, আমিই শুধু এখনো পর্যন্ত ফাঁকা ভাই চান্দোকে তো দেখলুম তোর কুড়ি পরায়ণীর সঙ্গে খুব হেসে হেসে গল্প করছে। মাঠে ফিরে গিয়ে তাদের আর সেখানে দেখতে পাবি না তুই।'

চাঁদের আবছা আলোয় নীতু কানহুর সকাম মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে অনুভব করে আজ আর নিস্তার নেই তার, তবু সে মুখঝামটা দিয়ে বলে

পরায়ণী গিদরে কুড়ি, ছেলেমানুষ, এই বয়েসে সুখ করবে না তো কবে করবে ?' তারপর মুখ ভেঙায় সে, 'তুই ফাঁকায় পড়ে গেছিস তো সে দায় আমার নাকি ? আমার জাওঞাই নেই ?'

নীতুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হাঁড়িটা নীতুরই ওড়ার পাশে ভিট জমিতে নামিয়ে রাখে কানহু, তারপর তাকে দু-হাতে চেপে ধরে আধশোয়া অবস্থায় মাঠে বসিয়ে দিয়ে নিজের শরীরের সাহায্যে আবেষ্টিত করে রেখে বলে, 'তোকে আমি খুব ভালবাসি নীতু। আজ তোকে কাছে না পেলে আমার জীবন সত্যিই ফাঁকা হয়ে যাবে, আমি মরে যাব, চাঁদবাবা সাক্ষী।'

'এসব কথা তো রোজই এক একটা মেয়েকে বলিস ?' কথা বলার অবসরে নীতু আত্মমুক্তির প্রয়াস করে।

'টুইলাও তো রোজ কত মেয়েকে ভালবাসার কথা বলে ?' কথাটা বলার পর কানহু জোর করে নীতুর মুখে একটা চুমু দেয়।

নিজের মুখটা ঝটকা মেরে কানহুর মুখের নাগাল থেকে সরিয়ে নিয়ে নীতু তীব্র মুখঝামটা দিয়ে জবাব দেয়, 'বলুক সে, তোর রিণিংকে তো আর বলে না ?'

কানহু কিন্তু ইতিমধ্যে এই বাদানুবাদের অবসরে নিজের সুখের সুব্যবস্থা করে নিয়েছে, নীতুরও তা অজানা নয়, তবু সে তারপরও সারাক্ষণ ঝগড়া করে গেল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক, তারপর তার একতরফা কলহ, সে সময় কানহু কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব।

অনেকক্ষণ পরে নীতুর শারীরিক বন্ধন শিথিল করে দিয়ে কানহু উঠে বসে একটা কপট বিতৃষ্ণার হাই তুলল, তারপর সবিশেষ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, 'এইজন্যেই তো আমি বাপলা করি না, মেয়েরা সব সময় ঘেটেপেটে করে, এমনকি ছেলে বিয়োতে বিয়োতেও জাওঞাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া চালিয়ে যায়।'

নীতু বলে, 'তবু মেয়েদের বাদ দিয়েও তোদের চলে না ?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে কানহু বলে, 'নে ওঠ, অনেক ঝগড়াঝাঁটি করেছিস, এবার তোকে মাঝিস্থানের মাঠে পৌঁছে দিই গে।'

বেশ সহজভাবেই নীতু উঠে দাঁড়ায়, দু-হাতে গায়ের ধুলোমাটি ঝেড়ে অঙ্গের স্বল্প বেশবাস এক নিমেষেই গুছিয়ে নেয় সে, তারপর ঝুঁকে পড়ে মদের হাঁড়িটা মাথায় তুলে জবাব দেয়, 'তুই চুলোয় যা, আমি একাই মাঝিস্থানের মাঠে চলে যেতে পারব।'

নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে কানহু ভয় দেখায়, 'তা হয়তো পারবি, কিন্তু কোন্

ঝোপঝাড়ে কোন্ শিকারী লুকিয়ে আছে কে জানে? হড়্ মানেই তো হাড়গার —নেকড়েবাঘ!'

'হড়্ মানে জীউ—ভূত।' চলতে চলতে পেছনপানে মুখ ঘুরিয়ে নীতু জবাব দেয়, তার দেহ অথবা মনের কোথাও গ্লানির স্পর্শ নেই, সবদিক থেকে অত্যন্ত সহজ সরল অবস্থা। টুইলার আদেশে ওড়া থেকে মদের হাঁড়ি আনতে গিয়েছিল, মদ নিয়েই ফিরছে সে। পথে যৎসামান্য দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু তা খুবই স্বাভাবিক। পথ চলা মানেই তো সময়ের নির্দেশে বাধা পড়া।

নীতুর সঙ্গে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে কানহু মাঝিস্থানে ফিরল। এতখানি সুখের পরও মনটা তার কেন জানি উদাস! সত্যি বলতে এ কেবল বয়েসের দোষ, নয়তো আর এসব ভাল লাগে না। মনে হয় সুখের চতুর্দিকে শুধু কাঁটার বিস্তার। একা তার নয়, দুনিয়ায় যত হড়্ তাদের প্রকৃত জীবনে অনেক বাধা। হড়্ মানে সরলতা, হড়্ মানে সাধারণ এবং অকুটিল প্রাকৃতিক বিকাশ; কিন্তু সে দিন চলে গেছে। পৃথিবীর সব মানুষের কাছে প্রকৃতি সবদিক থেকে হেরে যাচ্ছে, তাই হড়্ও আজ পরাজিত।

হতচ্ছাড়া দীকু কোড়াগুলো তে গান বেঁধেছে:

সাঁওতাল মাওতাল বারো জাত,
ব্যাঙ পুড়িয়ে খায় ভাত।

যাদের বয়েস বেশি, নোংরা রসবোধ আছে, তারা ঐ গানের দ্বিতীয় পংক্তি অশ্লীল পদ দিয়ে শেষ করে। নিজেদের গাঁ গঞ্জে হড়্ দেখলে ছেলেবুড়ো বেশ জোর গলায় ছড়া কাটে।

শুধু দীকুই হড়ের শত্রু নয়, বিদেশ থেকে আসা শাদা বেড়ালগুলো, যারা ইদানীং নিজেদের এ দেশের রাজা বলে দাবি করতে আরম্ভ করেছে, আর তাদের পেয়ারের বাচ্চা পাহাড়ীরা চিরদিন হড়ের পেছনে ফেউ হয়ে লেগে রয়েছে।

কিন্তু এ অবিচার আর অত্যাচার কোনো হড়ের চোখে ধরা পড়ে না। হড়্ সারাদিন সংগ্রামে ব্যস্ত, চিরকালীন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তারপর সমস্ত দিনের শেষে শ্রান্তি ও মানসিক ক্ষোভের ভার অপনোদনের উদ্দেশ্যে আত্মবিস্মৃতিকারী আকণ্ঠ উৎসবকুণ্ডে অবগাহন। স্থির হয়ে নিজের কথা চিন্তা করার অবসর কোথায়?

না, এত বড় অথবা গভীর চিন্তা ঠিক এই মুহূর্তেই কানহুর মনে সর্বপ্রথম

আসেনি, বা এ মাত্র একবার চিন্তার ফল নয়। আর এ ভাবনা তার একারও না। নিষ্কর্মা বাউণ্ডুলে চারটি ভাই, যাদের মাথা গোঁজার উপযুক্ত জায়গা বা ভবিষ্যৎ চিন্তার বালাই নেই, প্রতিটি দিন এক একটি সম্পূর্ণ জীবনের মতো, নানা রকম হৈচৈ আর ফুর্তি এবং অযথা কলহ বিবাদ করার অবসরে শুধুমাত্র একঘেয়েমির জ্বালা কাটাবার উদ্দেশ্যে এই সব ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছে, ঘরগেরস্থালির বন্ধনহীনতার দরুন চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখার অবসর পেয়েছে। সেই কথাগুলোই কানহুর আজ হঠাৎ মনে জেগে উঠেছে। এও হয়তো সপরিতৃপ্তি জীবন উপভোগের পরবর্তী মুহূর্তে এক ধরনের বিবাগী চিন্তা, যা মাঝে মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধানের উর্ধ্বে চলে যায়।

আকাশে অসম্পূর্ণ চাঁদের ক্ষীণ আলো। মাঝিস্থানের চারটি খুঁটিতে বাঁধা রেড়ির তেলের জ্বলন্ত মশাল। সে আলো বাইরেও খানিকটা ছড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণের মাঠে হড়্ পুরুষ ও রমণী পানভোজন নৃত্যগীত আর সেই অবসরে প্রমোদ পরিপূরক সাথী নির্বাচনে ব্যস্ত। তারপর উদার প্রকৃতির কোলে নিভৃত নিধুবন-শয্যা অনুসন্ধান। আপাতত কানহুর আর এ গরজ নেই, সে সবিশেষ পরিতৃপ্তি নিয়েই মাঝিস্থানে ফিরে এসেছে।

দক্ষিণের মাঠে যথেষ্ট ভিড়, সে তুলনায় মাঝিস্থানের বেদীটি ফাঁকা। পাঁচ-সাতজন অধিকবয়স্ক হড়্ মাত্রাতিরিক্ত পচুঁই সেবনের পর সেখানে বেহুঁশ গা এলিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধাদলভুক্ত তিন-চারটি মায়জিউও প্রায় সমান অবস্থায় নিদ্রাভিভূত।

মাত্র একজন মাঝিস্থানের বেদীতে নিশ্চুপ বসে। ভোগন টুডুর তালাকোড়া দীঘল। বুঢ়াবুঢ়ী নামের দুটি প্রস্তর বিগ্রহের সামনে তৃতীয় একটি পাথরের মূর্তি যেন!

'অতে হো দীঘল?' দীঘলের নাম ধরে ডাক দেওয়ার পর কানহু বেদীর উপর উঠে এল, তারপর কাছে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে রে তোর? সেই আয়ুপবের থেকে ছিলি কোথায় তুই?' এ প্রশ্ন করার সময় কানহুর খুব স্পষ্ট মনে পড়ল, সন্ধ্যে নয়, প্রায় দুপুর থেকেই দীঘল টুডুকে দেখতে পায়নি সে। তার বাপ ভোগন টুডু বা পরিবারের অপর কেউই সান্ধ্য উৎসবে যোগ দিতে আসেনি।

একটু নড়ে বসল দীঘল, তারপর একটা দুশ্চিন্তার নিশ্বাস ফেলল সে, বলল, 'দাদা এখনো পর্যন্ত ওড়ায় ফেরেনি!'

'কোথায় গেছে গড়ম, শ্বেতাংবেরে বিং মারার সময়ও তো তাকে দেখিনি ?' কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন স্বরে কানহু প্রশ্ন করে।

যেন খুব বড় বিপত্তি, এ ধরনের আশংকাকাতর ভাষা ও স্বরে দীঘল উত্তর দেয়, 'সেই খুব আঙ্গাবেরে আকাশে চোরখেদা তারা দেখে বেরিয়ে বোরিও-বাজারের মহাজনের কাছে মেয়াদ চাইতে গিয়ে এখনো ফেরেনি। হিসেবের দড়ি নিয়ে গেছে, তার জন্মে যতই দেরি হোক আয়ুপবেরের ভেতরই তো ফিরে আসা উচিত ছিল ? এর আগের বার ফসলের সময় মহাজন ভয় দেখিয়েছিল তিন মাসের মধ্যে স্থদ শোধ না হলে দারোগাকে দিয়ে বাঁধিয়ে কাজির কাছে চালান করে দেবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কানহু। মহাজন না কসাই, দারোগা না যমদূত, কাজি না পাজী! এরা তিনে মিলে চিরদিন ষড় করে হড়ের সর্বনাশ সাধনে ব্যস্ত। এই মুহূর্তে সে যে কথা ভাবতে ভাবতে মাঝিস্থানের দিকে ফিরছিল তার মধ্যে ঐ তিন শ্রেণী মানুষের নিধন-চিন্তাও ছিল। এদের মূল সমেত উপড়ে না ফেলতে পারলে হড়ের মুক্তি নেই।

মূল ওপড়াবার ব্যাপারে হড়ের মতো পটু কে ? বনজঙ্গল কেটে হাজার হাজার বছরের পুরনো গাছ-গাছড়ার মূল তুলে ফেলে প্রাণান্ত পরিশ্রমে হড় সেখানে সোনার ফসল ফলায়, যার অনেকখানি সুদের নামে মহাজনের কুঠিতে গিয়ে ওঠে। বাকি যেটুকু, পাহাড়ীরা এসে তা থেকে ভাগ দাবি করে। তাদের বক্তব্য চিলিমিলি আর হিস্টিন সাহেব দামিনের সব জঙ্গল জমি আর পাহাড় পাহাড়ীদের নামে একশ' বছর আগে পাট্টা করে দিয়ে গেছে, এ জমিতে হড় হল পাহাড়ী মুণ্ডাদের প্রজা। সব সময় অন্যায় দাবি আদায়ে পেরে না উঠলেও পাহাড়ী ফৌজের ভয় দেখিয়ে তারা মাঝে মাঝে ফসল আদায় করে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে আবার রাজমহলের পুঁটিয়া সাহেব হড়ের পক্ষ নিয়ে বলে, বিলিতি পোণ্ড রাপাজ বীরভূম আর মেদিনীপুর থেকে জঙ্গল পরিষ্কার করাবার জন্যে হড়দের এনে দামিন এলাকায় বসিয়েছে; যে যতটা জমি উদ্ধার করবে সে জমি তার। চিলিমিলি সাহেব মুণ্ডাদের যে অধিকার দিয়েছিল তা কোন্ যুগে শেষ হয়ে গেছে। তারা কখনোই স্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে নেমে আসেনি।

মোটের ওপর ব্যাপারটা এখন খুবই গোলমেলে। একদিকে হড় একা, আর অপর দিকে বাকি সবাই; দীকু মহাজন, মোগল দারোগা, মিঞা কাজি, মালের এবং মাল পাহাড়ী, নীলকুঠির সাহেব ও তাদের জাতভাই পোণ্ড রাপাজ। এদের

সবাইকে একসঙ্গে শেষ করা দরকার, তবেই হড়ের সুখ আর শান্তি।

চেতনার নিভৃতে দন্ত নিষ্পেষণ মনের মধ্যে সীমিত রেখে কানহু প্রশ্ন করে, 'তোর বাপ আর ওড়ার মায়জিউরা সব কোথায় ?'

উদাস গলায় দীঘল উত্তর দেয়, 'কোথায় আর যাবে, ওড়াতেই আছে !'

'গড়ম তো আজই বোরিওবাজারে গেছে বললি না ?'

'না না, কাল ভোরবেলা !' তাড়াতাড়ি নিজের পূর্বোক্তি দীঘল সংশোধন করে নেয়।

কি যেন চিন্তা করে কানহু, তারপর আবার সে জিজ্ঞেস করে, 'মহাজনের ধার কিছুই কি শোধ হয়নি ?'

দীঘল অবাক দৃষ্টিতে কানহুর মুখের দিকে তাকায়। তারপর তাকিয়েই থাকে সে। কানহু আর তার সবকটা ভাই বাউণ্ডুলে, কিন্তু তাই বলে এ দুনিয়ার কোনো খোঁজই কি তারা রাখে না! মহাজনের ঋণ কে কবে শোধ করতে পেরেছে ? এ ঋণ বংশ-পরম্পরার ব্যাধি।

সুদীর্ঘ দড়ির এক প্রান্তে ঋণের টাকার অংক গুণে সমান সংখ্যার গিঁট পড়ে, অপর প্রান্তে বছরের হিসেবে গ্রন্থী। সুদের হিসেব করার পর টাকার দিকের গিঁট বেড়ে যায়। আর প্রতি বছর একটি করে বছরের গ্রন্থী-সংখ্যা। চক্রবৃদ্ধি সর্তে সুদেরও সুদ, কিন্তু তার হিসেব দড়ির বন্ধনে রক্ষিত নয়। সেটি জমির ফসল আর গতরের বেগারী দিয়ে পোষাতে হয়। যার নাম দলিলবদ্ধ কামাইয়া কৃতদাস।

কানহুর প্রশ্নের বাচনিক উত্তর না দিয়ে দীঘল নীরবে নেতিবাচক ঘাড় নাড়ে। যে দড়ি নিয়ে গড়ম বোরিওবাজারে মহাজনের কুঠিতে গেছে তার হিসেবটা মনে মনে ভেঁজে নেয় সে। টাকার সংখ্যা সুদীর্ঘ দড়ির এক প্রান্ত প্রায় সবটাই ভরে ফেলেছে। এ অংক কোনো হড়্ গুনতে পারে না। হিসেব কত কুড়ি তা মহাজনের গোমস্তাই বুঝিয়ে দেবে।

দড়ির ও প্রান্তে বছরের হিসেব আড়াই কুড়ির মতো। ভোগন টুডুর বাপের আমলের ঋণ। অর্থাৎ যে সময় এই হড়্ পরিবার জমিদারের বদমায়েশীর চাপে অতিষ্ঠ হয়ে বীরভূম অঞ্চল ছেড়ে দামিনঈকোহ্‌র জঙ্গলে পালিয়ে এসেছিল, যে কথা ভোগনেরও মনে আছে, তারই সমসাময়িক কালের ঋণ।

হড়্ যেখানে গেছে সুধী মহাজনও প্রেমের দড়ি হাতে তার পিছু পিছু ধেয়ে এসেছে। প্রেমের দড়ি গলার ফাঁসি হয়ে বসেছে, তারপর শ্বাস বন্ধ করে হড়্‌কে মেরে ফেলেছে।

দীঘলের হাত ধরে কানহু টেনে তুলল, 'এমনি চুপ করে বসে থেকে কি করবি? এখন ওঠ, মাঠের দিকে যা, কত মদ, কত মেয়ে, কারো হাত ধরে একটু নেচে আয়। কাল সকালে আমরা চার ভাই তোর সঙ্গে বোরিওবাজারের মহাজনের কুঠিতে গিয়ে গড়মকে ছাড়িয়ে আনব।'

দীঘল উত্তর দেয় না, কিন্তু মাঝিস্থানের বুঢ়াবুঢ়ীর প্রস্তর-প্রতিভূর দিকে তাকিয়ে মনে মনে মানত করে, 'হে পিলচু হাড়াম, হে পিলচু বুঢ়ী, দাদাকে যদি মহাজনের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি তো মাঝিস্থানে এক জোড়া সীম-সান্তি বলি দেব। মানত করার পর বেদীর ওপর থেকে নীরবে নেমে যায় সে।

কানহু কিন্তু সেখানেই রয়ে গেল। তার মন খুবই ভারাক্রান্ত। উপরন্তু সবিশেষ যন্ত্রণাকাতর। এ এলাকায় যত হড়্, সারা দামিনঈকোহ্ আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে চেনা অচেনা হড়্, প্রত্যেকের জীবনের করুণ অভিযোগ সব যেন তার মধ্যে এসে জমেছে। অসহ্য শ্রান্তি ও বেদনায় সারা শরীর ও চেতনা সবিশেষ বিষণ্ণ। এবার সে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দলের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে নিরাবরণ বেদীর মৃৎশয্যায় গা ছড়িয়ে দিল। কিন্তু মনে আর কোনো চিন্তা আসার আগেই অচিরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

মাঝিস্থানের বেদীর কাছেই নিহত সাপের বিপুলাকৃতি চামড়াটা রাখা হয়েছে। দু-তিনজন স্থায়ী পাহারা। চোর মুণ্ডাদের বিশ্বাস নেই। উপরন্তু শেয়াল বা নেকেড়েও গন্ধে গন্ধে জুটতে পারে। নুনজল আর বুনো গাছগাছড়ার পচনরোধকারী আরকে ভেজানো চামড়াটা এখানেই থাকবে চার-পাঁচদিন, রোদের তেজে শুকোবে। তারপর এটি সঙ্গে নিয়ে বাজনাবাদ্যিসহ হড়ের দল রাজমহলের পুঁটিয়া সাহেবকে বিক্রি করতে যাবে।

দীঘল একবার চামড়াটার দিকে তাকিয়ে দেখল। এ যাত্রায় তার বোধহয় রাজমহলে যাওয়া হল না? গড়মের সন্ধান যদি না পাওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে তার অনেক ইচ্ছেই বাতিল হতে থাকবে।

কানহুর পরামর্শের সূত্র ধরে দীঘল মাঠের দিকে গেল না, ভিন্ন ও বিমর্ষ চিন্তার বশে সে ওড়ার পথ ধরল। রাস্তায় বাহার সঙ্গে দেখা। আবছা চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট বোঝা যায় এত অল্প সময়ের মধ্যেই বাহা কেমন যেন ঝামরে পড়েছে।

সমবেদনার ভাব নিয়ে বাহা এগিয়ে এসে দীঘলের হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলি তুই ?'

দীঘল কোনো উত্তর দিল না।

বাহা আবার বলল, 'ওড়ায় চল্, বাবা খুঁজছে তোকে।'

ইতিপূর্বে কখনো বাহার হাতের আকর্ষণ দীঘলের এত আবেদনহীন মনে হয়নি। ওড়ার টানও আজ তার কাছে সম্পূর্ণই অবান্তর যেন। হড়ের ওড়া বা আতো থাকার কোনো অর্থ নেই! সে ঘর বাঁধলেই তা উজাড় হয়ে যায়। নাইকী সুরীন মুর্মু বলে, হড়্ কখনো নোয়াপুরীর এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পায়নি, সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই সে প্রকৃতির বুকে যাযাবার। এ নাকি সির্সিজাওই ঠাকুরজিউর অভিশাপের ফল ? দেবদূত লিটার প্ররোচনায় আদি মানব মানবী পিলচু কোড়া আর পিলচু কুড়ি যে পাপ করেছিল তারই শাস্তি!

॥ এগারো ॥

গড়মকে ফিরিয়ে আনা গেল না। দীঘলকে সঙ্গে নিয়ে কানহু ভ্রাতৃবর্গ বোরিওর মহাজন হরেরাম ভগতের কুঠিতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই তাকে দারোগাকে দিয়ে বাঁধিয়ে সাধারণ চোর ডাকাতের সঙ্গে পাহাড়ী ফৌজের রক্ষণাধীনে ভাগলপুরে প্রধান কাজির আদালতে বিচারের জন্যে চালান দেওয়া হয়েছে। কাজিকে দেখাবার জন্যে গড়ম হিসেবের দড়ি নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে গেছে। মহাজনের গোমস্তাও প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো খাতাপত্র নিয়ে আদালতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

খোদ হরেরাম ভগতের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শোনার পর কানহু সখেদে লাফিয়ে ওঠে, 'এটা তুই কি করলি বটে ভগত, হড়ের কোড়াটাকে কাজির কাছে চালান দিলি, তার যে ফাটক হয়ে যাবে ?'

গলার কণ্ঠির ফাঁকে আঙুল চালিয়ে নগ্নগাত্র মহাজন জবাব দেয়, 'আমার আর কি দোষ বল্ ? তিন ফসলের পর সুদ সমেত ধার শোধ দেবার কথা, তা আসল তো চিরদিনের মতনই গেল, সুদটাও পঞ্চাশ বছরে উসুল হল না। আমারও তো ঘর-সংসার রয়েছে, আমাকেও তো ছেলেপেলে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে ? কিন্তু এ কি অবস্থা হয়েছে আমার, গায়ে একটা পিরান চড়াবার পয়সা

অব্দি নেই। দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাই না, শীতের দিনে খালি গায়ের ওপর ভোটকম্বল চাপিয়ে পাশে আগুনের মালসা নিয়ে বসে থাকি ; এরই নাম তো মহাজন! বাপ-পিতেমোর যে দু-চারটে পয়সা ছিল তা তোদের হড়্ জাতের সেবায় উচ্ছুগ্গু করে এখন আমার হাতে খোলা আর পাছায় হরিনামের মালা। নারায়ণ নারায়ণ! এবার এক-দুটোকে বেঁধে কাজির কাছে চালান না দিলে তোদের শিক্ষে হবে না। ভালমানুষী করে তো এতকাল দেখলুম?'

মহাজনের সুদীর্ঘ এবং বিরামহীন আক্ষেপ শুনে সিধু কানহু থ, ভৈরব আর চান্দো তো আগাগোড়াই চুপ। এ বক্তৃতা অথবা খেদোক্তির জবাব দেবার ক্ষমতা তাদের নেই।

কানহু কতকটা অবুঝ ও একরোখা ভাব নিয়ে বলে, 'কিন্তু তবু কাজটা তুই ভাল করলি না ভগত। সুদ আসল দেবে কোথা থেকে, সব ফোসল তো তুই সুদের সুদ বলে কেড়ে নিলি? তারপর দিন আধ পয়সা মজুরীতে নিজের জমিতে বাপ-বেটাকে বেগার দিতে বললি। না না, কাজটা তুই ভাল করলি না রে ভগত!' কথা শেষ করেও কানহু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘট ঘট করে অসন্তোষের ঘাড় নাড়ে।

এরপর প্রসঙ্গ আর বিশেষ দূর যায় না, নিরুপায় হড়্গুলি মহাজনের কুঠি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ভাগলপুরে গিয়ে আর লাভ নেই। কাজির বিচারের পর কোনো হড়্ ছাড়ান পেয়ে নিজের আতোয় ফেরেনি। গড়মও এখন খরচের খাতায়। আর কোনোদিন সে আতোয় ফিরে আসবে না। ফাটক খেটে ছাড়ান পেলেও মেথর গড়মকে ভাগনাডিহির হড়্ সমাজ ফেরত নেবে না। ভাগলপুর শহরে ফাটকী হড়দের নতুন সমাজ গড়ে উঠছে, বিভিন্ন জাতের কয়েদী মেয়ে পুরুষ মিলে একটি মেথর সম্প্রদায়।

অত্যন্ত মনমরা হয়ে আতোর পথে হাঁটছে দীঘল, যেন শ্মশানে মড়া পুড়িয়ে ওড়ায় ফিরছে। চলার শক্তি নেই।

দীঘলের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কানহু তাকে ভরসা দেয়, 'অত ভাবিস না দীঘল, গড়ম ঠিকই ফিরে আসবে। এবার আমরা সব হড়্ এক হয়ে পাজী মহাজনদের মেরে তাড়াব। পোও পুবি আর মুণ্ডাগুলোকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। একদিন হড়্ই নোয়াপুরীর রাপাজ ছিল, আবার রাপাজ হবে। দামিনঈকোহ্‌র ধারতি হড়ের ধারতি।'

পথের মাঝে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে দীঘল চুটি ধরায়, তারপর হতাশ ভঙ্গিতে

ধোঁয়া ফেলতে ফেলতে অশ্রুবিজড়িত স্বরে অসহায় খেদোক্তি করে, 'এ বছরের বারো আনার মতন ফোসল ভগতকে দিয়েছি, তবু ভূতের বাচ্চাটা বলে সুদের সুদও বাকি রয়ে গেছে, ও বেটার গোমস্তা বহি কিতোবে কি যে হিসেব লেখে—'

দীঘলের কথার মাঝে বাধা দিয়ে সিধু বলে, 'ওরা সব একদিন হড়ের হাতে মারা পড়ে নোয়াপুরী থেকে হানাপুরী যাবে তো, তারই হিসেব !'

কানহু আপাতত এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে না, সে কিঞ্চিৎ চিন্তাচ্ছন্ন। এ বছর ভালই ফসল তুলেছিল ভোগন টুডু। আঁটি বাঁধা ধানের বোঝা কানহু দেখেছে। ফসল কাটার কদিন পরেই সূর্যগ্রহণ গেছে, সে সময় যত ফসলের বোঝা ভোগন আর তার ছেলে বউরা ওড়ার বাইরে এনে ডুশাদ ঠাকুরের ঋণ শুধতে চেয়েছিল। গ্রামের সব হড়্ পরিবারের মিলিয়ে কত ফসল ; সব গেল কোথায়, ডুশাদ ঠাকুর তো সত্যিই কিছু নিতে আসেনি ! নিয়ে যায়নি !

প্রাচীন যুগের কথা ; ধরতিতে প্রবল দুর্ভিক্ষ। অনাহারে দুনিয়ার যত হড়্ মৃত্যুর মুখোমুখি। সেই সময় সূর্য আর চন্দ্র সাক্ষী দাঁড়িয়ে হড়্দের জন্যে ডুশাদ ঠাকুরের কাছে ফসল ধার করল। সে ঋণ আজও শোধ হয়নি।

তাই বছরের একটি দিন ডুশাদ ঠাকুর সূর্যের আলো নিবিয়ে দিয়ে তাকে হড়্দের মধ্যস্থ দাঁড়িয়ে ফসল ধার করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনি চাঁদকেও। সেইজন্যই সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ। নোয়াপুরীর যত হড়্ নিজেদের ফসলের সম্ভার দেখিয়ে ঋণ শোধ করতে আসে। সে দিনটা অত্যন্ত পবিত্রভাবে থেকে ডুশাদ ঠাকুর সিঞচান্দো আর ইন্দচান্দোর পুজো দেয়। স্তবগান করে। কোনো হড়্ সে সময় গর্ভবতী মেয়ের মুখ দর্শন করে না। প্রেমের টানে নারী পুরুষ পরস্পরের কাছে আসে না।

এ কেবল ভোগন টুডুর ঘরের কাহিনী নয়। আতো ভাগনাডিহির বারো আনা ফসল বোরিওবাজারে বিভিন্ন মহাজনের কুঠিতে চলে যায়। জমির খাজনা বলে পাজী মুণ্ডারাও মাঝে মাঝে হামলা করে খানিকটা আদায় করে। তারপর আর কতটুকুই বা বাঁচে ? বছরের এগারোটা মাস বুনো জন্তু, বনজ ফল আর বন্য শেকড়বাকড়ই হড়ের ভরসা। কিন্তু তাতেও যদি নিশ্চিন্ত স্বাধীনতার মধ্যে গা ভাসিয়ে রাখা যেত !

আতোয় ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে। গ্রামে ফেরার পর বাউণ্ডুলে সিধু কানহুরা

কোন্‌দিকে যেন চলে গেল ! তাদের ওড়া বলে কিছু নেই। হয়তো আজ রাতটা তারা মাঝিস্থানের বেদীতে কাটাবে, অথবা উপযুক্ত সঙ্গীসাথী জুটে গেলে ফুর্তির সন্ধানে অন্য কোনো আতোর উদ্দেশে পা বাড়াবে। কিংবা এই আতোরই কোথাও রাতের ডেরা খুঁজে নেবে ।

নিজেদের ওড়ার সুমুখে এসে পড়ল দীঘল। সামনেই হিলি বাহা মেঝেন দাঁড়িয়ে। তাকে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীঘল কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল। কি বলবে সে গড়মের কথা, ফিরিয়ে নিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেনি ?

দীঘলকে দেখে বাহা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল, 'তালা, তোর দাদা এল না ?'

জবাব দিতে পারল না দীঘল, সর্বহারার মতো মাথা নাড়ল শুধু।

দীঘলের হতাশ ভঙ্গিময় মুদ্রা দেখে বাহা ডুকরে কেঁদে উঠল। দীঘলের সাহস হল না তার হাত ধরে ওড়ার ভেতর টেনে নিয়ে যায়। গড়মের অন্তর্ধান যেন তার নিজেরই অপরাধ !

বোরিওবাজার যাওয়া আসায় এতখানি পথশ্রম, অসফল কাজে সারাদিন লিপ্ত থাকার দরুন এতটা মানসিক ক্লান্তি, তবু সামান্য কিছু খেয়ে ওড়ার দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর গা এলিয়ে দেওয়ার পর দীঘলের মনে হল আজ আর তার চোখে ঘুম আসবে না। অন্যদিন হলে সুযোগ বুঝে এ সময়টা বাহাকে কাছে নিত সে, কিন্তু আজ তার এ কথা একবারও মনে পড়ল না। মনে পড়লেও আজ সে কোনোমতেই গড়মের দুঃখিনী রিণিংকে কাছে ডাকতে পারত না।

ওড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে বাহাকে কাঁদতে দেখে ভেতরে এসে দীঘল বাপ মা-কে খবর দিয়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে বাহার কান্না থেমেছে, কিন্তু তারপরও সে আর দীঘলের সামনে আসেনি। যেন সমস্ত আপদের মূলে দীঘলেরই দায়।

বাহা ওড়ায় আছে, অথবা এই রাত্তিরেই পথের বিপদ-আপদের কথা ভুলে বাপের বাড়ির আতোয় পালিয়ে গেছে কে জানে ? গিয়ে থাকলেও দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবে আবার। যেমন ইতিপূর্বে সে আরও কয়েকবার এইরকম করেছে। কারণে বা অকারণে পালিয়েছে, আবার না ডাকতেই ফিরে এসেছে।

জোয়ান জোয়ান হড়্‌ বউগুলোর এই স্বভাব। দীঘলের ধারণা বাপের বাড়ির আতোয় বাহার কোনো পুরনো প্রেমিক আছে, সুখে দুখে মাঝে মাঝে সে যার

কাছে ছুটে যায়। পরিত্যক্ত ফুলের ওপর কখনো সখনো গিয়ে বসার লোভ কোনো মেয়ে বা পুরুষ ভোমরাই সহজে ছাড়তে পারে না। পুরনো প্রেমের স্মৃতি গেঁজে উঠে এক ধরনের নেশা ধরায়।

খুব শিগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়ল দীঘল। স্বপ্ন দেখছিল সে। খানিকটা অতীতের প্রকৃত ঘটনা এবং খানিকটা না ঘটা তথ্য মিলিয়ে এক বিচিত্র স্বপ্ন। গড়ম আর দীঘলকে নিয়ে ভোগন টুডু মাঝিস্থানে গেছে। তাদের শিকা দেওয়া হবে। শিকাহীন হড়্ আর উল্কিহীনা মেয়ে চিরদিনই অপবিত্র। এমন কি মরণের পর পরলোকের স্বর্গভূমিতে তাদের প্রবেশাধিকার নেই।

পুরুষের বাঁ হাতের উল্টো পিঠে কব্জি থেকে কনুই অবধি এক তিন অথবা পাঁচটি পোড়া ঘায়ের চিহ্ন। মেয়েদের বেলায় দুটি বাহু কণ্ঠ এবং বুকভরা উল্কি। কোড়াকুড়ির সহ্যশক্তির ওপরই শিকার সংখ্যা অথবা উল্কির বহর।

প্রথমে গড়মের শিকা. দীঘল তখন বসে বসে দেখছে। গড়মের বয়েস দশ, দীঘলের পাঁচ। আতোর গোড়াইত শিকা দেওয়ায় পটু, খুব পাকা হাত। গড়মের বাঁ হাতটা টেনে তিনটি জায়গা নিজের মুখের জবজবে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে দিল। তারপর ন্যাকড়ার নুটিতে আগুন ধরিয়ে সেই ধীমে আগুন থুথু লাগানো জায়গায় চেপে চেপে ধরতে লাগল। খুব কাঁদছে গড়ম, পাগলের মতো ছটফট করছে। বাপ ভোগন তাকে দুটি সবল বাহু দিয়ে চেপে ধরে নানান স্তোক দিচ্ছে। বিবিধ প্রলোভন দেখাচ্ছে, এমনকি ঘা শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে বাপলা দিয়ে ঘর আলো করা ফুটফুটে রিণিঃ আনার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত।

এবার দীঘলের পালা। সে কিন্তু কাঁদেনি মোটেই। শিকা দেওয়া হয় শীত কালে। প্রতিদিন শেতাঃবেরে দু-ভাই ওড়ার বাইরে এসে দুব্বোঘাসের শিশির মাখিয়ে পোড়া ঘা ভিজিয়েছে। শিশিরের প্রলেপ দিলে ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

সে সময় ঘায়ের ওপর শিশির মাখাতে মাখাতে গড়ম একদিন বলেছিল, 'ঘা শুকিয়ে গেলেই আমার বাপলা হবে, বাবা বলেছে।'

'আমারও বাপলা হবে।' দীঘল গুমোর দেখায়।

'তোর আবার আলাদা বাপলা কেন হতে যাবে, আমার রিণিঃ মানেই তো তোরও রিণিঃ?' হড়্ সমাজের যা চিরাচরিত কথা তাই খুব উদারভাবে বলেছে গড়ম, তারপর একটা আশংকার কথাও তুলেছিল সে, 'একটা ওড়ায় দুটো রিণিঃ থাকলে ভাই ভাইয়ে রেটেপেটে হয়, সংসার ভেঙে যায়—মারাং গ' তো এই

কথাই বলে।'

স্বপ্ন দেখার মধ্যেও দীঘলের এক টুকরো জাগ্রত চেতনা বজায় আছে যেন। সে অনুভব করে স্বপ্নের আগাগোড়া সত্যি নয়। তার আর গড়মের একসঙ্গে শিকা হয়নি। সে তো গড়মের শিকা দেওয়া দেখেনি? গড়মের হাতে পাঁচটা শিকার দাগ, আর তার মাত্র একটা।

দীঘল শুনেছে শিকা নিতে গড়ম কাঁদেনি মোটেই। বরং মনে আছে সে নিজে খুবই কেঁদেছিল। আর এ কথা গড়ম কোনোদিনই তাকে বলেনি, আমার রিণিঃ মানেই তোরও রিণিঃ। এই ধরনের কথা কোনো হড়্ই কখনো তার ছোট ভাইকে বলে না। তবে বাহার সঙ্গে দীঘলের যা অংসং তা গড়ম ভালই জানে। আর জানে ওড়া আর আতোর সবাই। কিন্তু সেসব কথা পারিবারিক বা সামাজিকভাবে আলোচনা করার বিষয় নয়। তাই এ গোপন প্রসঙ্গ তোলে না কেউ।

দীঘলের ঘুম একবার তরল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর আবার খুব গাঢ় ঘুমে ডুবে গিয়েছিল সে। এ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের উপদ্রব নেই।

এক সময় দীঘল ধড়মড়িয়ে চোখ মেলল, কে যেন দু-হাত দিয়ে খুব জোরে জোরে ঠেলছে তাকে। একটু ধাতস্থ হয়ে সে সবিস্ময়ে দেখল, আর কেউ নয়, বাহা কিস্কু!

'হিলি!' চমকিত দীঘল হাত বাড়িয়ে বাহাকে ধরতে গেল। বাহা যখন নিজেই যেচে এসেছে তখন তাকে কাছে টেনে নিতে দীঘলের আর আপত্তি নেই।

বাহা কিন্তু ধরা না দিয়ে ত্বরিতে ছিটকে সরে গেল, তারপর সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বরে বলল, 'না না, এখন নয়। মুণ্ডারা আতোর ওপর চড়াও হয়েছে, ওঠ্ তাড়াতাড়ি।'

বাহা কাছে এসেছে, এ ব্যাপার বুঝতে গাঢ় নিদ্রা থেকে হঠাৎ জাগরিত দীঘলের বিশেষ সময় লাগেনি, কিন্তু বাকি জিনিসটা যেন সহজে বোধগম্য হয় না। মুণ্ডা অর্থাৎ পাহাড়ীরা, হঠাৎ গ্রাম আক্রমণ করল কেন? সাপের স্বত্ব নিয়ে বিবাদের কথাটা মনে পড়ল না তার। তাছাড়া ভীরু চোর মুণ্ডারা ঢাকঢোল বাজিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিতে আসবে, এ যেন চিন্তা করাও যায় না। অস্ত্র হাতে হড়ের মুখোমুখি দাঁড়াবে ততখানি সাহসী বা শক্তিশালী তারা কোনোদিনই নয়।

মাঝিস্থানের দিক থেকে কাড়ানাকাড়ার শব্দ ভেসে আসছে। যুদ্ধ-দামামা। হড়্‌কে সমর-প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বিস্ময় কাটিয়ে ফেলে দীঘল উঠে দাঁড়াল এবার। আকস্মিকভাবে ঘুম ভেঙে যাওয়ার দুর্বলতা বা অস্বস্তি শরীরে আর নেই। এখন যেন সে পরিপূর্ণ বিশ্রামের পর প্রস্তুত হড়্‌ সৈনিক।

কুঠলির ভেতরে গিয়ে ঘোর অন্ধকার হাতড়ে কাঁড়বাঁশ নিয়ে দীঘল বেরিয়ে এল। পিঠে বাঁশের তূণীর। বাঁ কাঁধে ধনুক। কুঠলিতে একটা কাটারিও আছে। কি মনে করে আর একবার ভেতরে ঢুকে কাটারিটাও বের করে আনল।

বাহা সামনেই দাঁড়িয়ে, আবছা আঁধারে বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দীঘলের যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেখছে।

বাহাকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীঘল প্রশ্ন করল, 'অতে হিলি, বা' ওকারে ?'

বাহা উত্তর দিল, 'বাবা মাঝিস্থানে চলে গেছে, তোকেও পাঠিয়ে দিতে বলেছে।'

তীরধনুক নিয়ে গেছে তো ?' দাওয়ার ওপর থেকে নিচে নামতে নামতে দীঘল আবার জিজ্ঞেস করে।

বাহা ঘাড় নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

ওড়া থেকে বেরিয়ে দীঘল খুব দ্রুত মাঝিস্থানের দিকে হাঁটতে থাকে। তীরধনুকে তার হাত সবিশেষ অভ্যস্ত ; কোন্ হড়েরই বা নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে বাপ ভোগন টুডুর সমান দক্ষ দশ-বিশটা আতোয় নেই। তার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত তীর যেন মন্ত্রসিদ্ধ। চোখ বেঁধে দিলেও শব্দভেদী নিশানা অব্যর্থ।

অথচ দীঘল তার বাপকে তীর ধনুক বিশেষ ছুঁতে দেখেনি। শিকারে গিয়ে ভোগন হাতের নিশানা দেখিয়েছে, কিন্তু আতোয় থাকতে কৃষিপ্রাণ সে অস্ত্রের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

গ্রীষ্মকালের শিকার-পর্বে ভোগন টুডুই আতোর শিকারীদের দলপতি। শিকার-উদ্যোগের সময় কি পরিমাণ শুদ্ধাচারে থাকে সে তা দেখে দীঘল অবাক। প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে দুই রিণিঃর কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না, এক শয্যায় তাদের সঙ্গে শোয়া তো দূরের কথা। সমস্ত দিন উপবাস আর পুজোপাঠ, দিনান্তে যৎসামান্য আহার।

শিকার-পর্বে দলপতি হয়ে যাওয়ার অর্থ আতোর যত হড়্‌ তাদের সবার

দায়দায়িত্ব ঘাড়ে বয়ে নিয়ে চলা। সকলকে যেন ভালয় ভালয় আতোয় ফিরিয়ে আনতে পারা যায়। বাঘের থাবা আর বুনো শুয়োরের দাঁতের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে। দলবদ্ধ হাতির আক্রমণ ও অতর্কিতে বিষাক্ত সাপের কামড় এড়িয়ে। আরও কত সম্ভাব্য বিপদ। উপরন্তু জানা অজানা রোগব্যাধি।

গ্রাম থেকে যাত্রা করার আগে কত জায়গায় ভোগনের পুজো দেওয়া। সে পর্ব চলে অন্তত সাতদিন ধরে। সর্বপ্রথম আতোর জাহেরস্থান, যেটি অধিকাংশ দেবদেবী এবং বোঙাবর্গের আলয়-নিলয়। বিবিধ বৃক্ষের সমারোহে মনুষ্যরচিত উপবন। প্রধানা দেবী নেত্রী জাহেরেরা, তারপর দেবতা মারাং বুরু, আর সর্ব-শেষে বোঙা মড়েকোতুরুইকো অপদেবতা।

ভোগন টুডুর তত্ত্বাবধানে আতো নাইকী এবং তার সহকারী কুড়ম নাইকী পুজো ও বলির প্রসাদ বিতরণ করে। এ প্রসাদে কেবল হড়েরই অধিকার। দেবী জাহেরেরার প্রসাদ নাইকী-পত্নী ভিন্ন অপর কোনো মায়জিউ অথবা কুড়ির প্রাপ্য নয়।

তারপর সীমা বোঙা। সীমা বোঙার ষোড়শোপচার পুজো বছরে দুটি বার, চাষের আগে এবং ফসল কাটার সময়। শিকার-যাত্রায় পরগণা বোঙার তুষ্টি-সাধন অতি আবশ্যিক। এ পুজোর নিয়মবিধিও অত্যন্ত কঠিন। চালের সঙ্গে নিজের শরীরের প্রভূত পরিমাণ রক্ত মিশিয়ে কুড়ম নাইকী পুজো করে তার। সমস্ত পূজাদির তত্ত্বাবধান ভোগন টুডুর। সেইসঙ্গে সীমা বোঙার খুচরো পুজো। সে সময় মাঝিস্থানে মোরগ বলিও বাদ যায় না।

ওদিকে আবার পরগণা বোঙার পাশাপাশি রতি-পরী রংগোরুজি বোঙা। প্রণয় ও যৌনতার প্রতীক মূর্তি। শিকার-উৎসবের সময়কার কামোদ্দীপক সুরে নাকাড়া রেগড়াটামাক বাজিয়ে তার পুজো ও প্রসাদ ভিক্ষা।

এতগুলি পুজোর উদ্যোগ-আয়োজন সামলে নিজের ওড়ার নিত্য পুজো। সেটা তো ভোগনের একারই দায়িত্ব। মারাংবুরু ওকর বোঙা গুপ্ত বোঙা; নিজের নিজের অধিকারক্ষেত্রে সকলেই মহা শক্তিধর। অতএব পুজোর সময় নিষ্ঠার তারতম্য তাদের পক্ষে অসহনীয়। এ বিষয়ে ভোগনকে সর্বদাই খুব সচেতন থাকতে হয়। তবে ভোগন টুডুর মৃত্যুর আগে গড়ম যদি ফিরতে না পারে টুডু পরিবারের গুপ্ত বোঙা চিরদিন অজ্ঞাত ও অপরিচিতই থেকে যাবে।

॥ বারো ॥

দীঘল মাঝিস্থানে এসে পৌঁছুল। মশালের আলোয় জায়গাটা আলোকিত অনেক হড়্ উপস্থিত। সকলেই যুদ্ধসাজে সজ্জিত। ব্যস্ত ও উত্তেজিত স্বরে কথা-বার্তা। দ্রুত পদক্ষেপ। কানহু সিধু ভ্রাতৃবর্গের দু-জন এখানে অনুপস্থিত। কানহু আর ভৈরব। ভোগন টুডুও নেই। আতো মাঝি ভৈরবের উপস্থিতি সত্ত্বেও সিধুর হাতেই দলের নেতৃত্ব।

হড়ের সামগ্রিক বাদ্যসম্ভার, ঢোল মাদল এবং কাড়ানাকাড়ার কর্ণভেদী রবের মধ্যে কথা বলা দুষ্কর, তবু দীঘল সিধুর সম্মুখে এসে দাঁড়াল, 'আমার বা' তো এখানেই এসেছিল, কোথায় গেছে বলতে পারিস ?'

দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে সিধু হাত তোলে, 'কানহু আর ভৈরবের সঙ্গে তোর বা' ঐ দিকে গেছে, সেখানে মুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই চলেছে।'

'ওঃ, আমিও ওদিকে যাচ্ছি।' ব্যস্ত স্বরে কথাটা বলে দীঘলও এগিয়ে যাবার জন্যে প্রস্থানোদ্যত হয়।

সিধু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দীঘলের হাত ধরে ফেলে বাধা দেয়, 'না না, এখন তোকে যেতে হবে না। মুণ্ডারা কত জন এসেছে তা তো আমরা বলতে পারি না, যদি তারা অন্য কোনো দিক থেকে চড়াও হয় তখন আমাদেরই এগিয়ে গিয়ে রুখতে হবে।'

বাপ এগিয়ে গেছে, হয়তো প্রাণান্তকারী পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়েছে সে। এ হেন অবস্থায় দীঘলের এমন স্থির ও নিশ্চেষ্টভাবে অপেক্ষা করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে তার মানসিক অস্তিত্ব ভোগনের পাশে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু দলপতির নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য নেই। তবু সে আর একবার সকাতর অনুমতি প্রার্থনা করে, 'আমিও যাই না ওখানে ?'

'বাইং—না।' সিধু খুব জোরে ঘাড় নাড়ে।

এরপর দীঘল নিরুপায়, হতাশ হয়ে সে মাঝিস্থানের বেদীর ওপর বসে পড়ে। কাপি আর তীরধনুকের বোঝাও পাশে নামিয়ে রাখে। কাপিটা সে ইতিপূর্বে কোমরে বেঁধে নিয়েছিল। দু-রাত্রির মধ্যে কি সব হয়ে যাচ্ছে যেন !

গড়মকে বেঁধে দারোগা কাজির কাছে চালান দিয়েছে, এ জীবনে তার আর

আতোয় ফেরার সম্ভাবনা নেই। বাপ্ মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মোকাবিলা করতে গেছে, তারও প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত। ওড়া খালি। বার বার দীঘলের মনে হতে লাগল ভোগন আর গড়মের ওড়া থেকে শেষ যাত্রা হয়ে গেছে। আর কোনোদিনই তারা আতোয় ফিরবে না।

কোথা থেকে কি নির্দেশ এল দীঘল তা লক্ষ্য করেনি, হঠাৎ সে শুনতে পেল দামামার শব্দ ছাপিয়ে সিধু চিৎকার করছে, 'দেলা দেলা হড়্, তাড়াম তাড়াম ম্যা—চল্ চল্, হড়্, এবার আমরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। দে—লা —আ !'

কিন্তু দীঘলের আর উৎসাহ নেই। তার মনের উদ্দীপনা নিভে গেছে, তবু সিধুর নির্দেশে উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের হুংকার তুলে দলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হয়। মাঝিস্থানের পাহারা আর আতোর আভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একটা ছোট দল এখানেই রয়ে গেল। দীঘল ভাবছে তাকেও যদি এদের সঙ্গে বসে থাকার আদেশ দেওয়া হত তা হলে সে সবিশেষ খুশিই থাকত।

না, খুশির ক্ষুদ্রতম অংকুরও আর দীঘলের মনে নেই, যা এখন সুযোগ এবং সুবিধে অনুসন্ধান করে শাখা-প্রশাখায় চেতনার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলবে। তবে মাঝিস্থানে চুপ করে বসে থাকতে পেলে সে যেন খানিকটা স্বস্তিলাভ করত। কি হবে আর দলের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে? এরা চলেছে নিজেদের আতো রক্ষা করতে, ওড়া বাঁচাতে, কিন্তু তার নিজের ওড়া তো উজাড়? ভাই আগেই মহাজনের রোষের আগুনে গেছে, ইতিমধ্যে বাপও অবশ্যই মরে গিয়ে থাকবে। দীঘলের কানের কাছে যেন একটা আকারহীন মুখ এসে অনবরত বলে চলেছে, 'তালাকোড়া তোর আপাতকে মুণ্ডারা মেরে ফেলেছে।'

কানহুর দল গেছে দক্ষিণে, আর এ দল চলেছে পূর্ব দিকে। সেদিক থেকে খুব ঘন হৈ হৈ রব আসছে। সম্ভবত পাহাড়ী মুণ্ডাদের সোল্লাস কোলাহল। পশ্চিম অথবা উত্তর দিয়ে তাদের আতোয় প্রবেশের সম্ভাবনা নেই।

উত্তরে জঙ্গল।

পশ্চিমেও গভীর বনানী। সূর্যের আলো পর্যন্ত সেখানে কোনোদিন প্রবেশ করতে পারেনি। সে কুমারী মাটির বুকে এখনো পর্যন্ত মানুষের পদস্পর্শ হয়নি। ভবিষ্যতে যদি হয় তা হবে হড়ের প্রথম পদক্ষেপ। কুমারী মৃত্তিকার রোমাঞ্চকর প্রথম স্পর্শসুখ পাওয়া হড়েরই অগ্রাধিকার। অপর জাতের সে অধিকার অথবা দুঃসাহস নেই। অভিজ্ঞতা আর সহিষ্ণুতারও অভাব।

দক্ষিণে গিরিশ্রেণী, সেখানে পাহাড়ীদের বসবাস, আর সেদিক থেকেই হ্রদের আতো ভাগনাডিহিতে প্রবেশের রাস্তা। এবং পূর্ব দিকটা মালভূমির মতো, যেদিকে সাধারণ পথঘাট। হয়তো দক্ষিণে ব্যর্থ অথবা সফল হয়ে পাহাড়ীরা পূর্বাঞ্চলে সরে গেছে। এবার সেদিকেই তাদের প্রয়াস। কিংবা এখন উভয় পথেই প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

দলের সঙ্গে ছুটতে গিয়েও দীঘল পিছিয়ে পড়েছে, অজস্র ভাবনাচিন্তা তার পায়ের নিগড়। এ অবস্থায় ছুটে লাভ নেই কোনো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত শ্রান্ত ও অবসন্ন সৈনিকের মতো সে শিথিল ও উৎসাহহীন পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল। হাঁটছে অবশ্য সুমুখ পানেই, কিন্তু ক্রমশই সে একা। অন্ধকার আকাশ গাছপালার অবরোধপূর্ণ জটিল পথরেখা, সিধুর দল দৃষ্টির সম্পূর্ণ অন্তরালে। দীঘল আর দলের সঙ্গ গ্রহণে সচেষ্ট হয় না। পরিচিত পথ ধরে সে শুধু উদ্দেশ্য-হীনভাবে হেঁটে চলে।

রাস্তার ডান দিকে চোখ পড়তে দীঘল দেখল প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা অগ্নিশিখার মতো কি যেন রয়েছে। ওদিকে কোনো ওড়া নেই। জায়গাটা গ্রামের সীমারেখার বাইরে। অগভীর জঙ্গলাকীর্ণ দিনেরবেলা প্রয়োজনবোধে মানুষ যায় ওখানে, কিন্তু রাতে কখনো নয়। ঘন জঙ্গলের বাঘ বেরিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

দীঘলের মনে হল হয়তো কোনো পাহাড়ী মুণ্ডা দিনেরবেলা আগেভাগে এসে ওখানে লুকিয়েছিল, এখন প্রদীপ জেলে সঙ্গীদের পথ-নির্দেশ দিচ্ছে। একাধিক ব্যক্তিও লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

দীঘল সহজ শিকারের লোভ সামলাতে পারল না। তিন-চারজন মানুষ ওখানে জুটে থাকলেও গাছের আড়াল নিয়ে বিষাক্ত তীর গেঁথে সবগুলোকে শিকার করা বিশেষ কঠিন নয়। হয়তো আজকের যুদ্ধে এটাই হবে সবচেয়ে বড় বিজয়।

আলোর কম্পিত শিখা লক্ষ্য করে সন্তর্পণ পদক্ষেপে দীঘল এগিয়ে চলল। আর মাত্র হাত দশেক, কিন্তু গাছপালার ঘনত্বের দরুন জায়গাটা দৃষ্টির সুমুখে স্পষ্ট নয়। এদিকে শুকনো পাতাপত্র আর ভাঙা ডালপালার ওপর তার পদশব্দ ফুটতে আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যে একটা ভাঙা ডালের বড় টুকরোয় হোঁচটও লেগেছে তার।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেল দীঘল। প্রায় নিভৃতে এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে।

নিজের বুকের নিশ্বাসটাও সে প্রায় চেপে নিয়েছে। যেন গতিহীন গতিতে হেঁটে সে একটা গাছের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, যার গায়ের সঙ্গে বন্য লতাপত্র জড়িত। পাতার জাল ঈষৎ সরিয়ে রেখে দীঘল দৃষ্টি চালনা করল।

না, আশংকা এবং লোভ অমূলক। মুণ্ডা চর নয়। দু-জন হড়্ রমণী সম্পূর্ণ উলঙ্গ। একজন সুপরিচিত, এই আতোরই নিনকী মেঝেন, যে বহুবার বিভিন্ন হড়ের সঙ্গে আঙ্গির আপাঙ্গির হয়েছে। ভালবাসার বন্ধনে জড়িত হয়ে ওড়া আর আতো ছেড়ে অন্যত্র পালিয়েছে। মোহভঙ্গের পর আবার ফিরে এসেছে।

নিনকী মেঝেনের আর এক পরিচয়, আতোর যে কোনো পরিবারের বিপদ আপদ কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পৌছে গিয়ে নিজের বরাভয় ও সহায়তা-পূর্ণ হাত দুটি সে বাড়িয়ে দেয়। বিপদের মুখে অবিচল। পরিশ্রমে অকাতর।

নিনকী মেঝেনের সঙ্গিনী অপর মধ্যবয়সী রমণীটি দীঘলের মুখচেনা, কিন্তু তাকে কোথায় দেখেছে তা সে এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না। খুব সম্ভব এই আতোর হাটে কখনো সখনো দেখে থাকবে, হয়তো বা নিনকী মেঝেনেরই সঙ্গে।

দীঘলের স্মরণ হল আজ রবিবার, ডাইনীবিদ্যা শেখার পক্ষে সুপ্রশস্ত রাত। সেই বিদ্যাই শিখছে নিনকী। ঐ নারীটি নিঃসন্দেহে তার গুরু। গাছের নিচে ছোট্ট বেদী। বেদীর ওপর মাটির তৈরি নরমূর্তি। খুব নিচু স্বরে গুরুর অনুকরণে সংহার মন্ত্র উচ্চারণ করছে নিনকী মেঝেন। মাঝে মাঝে বাঁ হাতের সাহায্যে মূর্তির গায়ে সিঁদুর মাখিয়ে দিচ্ছে।

দীঘল শুনতে পায় মন্ত্রের মধ্যে একটা নাম বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, কামরু গুরু। কামরু গুরু হড়্ সমাজের ভেষজ চিকিৎসা বিদ্যার ধন্বন্তরি। ডাইনী বিদ্যারও আর এক অঙ্গ দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাকরণ।

দীঘলের হাত নিসপিস্ করে, ইচ্ছে হয় বিষাক্ত তীর গেঁথে ঐ পাপদুটিকে ধরতির মায়া কাটিয়ে হানাপুরী পাঠিয়ে দেয়। এ খবর অবশ্যই সে আতোর মাঝির কানে তুলবে। তারপর সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড় ক[illegible] বিচার এবং ডাইনীদের শাস্তি। তার অর্থ নিষ্ঠুরতম পন্থায় প্রাণ বিনাশ। হয়তো ওদের আগুনে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেওয়া হবে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য দীঘলের নেই। হাতেনাতে দু-জন ডাইনীকে ধরে ফেলে সে তীর বিঁধে মেরেছে, মুণ্ডা চর নিধনের চেয়ে এ খবর কম গুরুত্ব অথবা বীরত্বের নয়।

অথবা সাড়া পেয়ে ডাইনী দুটি হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বিষ্টচিত্ত মন্ত্রপাঠ স্তব্ধ। সংহার পূজা স্থগিত। ইতস্তত তাকাচ্ছে

তারা। চোখের দৃষ্টি সন্দেহ-কুটিল।

নিনকী মেঝেনের উদ্দেশে ডাইনী গুরু নিচু স্বরে বলে, 'কেউ নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য করছে, নয়তো পুজোয় হঠাৎ বাধা পড়ে গেল কেন?'

'কিসের বাধা পড়ল?' ডাইনী বিদ্যার শিক্ষানবীশ নিনকী মেঝেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

প্রৌঢ়া ডাইনীটি সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে উত্তর দেয়, 'কাছাকাছি কোনো মানুষ আছে, আমি বেশ টের পাচ্ছি!'

আর অপেক্ষা করার সময় নেই। দীঘলও প্রস্তুত। নিনকী মেঝেন তার তীরের অব্যর্থ নিশানায় রয়েছে, কিন্তু তীর ছাড়তে গিয়ে কেমন যেন মায়ায় বশীভূত হয়ে পড়ে সে। এত অনায়াসে নিনকী মেঝেনকে মেরে ফেলা যায় না। এ আতোর প্রতিটি হড়্ পরিবার তার কাছে ঋণী। কিন্তু নিনকী কখনো ঋণ পরিশোধ চায়নি। বরং তার কাছে সবার ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অথচ নিনকীকে বাদ দিয়ে তার ডাইনী গুরুকেও মারার উপায় নেই। হয় দুটি শিকার, নয়তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। ওদের চোখে পড়ে গেলে আর বাঁচার উপায় থাকবে না।

দীঘল নিশানার তীর নামিয়ে নিল।

ডাইনীদের মনে সন্দেহের দোলা। সে সন্দেহ বিশেষ ঘনীভূত হওয়ার আগেই দীঘল যতটা সম্ভব দ্রুত সেখান থেকে সরে গেল। ওরা ভাববে কোনো মানুষ নয়, বন্য জন্তু। মানুষ বলে মনে করলেও ক্ষতি নেই। নাম ও গোত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত ডাইনীবিদ্যার প্রয়োগ অচল।

এ যাত্রা একটা ফাঁড়া কাটিয়ে গেল দীঘল টুডু!

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দীঘল রাস্তায় দাঁড়াল। হড়ের যুদ্ধ দামামায় উদ্দাম আবেগ। আতোর দক্ষিণ আর পূর্ব দু-দিক থেকেই শব্দ ভেসে আসছে। দীঘল একবার দাঁড়িয়ে পড়ে কর্তব্য চিন্তা করে, তারপর সিধুর নির্দেশ স্মরণে এনে পূর্ব দিকেই হাঁটতে থাকে সে। এবার খুবই দ্রুত। হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে চোখ পড়ে তার। চোরখেদা তারা ফুটে উঠেছে, ভোর হতে বেশি দেরি নেই আর।

তেরো

বিধি অনুযায়ী তিনটি মৃতদেহ গ্রাম-পথের দ্বিমাথায় এসে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র আতো ভাগনাডিহির হড়্‌ই নয়, আশপাশের চার-পাঁচটি গ্রামের মানুষও এখানে উপস্থিত। পুরুষেরা বিষণ্ণ-মুখ, আর মেয়েদের কণ্ঠে ক্রন্দন-রোল ও সুরেলা বিলাপ-ধ্বনি।

এ পরিবেশেও সিধু ভ্রাতৃবর্গ সর্বেসর্বা। তারাই সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। গত রাতের পাহাড়ী হামলা ঠেকাতে গিয়ে তিনজন হড়্‌ মারা গেছে। শত্রু-পক্ষের তীর গলায় গেঁথে যাওয়ার ফলে মরেছে দীঘলের বাপ ভোগন টুডু। অপর দু-জন অধিকতর উত্তেজিত হয়ে মুণ্ডা দলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল, মুণ্ডারা তাদের বর্শা বিঁধে মেরেছে। আর এই যুদ্ধে বিভিন্নভাবে আহতের সংখ্যা সাত।

পাহাড়ীদের দিকেও অবশ্যই হতাহত আছে, তবে সঠিক বিবরণ এখনো পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। মৃতদেহ এবং আহতদের তুলে নিয়ে গেছে তারা। ও পক্ষে সবারই তীরের আঘাত। পাহাড়ীরা যে পথে ফিরে গেছে সেখানে রক্তের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। আর ভোগন টুডু যখন আহত হয় তখন তার পিঠে বাঁধা বাঁশের তূণীর সম্পূর্ণ খালি। অতগুলি তীর অবশ্যই দু-চারটেকে নিপাত করে থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আরও বহু হড়ের তূণও একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। তা না হলে সেজেগুজে হামলা করতে আসার পর দু-দিক থেকে মুণ্ডারা ঐ ভাবে পালিয়েই বা যাবে কেন?

দীঘলের চোখে জল নেই। কোনো হড়্‌ পুরুষই কাঁদতে জানে না, কিন্তু মৃত ভোগনের দুই রিণিঃ, আর গড়মের রিণিঃ বাহা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। নিশ্চুপ দীঘল পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করে নিনকী মেঝেন কখন যেন তাদের পাশে গিয়ে হাজির হয়ে অশ্রুরুদ্ধ গলায় কান্না বন্ধ করতে বলছে। শান্ত কণ্ঠে কথা বলছে বটে সে, কিন্তু ভঙ্গি অত্যন্ত উত্তেজিত, এবং যেন খুবই আক্রোশপূর্ণ।

নিনকীর মুখের কথাগুলো শুনে দীঘলের সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে, রাত্রিশেষে দেখা সমস্ত চিত্রটা আনুপূর্বিক মনে পড়ে যায় তার।

ভোগনের দুই বিধবা রিণিংকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিনকী মেঝেন হঠাৎ উত্তেজনার আতিশয্যে বলে ফেলেছে, 'তোরা চুপ কর, আমি এর শোধ তুলে নেব। মুণ্ডা সর্দারকে আমি দেখেছি, চিনে রেখেছি, তার নাম গোত্র সবই জানি, তাকে আমি সাত দিনের ভেতর মেরে ফেলব। আর গিদরি পাহাড়ের যত মুণ্ডা সবাইকে মেরে ফেলব।'

এই বিষাদময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মাঝেও সিধু হেসে ফেলে, তারপর সে নিনকীর উদ্দেশে বলে, 'তুই সর্দারকে মেরে ফেলবি, সব মুণ্ডাদেরও মেরে ফেলবি; এই নে আমার তীর-ধনুক, এখুনি গিয়ে তাদের সকলকে মেরে আয়!'

নিনকী মেঝেনের দু-চোখে সপ্রাণ আগ্নেয়গিরির বিপুল অগ্নি-প্রবাহ, সে জ্বলন্ত স্বরে উত্তর দেয়, 'আমার তীর-ধনুকের দরকার হবে না, আমি খালি হাতেই মানুষকে শেষ করতে পারি।'

'তাই নাকি?' এবার কানহু সাশ্চর্য ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রশ্ন করে।

দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ ঘাড় নেড়ে নিনকী সরবে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ পারি। পারি কি না তা দেখতে চাস?'

নিনকীর কথা শুনতে শুনতে দীঘলের অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে ওঠে, শোকে আত্মহারা এবং প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ নিনকী মেঝেন নিজের সর্বনাশ সেধে ডেকে আনছে। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ না করে দীঘল হঠাৎ খুব জোরে চিৎকার করে ওঠে, 'এখন আমাদের এ সব বাজে কথা বলার সময় নয়, মাথার ওপর অনেক বিপদ, অনেক কাজ।'

দীঘলের আকস্মিক চিৎকারে নিনকী মেঝেন প্রথমটা সবিশেষ বিব্রত হয়ে পড়ে, তারপর আত্মস্থ হয়ে নারীবৃন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একজন সাধারণ মেয়ের মতোই কাঁদতে থাকে সে।

জঙ্গলের মধ্যে ডাইনী নিনকীর হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে দীঘলের ফাঁড়া কেটেছিল, অবশ্য এজন্যে তার নিজের মায়াই প্রধানত দায়ী, ডাইনীদের উদ্দেশে তীর ছুঁড়তে গিয়েও হাত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এ যাত্রা তার ত্বরিত হস্তক্ষেপের ফলেই গ্লানিময় মৃত্যুর হাত থেকে নিনকী মেঝেন বেঁচে গেল। এই-ভাবে উত্তেজনার বশে আর কিছুক্ষণ কথা বলে চললে তার ধরা পড়ে যেতে বিশেষ দেরি হত না।

ক্ষীণ-কলেবর নদী, নিকটবর্তী পাহাড়ী ঝর্ণার সঙ্গে যুক্ত, সেজন্য শুকোয় না কখনো, উপরন্তু খরস্রোতা, তাই সাধারণ দৃষ্টিতে ঝর্ণা বলেই মনে হয়। আশপাশে জঙ্গল এবং উঁচুনিচু পার্বত্যভূমি এ জলধারাকে ঝর্ণারূপেই চিহ্নিত করেছে। হড়ের ভাষায় ডাডী।

ডাডীর তীরে শ্মশান, তবে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই, ঋতু বিশেষে সুখ-সুবিধে দেখেই মৃতদেহ সৎকার হয়।

একসঙ্গে তিনটি শবদেহের মহাযাত্রা, মড়ক মহামারীর সময় ভিন্ন ভাগনাডিহি আতোর স্মৃতিতে এমন দ্বিতীয় নজির নেই। মাঝি আর আতো নাইকীর নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক শবানুগমনকারী শ্মশান-যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। কেবল মাত্র ভাগনাডিহির হড়্‌বর্গই নয়, নিকটস্থ আতোগুলি থেকে এসে যে সব হড়্ সমবেত হয়েছিল তাদের অনেকেই এ দলে রয়েছে। এবং সকলেই প্রায় রীতি-মতো যুদ্ধ-সাজে।

দক্ষিণে ব্যর্থ হয়ে মুণ্ডারা পূর্বদিক থেকে গ্রামে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল, ডাডীও ঐ দিকে, অতএব প্রস্তুত থাকাই সমীচীন। যদিও দিনদুপুরে চড়াও হবে ততখানি সাহসী মুণ্ডারা কোনোকালেই নয়। তাদের রক্তে ভীরু তস্করের বীজ, গোপনতার আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন সাহসিকতার পথে কার্যোদ্ধারের কথা চিন্তা করতে পারে না।

রাস্তার দ্বিমাথায় কাঁচা বাঁশে তৈরি তিনটি পারকমে তিনটি মৃতদেহ। শব-যাত্রার সময় হয়ে এসেছে। মড়া বাসি করা নিষিদ্ধ।

নিনকী মেঝেন ভোগনের জ্যেষ্ঠা রিগিঃ রতনী মেঝেনের হাত ধরে টেনে তোলে, 'ওঠ্, একবার ওড়ায় চল, তোর জাওঞাইয়ের সব জিনিসপত্তর বের করে দিবি তো?' তারপর সে দীঘলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আর দু-একজন হড়্কে সঙ্গে নিয়ে তোকেও একটু ওড়ায় যেতে হবে।'

শারীরিক অনড়তাবোধ সত্ত্বেও দীঘল নিনকী মেঝেন ও দুই মায়ের সঙ্গে নিজের অনড় পা-দুটি ওড়ার দিকে টেনে নিয়ে চলে। তাদের পিছু পিছু দু-জন সমব্যথী হড়্, যার মধ্যে কানহু অন্যতম।

শবানুগমনের সময় মৃতের সমস্ত ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে দিতে হয়, সে সবের উত্তরাধিকার নেই। শ্মশানেই এ সম্পত্তি নিলামে বিক্রি হয়ে যতটুকু প্রাপ্তি তার বিনিময়ে বড়জোর একটি খাসি এবং এক হাঁড়ি মদই জুটতে পারে, যা শ্মশান থেকে ফেরার পর শ্মশান-বন্ধুদের আপ্যায়নে উৎসর্গিত হয়।

আজকের তিনটি মৃত্যুই আকস্মিক এবং সবিশেষ দুঃখজনক, তবু অনিয়মের উপায় নেই। তিন মৃতের পরিবারবর্গই অস্থাবর সম্পত্তির বোঝা এনে পথের দ্বিমাথায় রক্ষিত তিনটি মৃতদেহের পাশে পাশে জমা করল।

গ্রামের শেষ সীমানা পর্যন্ত মেয়েদের শবানুগমনের অধিকার। তারপর ফিরতে হবে তাদের। শেষ দর্শনের উদ্দেশ্যে খাটিয়াগুলি নামানো হয়েছে। যে কান্নায় কিঞ্চিৎ ছেদ পড়েছিল এখন তা আবার চতুর্গুণ। ভোগন টুডুর দুই বিধবা রিণিঃ অশ্রুজলে ভাসছে, তাদের কণ্ঠে আকাশবিদারী বিলাপধ্বনি।

দীঘল অবাক হয়ে দেখল বাহার চোখ এখন সম্পূর্ণ শুকনো, কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে শ্বশুরের মৃত্যু-বিশুষ্ক মুখের দিকে আনমনে তাকিয়ে রয়েছে সে।

শ্মশানে পৌঁছনোর পর শবযাত্রীরা নদী থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে ছায়াস্নিগ্ধ গাছের আড়ালে বিশ্রামের সুযোগ খুঁজছে। তিনটি মৃতদেহ সংকারের জন্যে প্রায় বিশ মন কাঠের বোঝা গ্রাম থেকেই বয়ে আনতে হয়েছে, তবে অসংখ্য লোকবলের দরুন সে বোঝা হাওয়ার ভারে পালকের মতো এতদূর উড়ে এসেছে যেন!

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আতো মাঝি ভৈরব আর সুরীন নাইকী চিতা সাজাবার নির্দেশ দিচ্ছে। এক সারিতে তিনটি চিতা।

ভৈরব মাঝি বলে, 'চিতা তৈরি হবে উত্তর দক্ষিণে লম্বা, আর চারপাশে চারটে খুঁটি।'

ভৈরব মাঝির কথার সঙ্গে নাইকী যোগ করে, 'আর মড়ার মাথা থাকবে দক্ষিণে।'

তিনটি চিতায় একই সময়ে সদ্যস্নাত তিনটি শবদেহ তুলে দেওয়া হল। তারপর যারা মুখাগ্নি দেবে তাদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে নাইকী সুরীন মুর্মু বলে, 'মড়ার কিচরি থেকে খানিকটা করে ন্যাকড়া ছিঁড়ে এক হাত লম্বা কাঠিতে জড়িয়ে নে। তারপর ঐ কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে না দেখে মুখে আগুন দিবি।'

এ নির্দেশ পালিত হবার পর উপস্থিত সব হড় উঠে এসে প্রতিটি চিতায় শুকনো পাতা আর কাঠের টুকরো নিবেদন করে গেল। তারপর চিতাগ্নি নির্বাণের আগেই সবার মস্তক মুণ্ডন।

মৃতদেহগুলির পূর্ণ সংকারে প্রায় বিকেল। প্রতিটি চিতা থেকে মৃতের

আত্মীয়বর্গ অস্থি সংগ্রহ করল। ভোগন টুডুর পক্ষে একা দীঘল। করোটির খানিকটা অংশ, এক টুকরো বক্ষ পঞ্জর, আর এক খণ্ড ঊরুর অস্থি। তারপর সেই হাড়গুলি নদীর জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে হলুদবাটা ও সিঁদুর মাখিয়ে নতুন মৃৎপাত্রে বন্ধ করল সে। মৃতের নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে ওপরে একটি ছুঁচ পরিমাণ ছিদ্র।

চিতা ধোয়ার পর স্নান সেরে অস্থির পেটিকা মাথায় নিয়ে অন্যান্য হড়ের সঙ্গে আতোর পথ ধরল দীঘল। গ্রাম-সীমানায় এসে একটি নিভৃত স্থান বেছে নিয়ে সেই অস্থি সাময়িকভাবে সমাহিত করল, পরে সুবিধেমতো সময় দেখে দামোদর নদীতে অস্থি বিসর্জন দিয়ে আসবে।

একা দীঘল নয়, এ আতোর বহু হড়ই নিজেদের অত্মীয়বর্গের অস্থি বিসর্জন দিতে যাবে ; সাধারণত মাঘ মাসের ফসল কাটার পরে আর সোহরায় পর্বের শেষে, যে সময় হড়ের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল, দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রমেও সাময়িক বিরতি।

অশৌচ পাঁচদিন। পাঁচদিন মাংসাহার নিষিদ্ধ। পঞ্চম দিনে তেলনাহান। প্রতিটি শবানুগমনকারী হড়ের পুনরায় মস্তক মুণ্ডন। তারপর একত্রে স্নানঘাটে গিয়ে শুচি স্নান।

ঘাটের একধারে তিনটি কাঁচা শালপাতার প্রত্যেকটাতে দীঘল একটি করে দাঁতন, খানিকটা তেল সাজিমাটি ও সরষের খোল রাখল। তারপর আদি পুরুষ ও নারী পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুঢ়ীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানাল সে, 'আমার বা-কে তোদের হাতে তুলে দিয়েছি, তাকে খুব সাবধানে রাখবি, যেন হানাপুরীতে তার কোনো কষ্ট না হয়।'

যখন দীঘলের অন্তর থেকে মনে হল তার প্রার্থনায় পিলচু দম্পতি সাড়া দিয়েছে তখন সে বাপ ভোগন টুডুর প্রেতাত্মাকে স্মরণ করে বলল, 'বা', তুই সবসময় পিলচুদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।'

তেলনাহানের সামগ্রী উৎসর্গ করার পর দীঘল ও তার সঙ্গীবৃন্দ স্নান সেরে ওড়ায় ফিরল। ওড়ার মায়জিউদের সঙ্গে নিয়ে নিনকী মেঝেনও ভিন্ন জায়গায় স্নানে গিয়েছিল, তারা আগেই চলে এসেছে। ভোগনের কনিষ্ঠা বিধবা রিণিঃ সেরালী মেঝেনের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রায় সম সময়ের দুটি শোক বাহাও প্রায় সামলে নিয়েছে। একা ভোগনের জ্যেষ্ঠা রিণিঃ রতনী মেঝেনই

পারেনি।

দীঘলকে ওড়ার রাচায় পদার্পণ করতে দেখে রতনী মেঝেন হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, 'তোর আপাত কি আর একবারও ফিরবে না তালাকোড়া, আমার যে বলে গেল মুণ্ডাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে এখুনি আসছি?'

ইঙ্গাতের শোকাভিভূত প্রলাপোক্তির উত্তর দিল না দীঘল, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল সে। নিয়মভঙ্গের ভোজ এখনো বাকি, তবে দামোদরে গিয়ে অস্থি বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অশৌচান্ত নয়। ততদিন এ ওড়ায় কোনো শুভ কাজ হতে পারে না। হড়্ সমাজের নিয়মবিধি খুবই কঠিন। ব্যত্যয়ের উপায় নেই।

আপাতের আত্মার উদ্দেশে দীঘল সিধা উৎসর্গ করে। ভোগনের নির্দিষ্ট কুঠলিতে ঢুকে তার প্রিয় ভোজ্যবস্তু চালের বাতা থেকে ঝোলানো শিকেয় টাঙিয়ে দিল সে। বাহা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে নির্দেশ দেয়, কাছে যাওয়ার উপায় নেই, এ সময় কোনোকিছুতে মেয়েদের স্পর্শ ঘোর অশুচি।

মৃতের উদ্দেশে সিধা উৎসর্গের পালা চুকলে বাহা দীঘলকে বলে, 'ওড়ায় যে সব হড়্ রয়েছে এবার গিয়ে তাদের খেতে বল্। সবাই যেন বাঁ হাতে করে খায়, ডান হাতে খেলে বা-র আত্মায় দোষ লেগে যাবে।'

বাহার কথা শুনে দীঘলের চোখ দুটো অকারণেই ধক্ করে জ্বলে ওঠে, তারপর সে অবুঝের মতো চিৎকার করে বলে চলে, 'না, আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না, তার জন্যে মাঝি আছে, নাইকী আছে, এসব শেখানো তাদের কাজ।'

দীঘলের এই আকস্মিক ক্রোধের কারণ বাহার বোধাতীত, অন্যায় কিছু তো তো সে বলেনি? সমাজের যা আনআরি তাই বলেছে সে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নাইকী বা মাঝির অপেক্ষা রেখে বসে থাকেনি, এইটুকুই দোষ! তবু দীঘলের উষ্মার উত্তরে সে আর একটিও কথা বলে না। বেচারার মন খারাপ, একই দিনে বাপ আর বড় ভাইকে হারিয়ে গভীর অসহায়তার মধ্যে গিয়ে পড়েছে, হয়তো তাই মানসিক স্থিরতা রাখতে পারছে না। এ অবস্থায় তার এই যৎসামান্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাওয়া অনুচিত।

দীঘল কিন্তু ক্ষণেকের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে বাহার মুখের দিকে অপরাধী দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৈফিয়ৎ দেয়, 'আমার যেন কিছুতেই মনে হচ্ছে না বা' মরে গেছে!' তারপর বাহার সেই প্রস্তাবে সায় দিয়ে প্রশ্ন করে, 'আমি পেড়া হড়্দের কাছে

গিয়ে তাদের খেতে বলছি, বাঁ হাত দিয়ে খাবে তো?'

'হ্যাঁ।' মৃদু অপমানের মেঘ কেটে যাওয়া মুখে সময়োচিত ম্লান হাসি টেনে এনে বাহা বলে, 'তুইও পেড়া হড়্দের সঙ্গে বসে বাঁ হাতে খাবি। একেবারেই কিচ্ছু জানিস না দেখছি।' তারপর কথাটা এখন বলা উচিত কিনা ভাবতে গিয়ে বলার লোভে সে চিন্তা অসম্পূর্ণ রেখে বলে, 'রিগিঃ এসে কান ধরে ধরে তোকে সব শেখাবে।'

সব ভুলে গিয়ে অদ্ভুত একটু হেসে ফেলে দীঘল, তারপর উত্তর দেয়, 'আমার আর রিগিঃর দরকার নেই, এমনিতেই খুব ভাল আছি।' কথাটা শেষ করেই সে বাতায়নহীন কুঠলির নিচু দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে রাচার উন্মুক্ত আলোয় গিয়ে দাঁড়ায়।

দীঘল কুঠলি থেকে বেরুবার সময় বাহা তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়ে তার স্পর্শ বাঁচায়। নিজের অনিচ্ছে বা অজ্ঞাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলেও মৃতের উদ্দেশে কৃত সব অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যাবে! বাহা তা চায় না।

চোদ্দ

শুধু যে আতো ভাগনাডিহির তিনটি পরিবারের শোক তা নয়, সারা গ্রামের সন্তাপ। শ্রাদ্ধ-শান্তির উদ্যোগ আয়োজনে পাঁচটা দিন গেছে, ইতিমধ্যে অন্য কথা কারো মনে একেবারেই ঠাঁই পায়নি।

হারাঠা পর্বত-কন্দর থেকে আগত সর্প দানবের চামড়াটা তেমনি পড়ে রয়েছে, তা নিয়ে রাজমহলে পুঁটিয়া সাহেবের কাছে যাওয়ার উৎসাহ যেন নির্বাপিত। এই কাল-সাপই যত গণ্ডগোলের সূত্র, উপরন্তু চিরকেলে শত্রু মুণ্ডাদের সঙ্গেও একটা নতুন বৈরিতা হয়ে রইল।

প্রতিদিনের প্রতীক্ষা। আতোর প্রতিটি হড়্ জানে মোগল সাজাওয়ালের দস্তখত করা গ্রেফতারী পরওয়ানা হাতে নিয়ে বোরিও থানার দারোগা চিলিমিলি সাহেবের তৈরি পাহাড়ী ফৌজ সমভিব্যাহারে ভাগনাডিহিতে উদিত হবে। হয়তো গিদরি পাহাড়ের সর্দার গুণীশ মালের আসামী সনাক্ত করতে আসবে; সারা আতোর হড়্ কোমরে দড়ির মালা আর হাতে লোহার বালা পরে ভাগলপুর সদর-কাজির আদালতে চালান হয়ে যাবে, তারপর কার বা ফাঁসি, আর কার

কপালে আজবীন মেথরের চাকরি, তা কেবল ঠাকুর মারাংবুরু ও বিধাতা সির্সি-জাওই জানে।

অবশ্য চিলিমিলি সাহেবের পাহাড়ী ফৌজ আজকাল আর নির্ভেজাল পাহাড়ী নয়। সে দলে দীকু সিপাহীও ভর্তি হয়েছে। ফৌজের মূল ছাউনি ভাগলপুর শহরের পাশে নাথনগর কর্ণগড়।

পাহাড়ী ফৌজের মধ্যে আসল পাহাড়ীদের মুখ্য কাজ শান্তিরক্ষার নামে ডাকাতি, আর দুর্বলের ওপর জুলুমবাজি। তাদের প্রধান লক্ষ্য শান্তিপ্রিয় হড়্ সম্প্রদায়। পাহাড়ীদের জন্যে আলাদা আইন, আলাদা আদালত, যেখানে তারা নিজেরাই নিজেদের বিচারক। ছেলে চুরির দায়ে অভিযুক্ত, বাপ বিচারক; তাই চুরি যাওয়া হাতির দাম পাঁচ কড়ি হলেও সে বিচার দোষযুক্ত বলার উপায় নেই।

আতো ভাগনাডিহিতে সফৌজ দারোগা আসার সম্ভাবনা এবং সে বিষয়ে সবার মনে ত্রাস আছে বইকি, তবু সিধু কানহু ভরসা দিয়ে বলে, 'আসুক চিলি-মিলি সাহেবের বাচ্চারা, আবার না হয় একটা লড়াই হবে।'

'ফৌজের হাতে বন্দুক আছে যে?' আতো মাঝি ভৈরব আশংকা প্রকাশ করে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে বিপুল পরিমাণ চুটির ধোঁয়া উগলে কানহু যেন অত বড় আকাশটাকেই অন্ধকার করে তুলেছে। তারপর সেইরকম ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে পরম অবজ্ঞাভরে উত্তর দেয়, 'ফৌজের হাতের গাদা-বন্দুক হাতেই থেকে যাবে, আমরা গাছের ওপর থেকে র‍্যাচাতে করে বারুদ ভিজিয়ে দেব। তাছাড়া বন্দুক তো মুণ্ডা ফৌজের নেই, বন্দুক পেয়েছে দীকু আর মোগল ফৌজ, কিন্তু তারা হড়্দের বেশি ভয় করে, তাই চট্ করে বন্দুক চালাবে না। দীকুদের শয়তানী অন্য রকম, হাতে মারতে জানে না, মহাজন আর জমিদার সেজে আমাদের পেটে মারতে আসে।'

যাহোক এসব গবেষণা এবং ভাবনাচিন্তা যথাস্থানে থেকে গেল, গ্রেফতারী পরওয়ানা সমেত বোরিও থানার দারোগার সসৈন্য আবির্ভাব নয়, প্রায় পঁচিশ দিন পরে সরেজমিনে ঘটনার তদন্ত করতে এলেন দামিনঈকোহ্‌র পর্য-বেক্ষক মিস্টার পনটেট স্বয়ং। হড়্দরদী রাজমহলবাসী পুঁটিয়া সাহেব।

প্রায় বিশ মাইল রাস্তা ঘোড়ার পিঠে এসেছেন মিস্টার পনটেট। সঙ্গে

সিপাহী শান্ত্রী বলতে মাত্র পাঁচজন দেহরক্ষী। পথ বিপদসংকুল, প্রায় সর্বত্রই বন্য জন্তুর থানাদারী আর পাহাড়ী তস্কর, সেইজন্যেই এটুকু আয়োজন।

যে দুই পথে মুণ্ডা হামলাদারদের আতোয় আবির্ভাব হয়েছিল, গ্রামের দক্ষিণ আর পূর্বদিকে, সে স্থান দুটি পুঁটিয়া সাহেব সর্বাগ্রে পরিদর্শন করে এলেন। যে তিন জায়গায় তিনটি হড়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তা-ও দেখলেন তিনি, তারপর ফিরে এসে মাঝিস্থানের বেদীর এক কোণে পা ঝুলিয়ে বসে নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে ফরমাশ করলেন, 'মিত্ লোটা দাঃ আগুইম্যা—জল আন তো এক ঘটি?'

হড়ের ভাষা প্রায় মাতৃভাষার মতোই বলেন পুঁটিয়া সাহেব। পাহাড়ী ভাষাও জানেন তিনি। পুঁটিয়া সাহেবের বিশ্বাস কারো অন্তর-জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি সর্বপ্রথমে তার ভাষাটি রপ্ত করা। পরবর্তী অধ্যায়ে তার সঙ্গে বসে পংক্তিভোজন।

আজ পুঁটিয়া সাহেব আতো ভাগনাডিহিতে আতিথ্য নেবেন। হড়ের আহার্য গ্রহণ করবেন তিনি, অথচ যা মুখে দিলে পরম বিতৃষ্ণায় তাঁর অন্তরাত্মা পর্যন্ত ঘুলিয়ে ওঠে। এরা সাধারণত তাঁকে পরিবেশন করে ভাতের মাড়ের সঙ্গে সেদ্ধ করা মুর্গীর মাংস, মসলাপাতিহীন রান্না, কেবল নুন আর লংকার সগৌরব আতিশয্য! গলা টিপে হত্যা করার পর পালকসমেত পাখিটাকে আগুনে ঝলসে নিয়ে তারপর কেটেকুটে ভাতের ফেনের সঙ্গে আধসিদ্ধ করা। তৎসহ বজরা অথবা মকাইয়ের দু-আঙুল পরিমাণ পুরু আর নিখাদ আগুনে ঝলসানো রুটি। দাঁতের সঙ্গে সংঘর্ষে মাংস আর রুটিরই বিজয়। তবু রক্ষা, এই সব অখাদ্য পদার্থ কোনোমতে কড়া মহুয়া মদের জোরে গলার নিচে ঠেলে দেওয়া যায়।

পরিষ্কার ঝকঝকে ঘটিতে সুপেয় জলই নয়, সঙ্গে ভিজে ছোলা ও আখের গুড়। পুঁটিয়া সাহেবের নিজের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিমাণ ভোজ্যবস্তু আছে, কিন্তু সে ঝুলির মুখ পরে উন্মোচন করবেন। সব খাবার হড় বাচ্চাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তিনি। মাত্র এক অথবা দু-দিনের অনাহার অর্ধাহারের ফলে মানুষ মরে না। আর মাঝে মধ্যে অখাদ্য ভোজন পুরনো খাদ্যের প্রতি রুচি ফিরিয়ে আনে।

ছোলা গুড় সহযোগে জল পান করার পর পুঁটিয়া সাহেব তাঁর চুরুটের বাক্স খুললেন, তারপর একটি তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে চেপে রেখে আরও পাঁচ সাতটি সুমুখবর্তী এক হড়ের হাতে দিয়ে বললেন, 'সঙ্গে বেশি আনিনি, একটা চুরুট তিনজনের। যা আছে তা দিয়ে আমায় দুটো দিন চালাতে হবে তো? অবিশ্যি ফুরিয়ে গেলে তখন তোদের চুটি আছে। হ্যাঁ, হারাঠা পাহাড়ের সাপটা কোথায়

রেখেছিস দেখি?'

চামড়াটা শুকিয়ে যাওয়ার পর ভৈরব মাঝি নিজের ওড়ায় নিয়ে গিয়ে রেখেছিল, পুঁটিয়া সাহেবের ফরমাশ শোনামাত্র সেটি আনার জন্যে তিন-চারজন লোক ছুটিয়ে দিল সে, তারপর বলল, 'আমার ওড়ায় আছে, এখুনি নিয়ে আসবে।'

চামড়া দেখে মিস্টার পনটেট কিছুক্ষণ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে রইলেন। দামিনে বহুকাল রয়েছেন তিনি, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলও ইতিপূর্বে ঘুরে এসেছেন, কিন্তু এত বড় অজগরের দর্শন-সম্ভাবনা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। এ চামড়া কলকাতায় পাঠিয়ে আরও ভালভাবে আরক শোধিত করে ইংল্যাণ্ডে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে উপহার পাঠাবেন তিনি। ভারত সম্বন্ধে মহারানীর আগ্রহ অপরিসীম। একটি আকর্ষণীয় ও দর্শনযোগ্য বস্তু হিসেবে চামড়াটা হয় বাকিংহাম প্যালেস, অথবা বৃটিশ মিউজিয়ামে অনন্তকাল ধরে রাখা থাকবে।

'সাপটাকে কে মেরেছে?' ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট চেপে রেখে সবার মুখের ওপর দিয়ে এক ধরনের কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মিস্টার পনটেট প্রশ্ন করেন।

জিজ্ঞাসার উত্তরে আতো মাঝি উঠে দাঁড়িয়ে পাঁচ ছ-জনের নাম বলে।

একটু হেসে অবিশ্বাসের ঘাড় নাড়েন দামিনের পুঁটিয়া সাহেব, তারপর বলেন, 'কি করে জানব কে মেরেছে?' একটি ছোট্ট বালক ও ছোট্ট মেয়ের দিকে তাকান তিনি, 'ঐ বাচ্চা কোড়াকুড়িও তো মেরে থাকতে পারে? কিন্তু আমি এ কথা বললে তোরা হয়তো আমার সঙ্গে রেটেপেটে বাধাবি! হয়তো রাগের বশে আমায় তুপুঞ করবি? আমি ঝগড়াকাজিয়ার মধ্যে নেই, আমার তীর খেয়েও মরার ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে এ মেনে নেওয়া ভাল আতোর যত হড়্ মায়জিউ আর কোড়াকুড়ি মিলে সাপটাকে শেষ করেছে। এর জন্যে আমি প্রত্যেককে একটা করে চাঁদির বড় পয়সা দেব, বীরত্বের ইনাম, আর মাঝিস্থানে দশটা চাঁদির বড় পয়সা পুজো চড়াব। আজই পুজো হবে, ভোজ হবে, নাচ গান হবে।'

কথার শেষে পুঁটিয়া সাহেব কোটের ভেতর-পকেট থেকে ভেলভেটের বটুয়া টেনে বার করলেন। দশটা রুপোর টাকা ভৈরব মাঝির হাতে গুনে দিয়ে বললেন, 'সঙ্গে বেশি আনিনি, ইনামের বড় শাদা পয়সা আমি রাজমহলে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

কথা ও কাজের সমাপ্তিতে পুঁটিয়া সাহেব আর একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি

বোলালেন। প্রতিটি হড়্ কোড়াকুড়ি আর মায়জিউ সবাইকেই দেখলেন তিনি। শ্যামবর্ণ মুখগুলি সরল আনন্দের আতিশয্যে চক্‌চক্‌ করছে। যেন অনেকগুলি শ্যামবর্তিকা মিলিত হয়ে এক নতুন ধরনের আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত।

সিধুর মনে তবু খানিকটা অভিযোগ, সে প্রশ্ন করে, 'বল্‌ সাহেব, হারাঠা পাহাড়ের বিং আমাদের আতোয় এসেছে, আমরা শিকার করেছি, আর পাজী মুণ্ডারা কি করে এটা দাবি করে ? সাপ দিইনি বলে আমাদের আতোয় হামলা করতে এসেছিল, আমরা তাদের তুপুঞ্চ করে তাড়িয়েছি—তীর চালিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছি তাদের। কিন্তু হামলা ঠেকাতে গিয়ে আমাদের তিনজন হড়্ তো মরেছে ? এ সবের দোষ আমাদের, না তাদের ? এবার তোরা মুণ্ডাদের বেঁধে কাজির কাছে চালান কর। তাদের ফাঁসি দে, ফাটকে বন্ধ করে মেথরের কাজ করা ?'

সিধুর সুদীর্ঘ অভিযোগের ছোট্ট উত্তর দিলেন পুটিয়া সাহেব, 'সব দোষ শুধু ঐ মুণ্ডাদের, তাই তো তাদের দলের এগারোটা মরেছে।'

'আর তাদের সর্দার গুণীশ মালের ?' সাগ্রহে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে নিনকী মেঝেন।

নেতি ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়েন পুঁটিয়া সাহেব, গম্ভীর ও ব্যঙ্গমিশ্রিত উত্তর দেন তিনি, 'না, তাদের সর্দার মরে না। যুদ্ধের সময় সবচেয়ে পেছনে থাকে সে, আর তার বউরা তাকে ঘিরে থাকে।'

আর কিছু বললেন না মিস্টার পনটেট, সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলেন তিনি। এই আলোচনার পরের অংশ হড়্ সমাজে ঘোষণা করার মতো নয়। এ হল কোম্পানীর বিচিত্র শাসনবিধির কাহিনী।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে দামিন-পর্যবেক্ষক মিস্টার পনটেট সর্বপ্রথম গিদরি পাহাড়ের দিকে ছুটেছিলেন। রাজমহল থেকে কতই বা দূর গিদরি পাহাড়, তবু দ্বিতীয় দিন বেলা দশটার আগে পৌঁছতে পারলেন না তিনি, কারণ খবর পেয়েছিলেন আগের দিন সন্ধ্যের দিকে।

গিদরি পাহাড়ে পৌঁছনোর পরে সর্বপ্রথম মিস্টার পনটেট সর্দারের কুঠিতে পদার্পণ করলেন, সর্দার গুণীশ মালের তখন নিজের কেশ পরিচর্যার ব্যাপারে ব্যস্ত। তার দুই পত্নী সুদীর্ঘ কেশের বোঝা দু-ভাগ করে নিয়ে অতি উত্তমভাবে মহুয়ার পনীর মাখানোর পর বেণী বাঁধছে। আর একজন পত্নী অথবা উপপত্নী

সরষের তেলের বাটি, মহুয়ার পনীর পাত্র, রঙীন ফিতে ইত্যাদি আনুষঙ্গিক হাতে অপেক্ষারত।

চোখের সুমুখে অকস্মাৎ বাঘ দেখার মতো মিস্টার পনটেটকে দেখে সর্দার গুনীশ মালের শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল, 'সেলাম সাহেব!' তারপর সে পত্নীদের দিকে তাকিয়ে হুকুম করল, 'খাটিয়া নিয়ে এসে সাহেবকে বসা, জল দিয়ে পা ধুইয়ে দে।'

আপ্যায়নের আতিশয্য কাটাবার জন্যে মিস্টার পনটেট সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা পরশু রাত্তিরে ভাগনাডিহি আক্রমণ করেছিলে?'

সর্দার গুনীশ মালের তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মিস্টার পনটেটের পায়ে হাত দেয়, বলে, 'না সাহেব, হড়্‌রা আমাদের ওপর হামলা করতে আসছিল, খবর পেয়ে আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের বাধা দিয়েছি। আমার এই গিদরি পাহাড়ের সাপ তারা চুরি করেছিল, তার ওপর হামলা করতে এসে এগারোজন মালেরকে মেরে ফেলেছে।'

'তোমাদের যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল?' প্রশ্ন করার পর মিস্টার পনটেট কুঞ্চিত ললাটে সর্দার গুনীশ মালেরের দিকে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন তার মুখভঙ্গিতে মিথ্যোক্তির কোনো রেখা পড়ে কিনা। যদিও তিনি জানেন সরল সত্যের মতোই নির্লজ্জ মিথ্যা কথনে পাহাড়ীরা সবিশেষ পটু।

অর্ধরচিত বেণী সমেত মাথা নেড়ে সর্দার গুনীশ মালের অতিশয় তৎপর উত্তর দেয়, 'যুদ্ধ হয়েছিল ভাগনাডিহি আতোর দক্ষিণ আর পূর্ব দিকে। আতোর বাইরে। হড়্‌রা যখন সেজেগুজে আতো থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে আসছিল সেই সময় আমরা পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে তাদের ঠেকিয়েছি, তখনই লড়াই হয়েছে। আমাদের তরফে এগারোজন মরেছে, কাল তাদের কবর দিতে পারা যায়নি, আজ কবর হবে।'

অতি সূক্ষ্ম এবং প্রায় অদৃশ্য হাসি হেসে মিস্টার পনটেট প্রশ্ন করেন, 'তোমার এই গিদরি পাহাড় থেকে আতো ভাগনাডিহি কত দূর?'

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার উত্তর দেয়, 'আমরা তো সেখানকার হাটে যাই, ভোর রাতে বেরুলে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে যায়।'

'তার মানে অন্তত পাঁচ ক্রোশ?'

সর্দার গুনীশ মালের ঘাড় নাড়ে, 'না।'

'তবে?' মিস্টার পনটেট আবার প্রশ্ন করেন।

'খুব বেশি হলে এক ক্রোশ।' গুণীশ মালের দৃঢ় স্বরে দূরত্বের বিজ্ঞপ্তি দেয়।

শেষ প্রশ্ন করেন মিস্টার পনটেট, 'তুমি যা যা বললে সব সত্যি তো?'

একসঙ্গে অনেক দেবতার নামে শপথ করে মালের সর্দার, বলে, 'সাহেব আমি চেতে মালের, চেতে মালের মিছে কথা বলে না। আমি বের গোঁসাই বিল্ল গোঁসাই লাইনু গোঁসাই দারমুয়া গোঁসাই জার মাত্রে গোঁসাই আর জামপরীর নামে দিব্যি করে বলছি, যা বলেছি সব সত্যি। মিছে হলে ঐ সূর্য চাঁদ আর সব গোঁসাইরা মিলে সব পাহাড়ীকে খেয়ে ফেলবে। আমাদের নতুন রেল গোঁসাই মহামারীর বিষ ছড়িয়ে আমার পাহাড়ের সব মালেরদের শেষ করবে।'

সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে উঠে মিস্টার পনটেট এগারোটা মৃতদেহ দেখে এলেন। শবগুলি পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। সে স্থান ছেড়ে কবরখানা দেখতে গেলেন তিনি।

গ্রামের বাইরে সমাধিভূমি। ইতিমধ্যে এগোরাটা সুগভীর খাদ কাটা হয়েছে। দৈর্ঘ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। সমাধিগর্ভে অবস্থানের সময় শবের শিরদেশ থাকবে পশ্চিম দিকে, তার মুখটি বের গোঁসাই সূর্যের উদয়পথের দিকে ফেরানো।

যতটা দেখার এবং যা শোনার তা শেষ হয়েছে, বিকেলের আলো মুছে যাবার আগেই মিস্টার পনটেট রাজমহলে ফিরে এলেন। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত সন্দর্ভ রচনা করে ভাগলপুরের বিভাগীয় কমিশনার মিস্টার বিডওয়েলকে পাঠালেন তিনি। সেইসঙ্গে বিনীত আবেদন, ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষ শক্তিবলে ফৌজ পাঠিয়ে গিদরি পাহাড়ের সমস্ত পুরুষ অধিবাসীকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্যে ভাগলপুরে নিয়ে যাওয়া হোক। আর এ ক্ষেত্রে ফাঁসিই তাদের একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি।

পত্রবাহক স্বরূপ পাঁচজন সৈন্যের একটি দলকে দ্রুতগামী ছিপ নৌকোয় রাজমহল থেকে মিস্টার পনটেট ভাগলপুরে পাঠালেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে সামূহিক আয়োজন সহ রিপোর্টের উত্তর আশা করেছিলেন মিস্টার পনটেট, কিন্তু জবাব এল বিশটি দিন পরে। মিস্টার পনটেটের অতি-ব্যস্ততার উপযুক্ত জবাব। আর খাম খুলে চিঠি পড়ে দেখার উৎসাহ অথবা প্রয়োজন নেই, তবু এই সঙ্গে হয়তো বিভাগীয় সর্বেসর্বার কোনো আবশ্যিক নির্দেশ

থাকতে পারে, এই চিন্তা করে মিস্টার পনটেট খামটি খুলে দেখলেন।

কমিশনার ও মিস্টার বিডওয়েল লিখেছেন, 'নিজেদের অপরাধের বিচার পাহাড়ীরা নিজেদের আইনেই করবে, তারা সাধারণ আদালতের আওতায় নয়।' তারপর মৃদু ধমকানি, 'নিজের কর্তব্যের বহির্ভূত কাজে সময় অপব্যয় করা অনুচিত।'

তারপর খুব নরম স্বরে এবং অধিকতর বিনয়ের সঙ্গে মিস্টার পনটেট মিস্টার বিডওয়েলকে পত্র লিখেছেন, 'আমি দামিনঈকোহ্‌র অধম পর্যবেক্ষক, এখানকার দপ্তরে যত কাগজপত্র সব তন্নতন্ন করে সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার কি কর্তব্য অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু তেমন কিছু সন্তোষজনক পাওয়া গেল না। উপরন্তু কখনো কোনো সরকারি নির্দেশনামা আমার নামে আসেনি। অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে আমায় বিস্তারিত জানাবেন, যাতে ভবিষ্যতে এই অনুগ্রহভাজন বশংবদ ভৃত্য সরকারি কাজে অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাব্য লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পায়।'

এ চিঠির উত্তর আসেনি। মিস্টার পনটেট জানেন তা আসবেও না কোনোদিন। তা সত্ত্বেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন, কারণ ঊর্ধ্বতনকে কশাঘাত করার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা জানা নেই তাঁর। তবু তিনি অনুভব করেন তাঁর নিজের মুখটাই যেন অপমানের বিষে কালো হয়ে রয়েছে। এরই নাম দাসত্বের গ্লানি!

পনেরো

দীঘলের ঘোর পরিবর্তন। মাত্র সাত মাসে বয়েস তার কতই বা বেড়েছে, কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকটা নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার পর সে যেন ইদানীং অনেকটা প্রবীণ। যৌবনের উচ্ছল চপলতা একান্ত আকস্মিকভাবেই নিভে গেছে তার।

দীঘলের প্রকৃতির এ পরিবর্তন বাহাই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে, ক্রমে আর সবাই। বাহার দৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভূতিও মেশানো।

ওড়ার এ কুঠলির সামনের ওসারায় দীঘল, আর বাঁ দিক ঘুরে ওদিকের ওসারায় বাহা। ভোগন টুডুর দুই রাণ্ডি রিণিঃ নিজেদের নিয়েই মগ্ন। তবু ছোট বউ সেরালী মেঝেনের কোলে কচি ছেলে ডাট্টো, সেই ছেলে বুকে নিয়েই তার

সমস্ত অবসর কেটে যায়। কিন্তু তেমন কোনো অবসর যাপনের অবলম্বন বড় বউ রতনী মেঝেনের নেই।

ছেলে বড় হয়ে গেলে তার সম্বন্ধে মায়ের চিন্তা-নাড়ির যোগসূত্র প্রায় ছিঁড়েই যায়। দীঘলকে বাদ দিয়ে এ ওড়ার অপর দুটি পুরুষ চিরদিনের মতোই যোগাযোগের বাইরে। একজন জীবনের ওপারে। আর এক ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনের আশা-ভরসার বাইরে। মোটের ওপর, আক্ষরিকভাবে না হলেও, দীঘল আর বাহাকে বাদ দিয়ে ওড়া সম্পূর্ণ খালি।

তবু নির্বিঘ্ন দিবা-অবসর অথবা রাতের নিস্তব্ধতায় বাহাকে দীঘলের মনে পড়েনি। ভোগন আর গড়মের তিরোধানের অনুষঙ্গে এ সম্পর্কটাও যেন ছিঁড়ে গেছে। অথচ শোকতাপ যাই থাকুক, জোয়ান বয়েসের নিয়ম অনুসারে সম্পর্কে গভীরতাই আসা উচিত ছিল, এমনকি এত নিভৃত ও পর্যাপ্ত অবসরে তাতে চিরাচরিত দাম্পত্য জীবনের মতো একঘেয়েমিও অসম্ভব নয়।

শেষাবধি প্রতীক্ষায় অধৈর্য বাহাই একদিন রাত্তিরে এগিয়ে গেল। তখন ওড়ার বাইরে পালা করে তোয়ো আর হাড়গারের ডাক শোনা যাচ্ছে। শেয়াল ও নেকড়ের রব। মুর্গী চুরির আশায় ওড়ার রাচায় বনবেরাল হুটোপাটি করে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে দুন্দু ডাকছে আকাশে। এত গভীর রাতে পেঁচার ডাক মানেই শিকার সন্ধান। অর্থাৎ স্তব্ধ চরাচরে যে যার দেহ ও মনের খাদ্য অন্বেষণে মগ্ন।

গভীর ঘুমে দীঘল আচ্ছন্ন। আবছা আঁধারে তাকে দেখে বাহার যেন নিয়তির হাতে অসহায় শিকারের মতো মনে হল। নিয়তির কাছে সময় অসময় বা দিনরাত্রির ভেদাভেদ নেই। এই কি দীঘলের এত বড় বড় আঘাত পাবার বয়েস ?

বাহার মনের ভেতরটা গভীর ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। ওড়ার সংলগ্ন যে ভিট জমি তা নিয়ে দীঘল আজকাল উদয়াস্ত পড়ে থাকে। কি কঠোর পরিশ্রম তার। কারণ সে জমির সন্ধান বোরিওবাজারের মহাজন জানে না, তাই তা ভোগন আর তার দুই ছেলের পরম আদরের সম্পদ স্বরূপ ছিল। এরই পেছনে তাদের অধিক পরিশ্রম। এখন দীঘল একা, আর ভবিষ্যতে এটাই একমাত্র পারিবারিক ভরসা।

ধান আর বড় বড় চাষের জমি তো এবার থেকে পতিত পড়ে থাকবে। একা দীঘলের পক্ষে অতখানি ক্ষেত সামলানো অসম্ভব। তাই সেদিক থেকে অবহেলায়

চোখ ফিরিয়ে ওড়ার পেছনের ভিট জমি নিয়ে সে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য মারাং গ' রতনী মেঝেন আর বাহা তাকে সাহায্য করতে যায়।

কিন্তু তাদের সাহায্যের পরিমাণ কি কোনোদিন ভোগন আর গড়মেব সমকক্ষ হতে পারে? এমন তো তারা আগেও করেছে। বাহা জানে একমাত্র বাড়ির ঢেঁকিতে ধান আর চিঁড়ে কোটা, কাছের পোখরী বা দূর ডাভী থেকে জল আনা, অথবা ওড়ার ওসারায় পোঁতা যাঁতায় গম মকাই আব ডাল ভাঙা ছাড়া মায়জিউরা সত্যিকার পরিশ্রমের কাজ বিশেষ করতে পারে না। বাদ-বাকি যা, তা কাজের নামে খেলা, আর খেলতে খেলতেই হড়ের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে উৎসাহ দেওয়া।

বাহার কুণ্ঠিত হাতের মৃদু ধাক্কায় দীঘলের ঘুম ভাঙল। মুখের ওপর মুখ ঝুঁকিয়ে দিয়ে নিশিরাতের বিচিত্র অন্ধকারময় আলোয় কি যেন খুঁজছে সে। পাঢ়ালের আবরণহীন তার উর্ধ্বাঙ্গ সবটাই দীঘলের নগ্ন বুকের ওপর আশ্রিত। বাহা অনুভব করে, অল্প ক'দিনে দীঘলের বুকের মধ্যে যেন এক ধরনের পাষাণ-কাঠিন্য জন্ম নিয়েছে, আর সেই অহেতুক ও অবাঞ্ছিত দৃঢ়তা তার বুকের মাংসল ভূভাগ অবধি ছড়িয়েছে।

দীঘলকে চোখ খুলতে দেখে বাহা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, 'তালা, তোর কি রুয়ঃ হয়েছে? শরীর খুব খাবাপ নাকি?' প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সে দীঘলের অল্প চুলভরা মাথা ও মুখের ওপর নিজের একটি সযত্ন হাত বোলাতে থাকে।

'বাইং; না তো, জ্বর কোথায়?' বাহাকে বুকের ওপর নিয়েই দীঘল আড়মোড়া ভাঙার চেষ্টা করে।

কপট দুশ্চিন্তা দেখিয়ে বাহা বলে, 'আমি ভাবলুম তোর শরীর আজকাল ভাল যাচ্ছে না, তাই আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিস না তুই!'

দীঘল এ মন্তব্যের উত্তর দেয় না কোনো।

জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বাহা আবার কথা বলে, অনেক অভিমানের কথা। অনেক আজেবাজে উক্তি। অবশেষে এইভাবে চেতনার দিক থেকে প্রায়-মুমূর্ষু দীঘলকে সে জীবন-বাসনায় উন্মুখ করে তোলে, এবং অনুভব করে সময় বিশেষে কথার স্পর্শ দেহের ছোঁয়ার চেয়ে অজস্রগুণ কার্যকরী।

কিন্তু এ সেই দীঘল নয়, এত বড় আতোর যে কোনো একটা হড়্, কিংবা এই বিরাট ধারতির অজানা অচেনা পুরুষের মতো। এমন একজন সাধারণ হড়ের কাছে বাহা আসতে চায়নি, অন্তত উপযাচিকা হয়ে নয়।

নারী-স্বভাবের নিয়ম ভেঙে এগিয়ে এসে একটা অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হবে তা জানলে বাহা ওদিকের ওসারায় দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকত, নয়তো ওড়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো মেয়ে-শিকারী হড়ের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিত। হড়্ মানে তো মেয়েদের অসহায়তার সুযোগ-অন্বেষণকারী হাড়গার। হিংস্র নেকড়ে।

বাহা কিন্তু আর আতো ভাগনাডিহিতে থাকে না। এ আতোর অনেক হড়্, অনেক কুড়ি এখন অম্বরে চলে এসেছে। নতুন নাম পাকুড়। কলকাতা থেকে বেরিয়ে প্রায় অম্বর পর্যন্ত কোম্পানীর রেল-লাইন এগিয়ে এসেছে। যেন পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি এক জোড়া লোহার সাপ গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। দৈর্ঘ্য তার প্রতিদিনই বাড়ছে।

এরপর রেল-লাইন যাবে কোটালপুকুর বারহারোয়া বাকুড়ি তিন পাহাড়। তিন পাহাড় ছাড়িয়ে সাহেবগঞ্জ, তারপর ভাগলপুর। তার ওদিকে কোন্ দেশ তা কোনো হড়্ জানে না।

শুধু আতো ভাগনাডিহিই নয়, আশপাশের যত আতো সব যেন চেঁছেমুছে অম্বরে উঠে এসেছে। এখানে কাজ কত! একটা মাস খাটলে যে মজুরি তা একসঙ্গে গাঁথলে চাঁদির দুটো বড় বড় শাদা পয়সা হয়ে যায়। এতে কারো এক আধলা ভাগ নেই।

এ কেবল হানাপুরী থেকে নোয়াপুরী, অর্থাৎ স্বর্গমর্ত্য বিস্তৃত অজগরের মতো রেলপথই নয়, আরও বহুবিধ দিন-মজুরির কাজ পড়ে রয়েছে অম্বরে। চালানীর সুযোগ পেয়ে নিত্য নতুন লাক্ষার কারখানা খুলছে। পাহাড়ী জঙ্গলে রেশম চাষের দিকেও অনেকের নজর পড়েছে। নীল সাহেবরাও তাদের ব্যবসা-পত্রের ব্যাপারে নতুন উৎসাহে উঠে-পড়ে লেগেছে। এর মধ্যে বড় সুখ, আর বলতে গেলে সবচেয়ে বড, মহাজন নামের ক্ষয়কীটের করাল ছায়া নেই কোথাও। বরং দিন দিন মহাজনরা মিইয়ে আসছে যেন।

কিন্তু এত অগাধ যে সুখ, তার সবটাই খেদহীন নয়। সমস্ত আয়োজনই নগদ পয়সা দিয়ে করতে হয়। তাই মাসের শেষে কিছুই বাঁচে না। হাত একেবারে শূন্য। তবে দিন-মজুরিতে আর মাসের হিসেব কি? প্রতিটি দিনই তো সুখ আর দৈনন্দিন নিরাপত্তা।

প্রতি পদক্ষেপে অজস্র প্রলোভন ছড়ানো। কাচের চুড়ি, পেতলের অলংকার,

আর বিলিতি কলের রংবেরঙের বাঙ্কেনকিচরি, দীকুরা যাকে বলে শাড়ি। এ শাড়ি অঙ্গে জড়িয়ে সহজভাবে কামিনের কাজ করা যায় না। শাড়ি শুধু অবসর-সময়ের বাহারী দেহসজ্জা।

আর এখানে নতুন এক মুক্ত সমাজ। সন্ধ্যের পর দৈনিক উৎসব। সে সময় কেউ কারো শাসন অনুশাসনের বশ নয়। সবাই নিজের নিজের। যারা আতো ছেড়ে সপরিবারে এই অম্বরে এসে জুটেছে তারাও। দিশি শরাবের নেশার মুখে কে বা কার হড়্, কে কার রিণিঃ! সেই মুহূর্তের ভাল লাগাটাই সবচেয়ে বড় কথা। যার যাকে পছন্দ, আর যতক্ষণ পর্যন্ত ভাল লাগে। কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সামাজিক অপরাধের শাস্তি বিধানে বিটলাহা নেই। প্রকৃত হড়্ সমাজই তো নেই এখানে।

এসবের বাইরেও এক আকর্ষণ, এবং তার নতুন বৈচিত্র্য। হড়্ সমাজের বাইরের মানুষ হড়্ মেয়েদের কত ভালবাসে! সাহেব ঠিকেদারের দিশি বাঙালী-বাবু, আধা বিলিতি আর আধা দিশি ট্যাঁস সাহেব, এমনকি খোদ বিলিতি সাহেব পর্যন্ত হড়্ কুড়ির ভালবাসা কেনবার জন্যে পাগল।

দুপুরে খাওয়ার ছুটি পেয়ে আরও তিন চারজন হড়্ কামিন মেয়ের সঙ্গে বাহা একটা পাকুড় গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, পরনে পাঢান ও পঞ্চির মতো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোশাক। বিশ্রাম আর কি, খাওয়াই বা কি, দু-মুঠো ছাতু নুন এবং কাঁচা লংকা মিশিয়ে প্রায় শুকনো জলযোগ, সেই সঙ্গে নানা ঘটনা আর দুর্ঘটনার কথা টেনে এনে অফুরন্ত রঙীন তামাশা।

যে বাবুটি আজ কাজের সময় বার বার বাহাদের সুমুখে এসে ঘোরাঘুরি করছিল, যেচে কথা বলছিল দু-একটা, সে এখন কাছে এসে দাঁড়াল।

আহার বিরাম ও তামাশায় ছেদ দিয়ে বাহা মুচকি মধুর হেসে মুখ তোলে, 'কি রে ববু, কিছু বলবি নাকি?'

সকালবেলা নানা কথার ফাঁকে যে কথাটি বাবু একবার বলেছিল মূল প্রসঙ্গ তোলার আগে সেটিই এখন বলে আবার, 'অত দূর থেকে এক মন মাটিভর্তি ধামা মাথায় করে বয়ে আনতে তোদের কি কষ্ট হয় না মেঝেন?'

বাবুর দরদভরা কথা শুনে বাহা এবং তার সঙ্গের মেয়েগুলি খিল্‌খিল্ হাসি হাসতে হাসতে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ে; আর সবার পক্ষ থেকে বাহা একাই জবাব দেয়, 'আমাদের কাজটা কি তুই করে দিবি রে ববু? তবে এই নে ধামা,

মাটি আর পাথর তুলে এনে লাইনের ধারে জমা করগে।'

এবার রেল সাহেবের বাবু বলে, 'আজ সাঁঝবেলায় তোরা একবার সাহেবের কুঠিতে আসবি, কলকাতা থেকে সাহেবের বন্ধুরা এসেছে, তোদের নাচ দেখবে, গান শুনবে।'

'আর কি করবে, শুধু নাচ দেখে আর গান শুনে সাহেবদের পেট ভরে যাবে?' বাহা নিরীহ মুখভঙ্গি নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তারপর সর্বাঙ্গে হাসির উচ্ছ্বসিত প্রবাহ এনে পাশের হাস্যমুখরা সঙ্গিনীদের গায়ে গা মিশিয়ে দুলতে থাকে।

তুখড় বাবুর মুখাকৃতিও সপ্রশ্ন, 'নাচ দেখবে, গান শুনবে, বিলিতি শরাব খাওয়াবে, তাছাড়া তোদের নিয়ে আবার কি করবে, আর কিছু করার আছে নাকি?'

'আমাদের শরাব পিলিয়ে বেহুশ করে দিয়ে তারপর—হি হি হি! নারে ববু, তুই ভাগ, আমরা আর সাহেবের কুঠিতে কখনো যাব না। সর্দার জানতে পারলে আমাদের অম্বর থেকে তাড়িয়ে দেবে, তারপর আর নিজেদের আতোয় গিয়ে ঢুকতে পারব না।' নির্ভয় গলায় এবং নির্লজ্জ হাসির সঙ্গে বাহা সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা ব্যক্ত করে।

'সাহেবের কুঠিতে গান শোনাতে যাবি সেজন্যে তোদের সর্দার আপত্তি করবে, কোন্ সর্দার তার নাম বল্, তারপর দেখি তার ঘাড়ে কটা মাথা? আর আগেও তো তোরা কতবার সাহেবের কুঠিতে গেছিস, হাতের মুঠো ভরে টাকা নিয়ে এসেছিস, সর্দার কি তাড়িয়ে দিয়েছে? তাড়াবার সাহস বা ক্ষমতা আছে তার?' সবিশেষ উত্তেজনার সঙ্গে বাবু এক নাগাড়ে কথা বলে যায়।

বাহা নীরবে মাথা নাড়ে, মৃদু মৃদু সলাজ হাসি হাসে, কিন্তু একটি কথারও জবাব দেয় না সে।

কামিজের জেব থেকে বিড়ি বার করে বাবু ওদের প্রত্যেকের দিকে একটি একটি বাড়িয়ে দেয়, তারপর আবার প্রশ্ন, 'কি নাম তোদের সর্দারের, তোরা কোন্ ঠিকেদারের কামিন?'

সর্দারের নাম বাহা বলে না, এ কেবল কথার কথা। আশঙ্কার বিলাসিতা। সর্দার মাত্রেই সাহেবের খুব পেয়ারের। এ তো ভুলিয়ে ভালিয়ে ফুসলে নিয়ে গিয়ে ভালবাসা কেনা, কোনো সাহেব বা বাবু যদি সর্দারের চোখের সামনে জোর করে হড় মেয়ের ওপর জুলুম করে ভালমানুষ ভেড়া সর্দার হয়তো সে সময় অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। রেল লাইনের কাজে আসার পর কোনো হড় আর

বন্য স্বভাবের হড়্ নেই। বড় বড় সর্দারগুলো তো সাহেব ও ছোট ছোট দিশি ঠিকেদারদের দালাল, আর ছোট মাপের কুলি জাতের হড়্ সত্যিকার চুনোপুঁটি, কে তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে ?.

সাহেব কুঠির অভিজ্ঞতায় বাহা সবিশেষ ধনী। ওখানে সে একাও কখনো সখনো গেছে, সাহেবের নিঃসঙ্গতা অপনোদন করতে। তাকে সুখ দিতে। তার কাছে ভালবাসা বিক্রি করতে।

সাহেব বাহাকে ভাল ভাল মদ খাইয়েছে, বিলিতি খাবারে পেট বোঝাই করে দিয়েছে, তারপর ভোরবেলা কুঠি থেকে বিদায় দেবার সময় হাতে অনেকগুলো চাঁদির চকচকে টাকা গুঁজে দিয়েছে। চার পাঁচ ছয় !

এ সবের বিনিময়ে সাহেব বাহার কাছ থেকে কি কি নিয়েছে তা খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না। নেশার উদ্দেশ্য তো তাই, সব ভুলে যাওয়া। দুঃখ ভুলে যাওয়া, শোকতাপ ও অপমান ভুলে যাওয়া. তারপর যতটুকু মনে থাকে তা কেবল স্বপ্নময় স্মৃতির ক্ষীণ রেশ। এক অদ্ভুত সুখ ও বেদনাময় মানসিকতা।

আতো ভাগনাডিহিতে থাকতে এত বিভিন্ন ধরনের মনের সাক্ষাৎ বাহা কখনো নিজের অন্তঃকরণে পায়নি। পরিবেশ বদলের সঙ্গে তার মনেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। মনের দিক থেকে সে বাহা আর নেই বোধ হয়।

সাহেবের কুঠিতে্ চার পাঁচজন সঙ্গিনীর সঙ্গে দল বেঁধেও বাহা গেছে, তখনকার সব ব্যাপারস্যাপার খানিকটা আলাদা, যদিও শেষটা সব সময় একই রকম। সাহেবের অতিথি বন্ধুরা গান শুনতে চেয়েছে, নাচ দেখার বাসনা প্রকাশ করেছে, কিন্তু হড়ের মুখের বাঁশী আর হাতের বাজনা বাদ গেলে কি কোনো কুড়ি গাইতে পারে, না নাচতে পারে ?

হড়ের প্রায় সব সঙ্গীতই তো এক ধরনের বেদনার্ত সুরে বাঁধা। বাজনার শব্দের অন্তরালে সে বেদনাময় সাঙ্গীতিক আবেদন খানিকটা ঢাকা থাকে। বাজনা বাদ দিয়ে গান, সে তো সুরেলা অশ্রু বিসর্জন !

না, সাহেবের কুঠিতে বাজনাহীন নাচ বা গান কোনোটাই জমেনি। সাহেব বা তার অতিথি বন্ধুরা মোটেই খুশি হয়নি। তারা মন্তব্য করেছে, সংস্কৃতির দিক থেকে হড়্ হাজার হাজার বছর পিছিয়ে আছে। এসব তাদের নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ। তাদের বিলিতি ভাষা তবু বাহার বুঝতে অসুবিধে নেই। শিকার সম্বন্ধে হিংস্র পশুর মন্তব্য আর ভাষাও তো মানুষ বুঝতে পারে। এ

ধরনের এমন অনেক ব্যাপার আছে যা যে কোনো ভাষাতেই বলা হোক না কেন তার অর্থ বোধের অগম্য থাকে না।

ঘোড়ার তরল র‍্যাচাতে রঙের শরাব ভরা গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সাহেব নিজের অতিথিদের উদ্দেশে খেদ ও অভয়ের বাণী শোনায়, 'এদের নাচ গানের ভেতর কিছু নেই, এরা কি আর আমাদের মেয়েদের মতন গাইতে পারে না নাচতে পারে ? যে জন্যে এইসব মেয়েগুলোকে আনা হয়েছে সেটাই আসল। সে বিষয়ে তোমাদের কেউ ঠকবে না।' তারপর সাহেব বাহাদের দিকে তাকায়, 'নেচে আর গেয়ে তোরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস, এবার একটু জিরিয়ে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর।'

খাবার আমন্ত্রণ জানালেও পরিবেশনের এমন ব্যবস্থা এ সময় বেশি খেতে দেয় না সাহেব। তারা নিজেরাও খায় না। নানান আকারের কাচের বোতল খুলে বিবিধ বর্ণের শরাব আর খানিক ভাজাভুজি ও শুকনো করে রাঁধা মাংস সাহেব জানে না, দিনান্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে হড়্ মেয়েদের পেটে এতখানি খিদের আগুন জ্বলে যে যাহোক দ্রব্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিপাক হয়ে যায় হাঁপ টেনে টেনে প্রচুর অবসর নিয়ে হজম করার দরকার হয় না।

সাহেবের ঘরের লাল কার্পেটমোড়া মেঝেয় বসে কাচের গেলাসে শরাব খেতে খেতে বাহার অঙ্গের সব আবরণ যেন মন্ত্রবলেই খসে পড়ে। একা বাহার নয় সব মেয়েরই। পরনের পঞ্চি পাঢ়ান একদিকে আর তারা অন্যদিকে। নেশা বেশি চাপলে বুঝি অঙ্গের পরিচ্ছদও বোঝা মনে হয়। বিলিতি শরাবের এই এক দোষ, নিজেকে আর নিজের মধ্যে থাকতে দেয় না।

পাঁচ সাতটি নেশাগ্রস্ত ও উলঙ্গ মেয়েকে সাহেবরা তখন নিজেদের খুশিমতো তোড়ার আকারে লাল কার্পেটের ওপর সাজায়। তারপর এই মাংস কুসুমগুলির বিভিন্ন অংশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গভীর তত্ত্বের কথাবার্তা বলে তারা। হড়্ মেয়েদের সুগঠিত তন্বী তনুর প্রশংসা। নাচগানের প্রশংসা করতে পারেনি সেজন্যে হড় মেয়েদের মনে যে খেদ তা তাদের শরীরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ঢেকে দেয়।

অস্বস্তিকর ঘুরঘুরে পোকার মতো বাহার গা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সাহেব বন্ধুদের দৃষ্টি টেনে এনে বলে, 'এর সুদৃঢ় বুক, সুপুষ্ট উরুর ভাঁজ আমাদের বিলিতি মেয়ের চেয়ে হাজারগুণ ভাল আর সুখদায়ক।'

সাহেবের অতিথি বন্ধুরা বাহার মতো অন্যান্য অতিথি হড়্ মেয়েদের শরীর ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে কথায় এক বাক্যে সায় দেয়। তাদের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো

বলে, 'এইসব জংলী মেয়েগুলোর দেহে সমুদ্রের গভীরতা, তাই বোধহয় আমাদের মতন সমুদ্রপারের মানুষকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।'

বিলিতি শরাবের গুণে প্রভাবিত অর্ধচেতনার মধ্যে এ সমস্ত কথা শুনতে শুনতে বাহার মনে হয়েছে, সাহেবরা যেন ঠিক মানুষ নয়, পোশাক পরা সেতার দল। বস্ত্রপরিহিত সজ্জন সারমেয়।

অথচ তখনো উত্তপ্ত কামনাময় শয্যায় শ্মশানঘাটের মড়ার মতো পড়ে থাকতে বাহা একটুও লজ্জা পায়নি। পরেও না। যখন বড় বড় মোমবাতিজ্বলা ঘরের মধ্যে সাহেবগুলো পরস্পরের দৃষ্টির সুমুখে এক একটি মেয়ের সঙ্গে জোঁকের মতো লেপ্টে গেছে তখন বাহার আগাগোড়া সবকিছু স্বপ্নের মতোই মনে হয়েছে।

মানুষই স্বপ্ন দেখে, মেয়ে পুরুষ সবাই, আর স্বপ্নে সভ্য অসভ্য কি না দেখে তারা, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙার পর ঘুম থেকে জেগে উঠে সঙ্গত অসঙ্গত ভেবে কেউ কি লজ্জিত হয়? পরের দিন ভোরের আলো ফোটার আগে সাহেবরা যখন অতিথি বিনোদিনী দলকে ফেরত পাঠায় তখন তাদের দু-হাত উপচে দিয়েই ছুটি দেয়।

আতো ভাগনাডিহিতে থাকতে বাহা বিশের বেশি গুনতে পারত না। কোনো হড়্ বা কুড়িই জানে না বিশের ওপারে অংকটা কি, ঐ সমুদ্রের ওপারে যে দেশ, অথবা শহর ভাগলপুর একদিকে আর অপর দিকে রামপুরহাট ছাড়িয়ে কি শহর, তার সন্ধানও যেমন রাখে না তারা।

অম্বরে আসার পর প্রায়ই অগাধ টাকা গুনতে গুনতে বাহা এখন মুখে মুখে অনেক বড় হিসেব কষতে শিখেছে! হিসেবের অংকও সে স্মরণ রাখতে পারে। বর্তমানে তার হাতে প্রায় আড়াইশ' চাঁদির টাকা নগদ পুঁজি। হাতে পাঁচ সাতটা জমলেই অম্বরের পশ্চিমাঞ্চলে জঙ্গলভরা পাথুরে মাটি খুঁড়ে গোপনে পুঁতে আসে।

তার ঐ অগাধ ধনসম্পদের কথা বাহা কাউকেই বলেনি। নেশায় ভরাডুবি অবস্থায় শরীরের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসাবধান ও উন্মুক্ত হয়ে যায় সে, নিজের যৌবন সম্পদ রক্ষা করার সম্বন্ধে তিলমাত্র হুঁশ থাকে না, কিন্তু আর্থিক সম্পদের বিষয়ে সর্ব অবস্থাতেই তার মুখে গোপনতার শিলমোহর দেওয়া।

সাহেবরা টাকার বিনিময়ে হড়্ কুড়ির ভালবাসা কেনে, দীকু চুনোপুঁটি বাবুরাও দাম দিয়ে প্রেমের সওদা করে। তবে বাবুদেরব্যাপার স্যাপার একটু আলাদা। হ্যাংলা বেড়ালের মতো এসে লুকিয়ে ছাপিয়ে আড়ালে আবডালে ডেকে নিয়ে যায়, মদটদ খাওয়া কি ফুর্তির কথাবার্তা নেই, শুধু প্রেমের জোয়ার

ফুরিয়ে যাওয়ার শেষে হাতে সিকি আধুলি গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যাবার চিন্তা!

তবু বাহা মাঝে মাঝে বাবুদের সভয় সাদর ডাকে সাড়া দিতে যায়, সে কেবল আর এক ধরনের মজা দেখতে। এত রংবেরঙের মজা আতো ভাগনাডিহিতে নেই। পয়সা দিয়েই মেয়েদের ভালবাসা কেনা যায়, তা কি সেখানে জানে কেউ, না এমন বিচিত্র কথা চিন্তা করতে পারে?

আতো ভাগনাডিহি থেকে অম্বরে চলে আসার পর আর এক বিচিত্র তামাশার সন্ধান। এ একেবারে সম্পূর্ণ নির্দোষ আমোদপ্রমোদ। নীলকুঠির ফুর্তিবাজ ম্যাক্লে সাহেব মাঝে মাঝে হড়্দের নিয়ে উৎসবের আয়োজন করেন। ঢোল পিটিয়ে চতুর্দিকের হড়্কে আমন্ত্রণ জানান তিনি। কুঠির বিরাট মাঠে নাচগান আর হড়্ মেয়েদের দৌড় প্রতিযোগিতা।

সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা স্বতন্ত্র হড়্ মেয়েগুলি বিভিন্ন ভাবে দৌড়োয়। একা, জোড়া জোড়ায় পা বেঁধে, দৌড়ের মাঝে ছোট ছোট বেড়া লাফ দিয়ে অতিক্রম করে, আর কখনো বা কাচা রং করা সংকীর্ণ-গহ্বর কাঠের পিপের ভেতর দিয়ে শরীর গলিয়ে। দৌড়ের সময় হড়্ পুরুষরা পূর্ণ বেগে বিভিন্ন ধরনের বাজনা বাজায়। বিচিত্র উদ্দীপনা ও উত্তেজনার স্বর। তারাও মাঝে মাঝে আলাদাভাবে দৌড় প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে যায়।

প্রতিযোগিতা আর বাজনার নেশায় ভরপুর যৌবনবতী মেয়েরা নিজেদের দৈহিক আবরণের খেয়াল রাখে না, মনে হয় যেন প্রকৃতিদত্ত পোশাকে সজ্জিতা তন্বীবৃন্দ। কামদেব লিটার উপহার দেওয়া পউরি পানের আগে হড়্ সমাজের আদি পুরুষ ও রমণী পিলচু কোড়া আর পিলচু কুড়ির লাজশূন্য নিষ্পাপ অভিব্যক্তি।

এ প্রতিযোগিতার উৎসাহী এবং বিশিষ্ট দর্শক সমাজ ম্যাক্লে সাহেব, তাঁর স্ত্রী ও বিদুষী কন্যা, অন্যান্য নীলকুঠি রেশমকুঠির সপরিবার সাহেবগণ, রেল কোম্পানীর সাহেব অফিসারবর্গ, সাহেব ঠিকেদার, দীকু বাবুরা আর অম্বরের বহু অধিবাসী।

অম্বরের আশপাশের হড়্ অধ্যুষিত আতো থেকেও অনেক দর্শক আসে। তারা বিদেশীদের দ্বারা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় না, কেবল থেকে থেকে জ্বলন্ত চোখে ঐসব লাজলজ্জাহীন সাহেব-মেমদের মুখের দিকে তাকায় আর চাপা ও রোষপূর্ণ ভাষায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'এই সাহেবগুলো

আর মেয়েদের আমরাও একদিন ন্যাংটো করে মাঠের মাঝে দৌড় করাব, এদের বুক চিরে চিরে রক্ত খাবো!'

হড়ের বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ম্যাক্সে-সাহেবের কানে যায় না. তিনি তখন রেশমকুঠির প্রৌঢ় স্বত্বাধিকারী আলফ্রেড সাহেবকে ডান হাতের বন্ধনে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে ধরে মৃদুস্বরে বলছেন, 'ওঃ, কি অপূর্ব. প্রকৃতির এই জীবগুলো।'

আলফ্রেড সাহেবের দুটি চোখ সেই সময় জিহ্বার কর্ম সাধনে ব্যস্ত। দৃষ্টির সাহায্যে যৌবনবতী কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন দেহবল্লরী লেহন করতে করতে তিনি অধিকতর নিচু স্বরে উত্তর দেন, 'এত দূর থেকে প্রকৃতি দর্শনে তৃপ্তি নেই, ঐসব প্রকৃতির খুব কাছে আমাদের যেতে হবে. যথাশীঘ্র তার ব্যবস্থা করুন। আপনার সেই সোয়াইন টাউটটা কোথায়?'

ইতিমধ্যে ম্যাক্সে সাহেবের বিদুষী কন্যা এলিজাবেথ কাছে এসে বলে, 'ড্যাডি, এই বর্বরগুলোকে নিয়ে আমায় নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করতেই হবে। তাতে যদি সফল হই ভারতীয় বিজ্ঞান আর ইতিহাসে অনেক দামী তথ্যের সন্ধান আমি দিয়ে যেতে পারব।'

চোখের দৃষ্টি ও গলার আওয়াজে অনাবিল ভাব নিয়ে শিল্পপতি ম্যাক্সে সাহেব কন্যার দিকে তাকান, তারপর সস্নেহ গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দেন. 'তোমার শিক্ষার জন্যেই তো এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। দেখছ তো, সভ্যতা আর সংস্কৃতির দিক থেকে এরা আমাদের চেয়ে দশ লক্ষ বছর পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের দেশের বৃটন নামের সেই বর্বর জাতটাও সাঁওতারদের চেয়ে সবদিক থেকে ঢের বেশি উন্নত ছিল, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর এরা যেন নৃবিদ্যার গবেষণায় একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে। তুমি দেখবে যে—'

প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিঘেঁষা তামাশা দর্শনে মগ্ন শ্রীমতী ম্যাক্সে, ম্যাক্সে সাহেবের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলে ওঠেন, 'আঃ, তোমরা একটু থামো তো দয়া করে? বাপ আর মেয়ে এক জায়গায় হল তো এমনি লেখাপড়ার কথা। গাছ থেকে একটা আপেল খসে পড়ল, কি আকাশে ডানা মেলে দিয়ে একটা স্মোয়ালো উড়ল তো আর রক্ষা নেই, গুরুগম্ভীর গবেষণার মুখে বিশ্বভুবন অন্ধকার! আমিও তেমন মুখ্যু নই, ইংল্যাণ্ডের সেণ্ট পলস্ স্কুলে লেখাপড়া শিখেছি, কিন্তু এই তোমাদের মতন এমন পাগলামী তো কখনো করি না?'

মনে এক ধরনের ভাব প্রবাহ আর মুখে এক. ম্যাক্সে সাহেব গম্ভীর স্বরে

বলেন, 'তুমি যতই আমায় ব্যঙ্গ কর, আমি মরার পরও কবরের মধ্যে বই নিয়ে যাব।'

মাঠের মধ্যে কোনো একটা অনুষ্ঠানের পর সর্বাঙ্গে বিচিত্র রংমাখা প্রায় উলঙ্গ ও যৌবনবতী মেয়েগুলিকে দেখে ম্যাক্সে কন্যা এলিজাবেথ সোল্লাসে বলে ওঠে, 'ড্যাডি ড্যাডি, ভারতের ঐতিহাসিকরা ভুল বলেছে, দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বলে কোনোকালে কিছু ছিল না, এরা যদি দ্রাবিড় উপজাতি হয় তাহলে বর্বর ভিন্ন আর কি এদের সংজ্ঞার্থ হতে পারে?'

'আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত, এলিজাবেথ।' ম্যাক্সে সাহেব মেয়ের কথায় সুচিন্তিত সমর্থন দেন।

শ্রীমতী ম্যাক্সে শুধু বলেন, 'ওঃ, আবার—!'

অনুষ্ঠানের শেষে ম্যাক্সে পত্নী পুরস্কার বিতরণ করেন। বিলিতি কলের রঙীন শাড়ি, কাচের চুড়ি, পেতলের গয়না আর এনামেলের বাসনপত্র! এবং পরাজিত ও বিজেতা বিজয়িনী প্রত্যেককেই মিঠাই খাবার জন্যে নগদ একআনা।

এরপর ম্যাক্সে সাহেবের নির্দেশে প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিনীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, সাহেব আর মেমসাহেবদের সেলাম করে; তদুত্তরে ম্যাক্সে সাহেব বলেন, 'তোরা সকলে হাত তুলে বল্, God save the queen!'

অর্থ জানার প্রয়োজন নেই, এ তো কেবল সমবেত কণ্ঠের সানন্দ নিনাদ, উপস্থিত যত সাহেবমেমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হড়্ কোড়াকুড়ি হর্ষধ্বনি দেয়, 'God save the queen!'

ষোলো

সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ব্যাপারে অগ্রণী বিলিতি সমাজের লোকগুলির চিন্তা আর পর্যবেক্ষণে এভাব স্থির-চিহ্নিত হয়ে থাকে, হড়্ বর্বর শ্রেণীভুক্ত মানব সম্প্রদায়; তাই তাদের মঙ্গলকল্পে ও উন্নতি সাধনের জন্যে পাকুড় রেল কলোনির খুব কাছেই খৃষ্টীয় গির্জা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অম্বরের সোম আর শুক্রবারী হাটে বুকের ওপর কালো সুতোয় ক্রুশ ঝোলানো জোব্বা পরিহিত বিলিতি যাজক ঘুরে বেড়ায়, আইস আইস হে পাপী, তোমার জন্য ঈশ্বরপুত্র অম্বরে আবির্ভূত হইয়াছেন। যীশু তোমায় আপনার

উদার ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন। যীশু তোমার দুঃখে প্রবল অশ্রুপাত করিতেছেন, তুমি এখুনি আইস।'

সাহেব পাদ্রীর দেশী দালাল গোপনে হড়্ পুরুষ ও রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কানে অজস্র প্রলোভনের ভাণ্ডার খুলে দেয়। অনেক কথা কানের ভেতর হতে মরমে গিয়ে ঢোকে ; 'যীশুর ধর্ম নিলে তোরা রাতারাতি সাহেবের জেত বনে যাবি, সাহেবের খানা খাবি, কুরসিতে বসে দীকু আর মোগলদের ওপর হুকুম চালাবি, রাত্তিরবেলা আণ্টাঘরে গিয়ে হুরীর মতন শাদা ন্যাংটা মেমসাহেবের হাত ধরে নাচবি।' মেয়েদের বলে, 'তারপর তোকে আর আধা ন্যাংটা হয়ে মাথায় এক মণী বোঝা বইতে হবে না, সাহেবের হাত ধরে বেলাত চলে যাবি।'

টোপ অনেকেই গিলেছে, গলায় যীশু ঝুলিয়ে তারা কুলি কামিন খাটতে আসে, সাহেবের জাত, তাই মজুরি কিঞ্চিৎ বেশি। অধিকন্তু রবিবারের পুণ্য দিনে গির্জা থেকে চাল গম, রোগের জন্যে শিশিভরা বিলিতি ওষুধ, বিনামূল্যে।

কেউ কেউ ফালতু সময়ে বইকিতোব নিয়ে গির্জা সংলগ্ন সাহেব মাস্টারের পাঠশালে পড়তে যাচ্ছে, বেলাত যেতে হলে পেটে বিদ্যে থাকা চাই, নয়তো জাহাজ থেকে ছুঁড়ে সমুদ্দুরে ফেলে দেবে। বেলাতে নাকি গাধা নেই, আর সবাই গড় গড় করে ইংরিজি বলতে পারে, যে বইকিতোব পড়তে পারে না, শেলেটে আঁচড় টানতে জানে না সে-ও!

যীশুভজা হড়্ কুড়িরা পঞ্চি পাড়ান ছেড়ে দীকু মেয়েদের মতো বান্ধেনকিচরি পরেই কামিন খাটছে। গির্জে থেকে উপহার পাওয়া বেলাতি সাবান মেখে রবিবার বিকেলে গির্জেয় যাচ্ছে। তবে আগের মতো আর হাত ধরাধরি করে গান গেয়ে পথ চলা নয়। পাদ্রীবাবার নিষেধ ; এভাবে জংলী মেয়েরাই পথ চলে, মেমসাহেবরা নয়। মেমসাহেবদের গোমডা মুখে রাস্তায় হাঁটতে হয়। পথ চলতে চলতে হাসতে নেই, গাইতে নেই ; 'যীশু পরম দয়ালু, কিন্তু বেহায়াপনা দেখলে তিনি ভীষণ ক্রোধ করেন!'

বাহা মেঝেন গির্জে ঘরে যায়নি, দালালের অজস্র প্রলোভনে সাড়া দেয়নি সে, তবে হাটে গেলেই পাদ্রীবাবার করুণ ডাক কানে আসে তার, 'আইস আইস, তোমার জন্য দয়ালু ঈশ্বরপুত্র অম্বরে আবির্ভূত হইয়াছেন, হে দোষী, হে পাপী, তুমি আইস।'

এখনো মনস্থির করেনি বাহা। পাপ তাপের চিন্তা তার নেই অবশ্য, সাহেব

বর পাওয়ার লোভও বিশেষ নয়। সাহেব বর তো তার মাঝেমধ্যে জুটে যায়. ঐসব অসভ্য শ্বেতচর্ম সারমেয়ের দল! মেয়েদের কি ভাবে ভালবাসা দিতে হয় তা তারা কেমন করে জানবে? তাই হড়ের জেত ছেড়ে যীশুর কোলে গিয়ে উঠলে বিশেষ কি সুখ সেটাই বাহা বার বার চিন্তা করে দেখে। পাদ্রীবাবার উদার ডাকে চট্ করে সাড়া দেয় না সে।

এমনিতেই হড়্ আজ চার ভাগ। আতো ভাগনাডিহিতে দীঘল টুডুর মতো নিখাদ খাঁটি হড়্, আর ভাগলপুরের ফাটকে মেথর হড়্ গড়ম একা নয়। আবার গড়ম হড়ের সঙ্গে অম্বরের কামিন হড়্ বাহার অনেক তফাত। এদের থেকে আর এক পৃথক সম্প্রদায় যীশুভজা হড়্।

এই চতুর্থ হড়্ দলের খাতায় নাম লিখিয়ে কিবা তেমন লাভ? আর অপরিসীম সুখে ডুবে থেকেও তো বাহার গহিন মনের বেদনার রেশ কেটে যায়নি? বরং ভাগনাডিহিতে থাকতে মাঝে মাঝে কপালে যে দুঃখ কষ্ট জুটত যথা সময়ে তার শেষ ছিল; তখন নিজের মনের মেঘ আর রোদ দুটোই দেখেছে সে।

কিন্তু এখানে শুধুই মেঘ। এ যেন তারাভরা রাতে চাঁদের অভাবে আকাশের ঘোর হাহাকার। চারিদিকে এত প্রাচুর্যের মাঝেও দীঘলকে দেখার বাসনায় বাহার প্রাণের ব্যথাময় পরিবেদন। যীশুভজাদের খাতায় নাম লেখালে আতো ভাগনাডিহির রাস্তা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। গোকুলপুর আর আতো আলোয়াডাঙার বুনো হড়্দের দেখেই বোঝা যায় যীশুর আদরের কোড়াকুড়ি সম্বন্ধে তাদের কি উদার মনোভাব! আতো ভাগনাডিহি আরও বন্য, আর দীঘল সাধারণত শান্ত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু ভেতর ভেতর পুরোপুরি বুনো বাঘ একটা।

নিস্তব্ধ নিভৃত রাতে অসংখ্য তারাভরা চাঁদহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্তহীন সুখভোগে অবগাহিত বাহার বুকের ভেতর একটা বিচিত্র বাসনা চকিত হয়ে ওঠে, দীঘল যদি তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বিষাক্ত তীর গেঁথে মেরেও ফেলে তবু সে অম্বর ছেড়ে আতো ভাগনাডিহিতে ফিরে যেতে চায়। সেখানকার মাটিতে মরার সুখ এখানকার মাটিতে বেঁচে থাকার সুখের চেয়ে ঢের বেশি। এতদিনে বাহা বেঁচে থাকার শেষ 'অর্থটাও তো বেশ ভালভাবে বুঝে নিয়েছে। সত্যি, এ ধারতিতে মরে যাওয়ার চেয়ে বেশি সুখ আর কিছুতেই নেই!

বাহা ভালই জানে আতো ভাগনাডিহিতে ফিরলে এই মরণই তার নিয়তি।

সেখানে সে একা যাবে না, তার পরিধেয় শাড়িগুলি যাবে, যাবে ধামা ভর্তি কাচের চুড়ি আয়না চিরুনি চুল বাঁধার রঙীন ফিতে তিনশ' নগদ টাকা, আর সেই সঙ্গে সমুচিত অপবাদের বোঝা।

বাহা হয়তো তার তিনশ' টাকা পুঁজির পুঁটুলি খুলে দীঘলের সুমুখে ছড়িয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বলবে, 'অতে তালা, এগুলো গুনে দেখ তো কত চাঁদির শাদা পয়সা আছে?'

আজীবন চেষ্টা করে মরলেও এত বড অংকের পাহাড় দীঘল কোনোমতেই গুনতে পারবে না। যে কোনো বুনো হড়ের মতোই হিসেবের দশ বিশ পদ পার হতেই হোঁচট খেয়ে পড়বে সে। হড় মানেই তো মুখ্যুর ডিম! হিসেবের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনড়।

অংকের বিষয়ে দীঘল হেরে যাওয়ার পর তার লজ্জাভরা অসহায় অথচ গোঁয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বাহা উদার গলায় বলবে, 'এই টাকা নিয়ে তুই বোরিওবাজারের ভগতের কাছে যা, তার তিন পুরুষের পাওনা ধার শোধ করে তোর দাদাকে ভাগলপুরের ফাটক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। নিজের জাওঞাই মেথর হয়ে গেছে এ আর শুনতে ভাল লাগে না!'

না, কোনোটাই আর হবার নয়। বাহা সুমুখে হাজির হওয়া মাত্র দীঘল তার দিকে কি চোখে তাকাবে, সে দৃষ্টি বাহা গত সোহরায় পরবের সময় গোকুলপুর আর তালোয়াডাঙার যত হড় আর কুড়ি সবার চোখেই দেখে এসেছে। সারা আকাশ জুড়ে অগ্নিবৃষ্টি হলেও এত আগুন কখনো ঝরে না। এতখানি উত্তাপও হয় না কখনো।

সদ্য ফসল কাটা মাঠের দিকে তাকিয়ে হড়ের প্রাণে অপার পুলক। উদয়াস্ত পরিশ্রমের হাত থেকে সাময়িক অব্যাহতি। ফসলের সিংহভাগ মহাজনের কুঠিতে পৌঁছে দিয়েও তবু কিছু দিনের নিশ্চিন্ত অন্ন সংস্থান।

মহাজন ভগতের সেপাই ফসল ওজন করে গোলায় তোলে। ফসল অর্থাৎ পৌষালী ধান। তৌল গণনা করে ভগতের কণ্ঠিধারী গোমস্তা। মহাজন স্বয়ং তীক্ষ্ণ চোখে হড়ের স্বার্থ পাহারা দেয়।

গোমস্তা সুর করে গীত গায়, 'রামে রাম, রামে রাম, রামে রাম।'

ঘোর সন্দেহের ভারে চুটির সরল ও তৃপ্তিদায়ক ধোঁয়া হড়ের গলায় আটকে যায়, সে ধৈর্য হারিয়ে অপ্রসন্ন স্বরে বলে ওঠে, 'এ কি বটে রে ভগত, তোর

গুমুস্তো কতবার রামে রাম করবে, এবার রামে তুই করতে বল ?'

এ অভিযোগ শুনে নির্লজ্জ মহাজন আত্মস্থ হয় যেন, 'ওঃ, দেখছিস তো রাম নামের কি অপূর্ব মহিমা, সব ভুলিয়ে দেয়, বুক জুড়িয়ে যায়। রাম নামের এমনি গুণ, ত্বরিতে নেভে প্রাণের আগুন ! হ্যাঁ রঘুরাজ, এবার রামে তুই কর, রামে তুই।' তারপর হড়ের সন্দিগ্ধ চোখের ওপর দৃষ্টি পড়তে বাঁ হাতের দুটি আঙুল নিজের গলার কণ্ঠির ফাঁকে চালান করে দিয়ে আকস্মিক বেগের সঙ্গে উচ্চারণ করে, 'ও রঘুরাজ, এইবার রামে তি-ই-ন !'

হড়্ আর ভগত, খাতক এবং মহাজনের মধ্যে বঞ্চিত ও প্রবঞ্চকের সম্পর্ক চিরদিনই রয়ে গেছে, তবু এই চিরবঞ্চিত জীবনেও দু-দিনের সুখের সন্ধান কোনো হড়্ই বিসর্জন দিতে নারাজ। তাই ফসল তুলে মহাজনের কুঠিতে প্রায় নির্বিবাদে তুলে দিয়ে আসার পর হাতে উদ্বৃত্তটুকু নিয়ে তারা সোহরায় উৎসবে মেতে ওঠে।

সোহরায় পর্বের নির্দিষ্ট দিন অথবা তিথি নেই কোনো, তবু শুক্ল পক্ষই প্রশস্ত। বিভিন্ন আতোয় একদিন উৎসব তিথি নির্দেশিত হয়। দিনের বেলা গৃহস্থের কর্মসূচী ঘর-গেরস্থালী পুনর্বিন্যাস সাধন। বিবিধ রঙের মাটি খুঁজে এনে হড়্ রমণী গোময় নিকনো কুঠলির মেঝে ও সারা ঘরের দেওয়াল আর গৃহ প্রাঙ্গণে গরমজলে গোলা মৃত্তিকার আস্তরণ দেয়। হড়্ পুরুষ শুদ্ধাচারে গবাদি পুজো সম্পন্ন করে। গোরুর শিঙে পবিত্র তেল সিঁদুরের প্রলেপ দেওয়া হয়। কিন্তু সর্বাগ্রে গৃহদেবতা মারাং বুরু আর ওকর বোঙার ধ্যাননিষ্ঠ উপাসনা। গৃহস্বামী কর্তৃক গুপ্ত বোঙার প্রসাদ ভিক্ষা। এ সময় সর্বভুক হড়ের পক্ষেও গো-নিধন ও গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

সন্ধ্যালগ্নে আনন্দোৎসব। কাছাকাছি আতোর যত হড়্ বাজনাবাদ্যি ও রমণীকুল সমভিব্যাহারে উৎসব আয়োজিত আতোয় সমবেত হয়। তারপর সারারাত্রিব্যাপী সঙ্গীত এবং নৃত্যাদি অলংকৃত অবধি যৌবনোৎসব। অন্য সময় যে আসঙ্গ অপরাধ পর্যায়ভুক্ত অনুষ্ঠান, সোহরায় পর্বে তার পরোক্ষ সমর্থন।

রিপু প্রশ্রয়ী বাজনা আর অশ্লীল সঙ্গীতের সুর লহরীতে পরিপ্লাবিত রঙ্গভূমি। হড়ের মাদলে বোল ফোটে, হোতি হতোড়া, মাদল হতোড়া, দ্যাপাড দ্যাপাড় দ্যাড়। অর্থ উপলব্ধি হলে লজ্জায় বহিরাগতের মাথা অবনমিত হয়। সঙ্গীতের বয়ানও এই বোলের অতি বিশ্বস্ত পরিপূরক। আদিম প্রবৃত্তির সোচ্চার আর সনির্বন্ধ আবাহন।

সোহরায় উৎসবের ডাকে অম্বরের হড়্ সম্প্রদায়ের কুলি কামিনের চিত্ত প্রমত্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু এখানে উৎসবের আয়োজন নেই। রেল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বন্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অবলুপ্ত।

তাই আতো গোকুলপুরে সোহরায় ঘোষিত হওয়ার পর সেই খবর পেয়ে আরও কয়েকজন হড়্ ও রমণীর দলে মিশে বাহা একবার সেখানে গিয়েছিল। অম্বর থেকে কত আর দূর ঐ আতো গোকুলপুর, বড়জোর দেড় ক্রোশ। তারা যতগুলি হড়্ মেয়ে মিলে উৎসবের সাজে সেজে পরস্পরের হাত ধরে গান গেয়ে এই পথটুকু অতিক্রম করেছিল।

সব মেয়ের পরিষ্কার করে টেনে চুল বাঁধা, মাথায় পুষ্পশোভিত তেল-চিক্কণ কবরী, পরনে উৎসব উপলক্ষ্যে নতুন কেনা সবুজ রঙের পঞ্চি আর উর্ধ্বাঙ্গে রক্তাম্বর পাঢ়ান। হড়্ পুরুষগুলির সঙ্গে বাঁশী মাদল ও ঢোল। মেয়েদের গানের কথা এবং সুরের সঙ্গতিতে তারা বাজনার রব মিলিয়ে দিয়েছে।

বাহার দল একটি সভ্যভব্য বিরহ সঙ্গীতই কণ্ঠে নিয়েছিল তখন। রাগ সোহরায়।

> কানড়া রাপুদোক দো খাড়কা তাহেনা,
> কাশকো উঠেজোক দো ডান্টি তাহেনা!
> গাগরী ভাঙলে ওগো
> থেকে যায় তল,
> কাশ যায় উড়ে
> রেখে ভুজ অবিকল!

হে প্রিয়তম, তোমার প্রণয়ভঙ্গ হলেও স্মৃতির হাত থেকে আমার অব্যাহতি নেই। তুমি আমায় ভোলার জন্যেই আতো ছেড়ে চলে গেছ, কিন্তু তুমিও তো বিগত স্মৃতিটুকু কোনোমতেই মুছে ফেলতে পারবে না? আমি আজও তোমার অপেক্ষায় রয়েছি, তুমি অভিমান ভুলে আবার আতোয় ফিরে এস।

সোহরায় উৎসবের মাঠের যে গান তা তো আর পথে ঘাটে বা ভিন্ন সমাজের মানুষের সুমুখে গাওয়া যায় না, যেখানে যেমন, সব আয়োজনই পরিবেশ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হয়।

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় দিগন্ত পরিপ্লাবিত, বাহার দল আতো গোকুলপুরের মাঠে গিয়ে পৌছুল। সোহরায় ময়দানের কাছেই রাজবাড়ি। দীকু রাজা, তবে গোকুলপুর হড়েরই আতো। হড়্ এখানে সংখ্যায় অনেক বেশি।

আশপাশের সমস্ত আতোর হড়্ আর কুড়ি রবাহূতের মতো গোকুলপুরের মাঠে উপস্থিত হয়েছে, এবং পরস্পরের সঙ্গে মনেপ্রাণে মিলেমিশে গেছে তারা। বাহার দল অম্বরের কুলি কামিন সম্প্রদায়, তারা একধারে দাঁড়িয়ে, কেউ এগিয়ে এসে তাদের স্বাগত জানাল না, বলল না, 'দ্য পেড়াহড়্ দুরুপ ম্যা—এস কুটুম, আমাদের মাঝে এসে বসে পড়।' এমনকি কোনো জোয়ান হড়্ মুখে কৌতুকের হাসি নিয়ে ঐ কথাগুলি ঈষৎ ঘুরিয়ে রঙ্গ করতে এল না, 'দ্যাপাড় দুরুপ ম্যা—এস আমরা পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করি।'

উৎসব প্রাঙ্গণের বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাহার সর্বাঙ্গ যেন অপমানের তীব্র বিষে জ্বলে যেতে লাগল। হড়্ সমাজে তারা আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত বহিরাগত। হড়ের অন্তরঙ্গ জাতীয় উৎসবে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। তারা দীকু আর সাহেবের প্রসাদভোগী বেজাত!

সতের

ভোগন টুডুর জ্যেষ্ঠা বিধবা, দীঘলের মারাংগ' রতনী মেঝেন, ইদানীং প্রায়ই সন্ধের দিকে এক পাত্র মহুয়ার মদ খাওয়ার পর দুখের গুনগুনুনি তোলে, 'আমার এমন সুন্দর ওড়া একেবারেই উজাড় হয়ে গেল!'

নিয়ত এই এক কথা শুনতে শুনতে দীঘল তিতিবিরক্ত। আজকাল সাধারণত ওড়ায় বসেই সান্ধ্য পানীয় গ্রহণ করে সে। মদ হড়ের নিত্যসেব্য, নয়তো আর যেন ভাল লাগে না, তবু নিয়ম করে খেতেই হয়। কর্মসূত্র ভিন্ন ওড়ার বাইরে যেতেও ইচ্ছে হয় না।

মদের বাটিটা নিরাসক্ত হাতে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লম্বা চুটিটা ঠোঁটে চেপে চকমকি ঠুকে আগুন ধরায় দীঘল, তারপর পরম বিতৃষ্ণায় মুখভর্তি ধোঁয়া বাতাসের গায়ে উগলে দিয়ে মারাংগ' রতনী মেঝেনের উদ্দেশে তিক্ত গলায় বলে, 'গ', তোর রোজ একই কান্না, শ্বেতাংবের থেকে নিয়ে এ্তবের অবদি এক কথা, আমার ওড়া উজাড় হয়ে গেল! পুরুষ মানুষ মরে, ফাটকে যায়, মেয়েরা নিজেদের সুখের খোঁজে ওড়া থেকে উধাও হয়, তা হলেও ওড়া একেবারে উজাড় হয়ে যায় না, খালি ওড়া আবার দু-দিনেই ভরে ওঠে।'

দীঘলের কথা ও মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে রতনী মেঝেন কণ্ঠস্বরের অশ্রু-বিজড়িত ভাব ঘুচিয়ে দিয়ে তীব্র প্রখরতা নিয়ে আসে, 'হ্যাঁ, তা সবই হয়

তবে তুই বাপলা করছিস না কেন তা আমায় বল ?' প্রথমাংশে দীঘলের মন্তব্য স্বীকার করে নেওয়ার পর সে অনুযোগ তোলে, 'বাপলা করলে তোর কোড়াকুড়ি হয়ে ওড়া আবার ভরে উঠত ?' .

হাতের চুটিতে তখনকার মতো শেষ টান দিয়ে দীঘল সেটি গ'-র দিকে এগিয়ে দেয়, তারপর বলে, 'কি হবে শুনি বাপলা করে, রিনিঃ তো দু-দিন পরেই অন্য সুখের টানে ওড়া থেকে পালিয়ে যাবে ?'

'একটা বউ পালালে তারপর আবার দশটা বউ আসবে।' বউ পালাতে পারে এ সম্ভাবনা মারাংগ' রতনী মেঝেন অস্বীকার করে না, কিন্তু সঙ্গে প্রতিকারও জানিয়ে দেয়।

এ কথা শুনে দীঘলের মনে অনেকখানি আকস্মিক তিক্ততা জমে ওঠে, প্রসঙ্গটাই অত্যন্ত মন্দ লাগে তার। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে পর্যাপ্ত তিক্ততার বিনিময়ে সে বিচিত্র মুখাকৃতি করে হেসে ফেলে, তারপর বলে, 'ঐ যে আমাদের আতোর সিধু কানহুরা, তারা কি বাপলা করেছে , চারটে ভাই-ই না।'

সিধু কানহুর নাম কানে যেতে রতনী মেঝেনের অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ ক্রোধে ফুঁসতে থাকে। অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে, ক্রোধের কম্পনে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের শিথিল পাঢ়ান খসে পড়ে, আগুনসুদ্ধ চুটিটা দীঘলের গা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়, তারপর প্রায় হুংকার ও সঘৃণায় বলে, 'ঐ পাজী সিধু কানহুদের নাম আমার কাছে উচ্চারণ করবি না তালাকোড়া, তাহলে তোকে খুন করে ফেলব। তারা বদমাশ বাউণ্ডুলে শয়তান। তাদের জন্যেই তোর আপাতটা মুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মরল। কে মেয়ে দেবে ঐ শয়তানদের হাতে ? তাছাড়া কি আছে তাদের, না ওড়া, না খেত খামার, আর না দুটো গরু শুয়োর কি মুর্গী। বাপলা করতে গেলে যে দশ বিশটা শাদা পয়সা খরচ, তার যোগাড় পর্যন্ত নেই।'

মা সবিশেষ উত্তেজিত, তাই বোধহয় অযথা বিতর্ক এড়াবার উদ্দেশ্যে দীঘলের বহিরাচরণ এখন সম্পূর্ণ বিক্ষোভহীন, সে শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, 'বাপলা করতে গেলে সব সময় কি আর খরচ করা দরকার ? শাদা পয়সা দিয়ে কিরিণ বউ না এনে পথেঘাটে কোনো কুড়িকে ধরে তার কপাল আর মাথার চুলে মাটি লেপে দিয়ে ইতুত বাপলা করলে তো আর খরচ নেই। তারপর নয় শ্বশুরবাড়ির আতোর হড়্‌দের হাতে দু-চার ঘা মার খাবে, কিন্তু তাতে বাপলা করা রিনিঃ তো আর ফিরে যেতে পারবে না, বাপলাও ভেঙে যাবে না। আর তাদের গায়ে হাত তোলার সাহস কার আছে ? মোটের ওপর তারা বাপলা করতে চায় না

সেটাই হচ্ছে আসল কথা। তারা তো আজকাল আতোতেও থাকে না, তামাম দামিনে শারজম পাতড়া ছড়িয়ে প্রচার করে বেড়ায়।'

আবছা আঁধার ভরা দাওয়ায় বসে রতনী মেঝেন কুঞ্চিত ভ্রূসহ চোখের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দীঘলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথা শুনছিল, সে চুপ করতে প্রশ্ন করে, 'ওঃ, সিধু কানহু বুঝি মস্ত বড় নাইকী হয়েছে, দশ দিকে ধরম-করমের কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছে?'

দীঘল নেতিবাচক ঘাড় নাড়ে, তারপর মা-র হাতের লক্ষ্যভ্রষ্ট চুটি কুড়িয়ে নিয়ে গোনা দুটি সুদীর্ঘ টান দেওয়ার পর গম্ভীর স্বরে বলে, 'না, ধরমকরমের কথা নয়। তারা সেইসব কথা বলে যাতে হড়ের ভাল হয়, হড় আবার তার নিজের দেশের রাপাজ হয়।'

হড়ের ভাল হবে, হড় সারা দামিনঈকোহ জুড়ে আধিপত্য করবে, হড় মহাজন দীকু আর মোগলদের নির্মূল করবে, পাহাড়ী ও দেশী সেপাইদের আর সেইসঙ্গে সাহেবদের তাড়াবে, চতুর্দিক থেকে অবিচার আর অত্যাচারের প্রাবল্যে জর্জরিত আজকের পরাধীন হড় রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি লাভ করে আবার সেই স্বাধীন প্রকৃতিতুল্য চিরদিনের হড়ের মতো স্ববশ হবে; সিধু কানহুর এইসব আপ্তবাক্য রতনী মেঝেন আতো ভাগনাডিহির ওপর ঐ পাজী মুণ্ডাদের হামলার পর থেকেই শুনে আসছে। হড়ের মঙ্গল হলেই ভাল, কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না, কারণ আজন্মকাল এর বিপরীতই দেখছে সে। বরং উল্টে মনে হয়, এ যেন ঐ পাজী আর বাউণ্ডুলে ভাইগুলোর হড় সমাজের সর্বনাশ করারই সংকল্প।

মারাং গ' রতনী মেঝেন লক্ষ্য করছে দীঘলও ঐ সিধু কানহুর দলে গিয়ে মিশেছে, আর ক্রমশই যেন সে তাদের পরম ভক্ত ও বিশ্বাসী চেলায় পরিণত হচ্ছে। কাজের ফাঁকে ও অবসর সময়ে তাদের পাগলের মতো কপচানো বুলি-গুলোই চিন্তা করে বোধহয়; নয়তো দিনরাত ভূতে পাওয়ার মতো অত গম্ভীরই বা হয়ে থাকে কেন সে? কি এত ভাবে? যার বউ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, জোয়ান বয়েসে যা সবারই হয়, তেমন বাইরের মেয়েমানুষের সঙ্গে অংসং নেই, তার তবে কিসের সুখ বা দুখের চিন্তা ভাবনা?

অবশ্য দীঘলের গাম্ভীর্যের কারণ একেবারেই অনুপস্থিত নয়, বাপ মরল আর ভাই গেল। তারপর ক-মাস না কাটতেই বাহাও নিজের পায়ে দাঁড়াবার নাম করে আতো ভাগনাডিহি ছেড়ে অম্বরে পাড়ি দিল। বাহার সঙ্গে দীঘলের কি সম্পর্ক ছিল তা রতনী মেঝেনের অজানা নয়। নিজের অতীত দিয়েই সে তার

ানিকটা ধারণা করতে পারে। চারটি দেওরের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে সে তো আজও ভুলতে পারেনি! অথচ তাকে দেখেনি কতকাল!

গড়ম ছিল বাহার জাওঞাই, আর দীঘল তার এরোয়েল হলেও জাওঞাইয়ের চয়ে অনেক বেশি। তাদের মধ্যে অংসং ছিল গভীর। প্রবল ভালবাসা। গড়ম াটকে যাওয়ার পর বাহার ঘর ভাঙেনি, কিন্তু বাহা হঠাৎ চলে যাওয়ার পর ীঘলের কোড়াম ওড়েচ্ হয়েছে। বুক ভেঙে গেছে তার। তা না হলে দীঘল াপলা করছে না কেন? কোন্ হড়্ই বা একটা মেয়ের অভাব আর একটাকে দিয়ে পুষিয়ে না নেয়, যদি না সে এমন কোনো এক গভীর ভালবাসার কন্দরে গিয়ে পড়ে, যেখান থেকে চোখ তুলে অন্যদিকের রং দেখা অসম্ভব?

বাহা তো তবু নিঃশব্দে গেছে, তাতে দীঘলের বুক হয়তো ভেঙেছে, কিন্তু রতনী মেঝেনের ওড়া ভাঙেনি। বাহার পর ভোগন টুডুর ছোট বিধবা বউ সেরালী মেঝেন গেছে, বাহারই প্রায় সমবয়সী, দীঘলের হপন গ'। সে গেছে প্রচণ্ড ঝড় তুলে, আর স্বর্গত জাওঞাই ভোজন টুডুর ওড়া ধূলিসাৎ হবার সুযোগ করে দিয়ে।

সেরালী যাওয়ার পর পুরনো ভিটের ওপর এ একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ওড়া। আগের চেয়ে অনেক ছোট, আর অত্যন্ত অনীহার সঙ্গে তৈরি বলে সত্যিই অসুন্দর। এ ওড়ার গায়ে ভোগনের কর্মকুশল হাতের চিহ্ন নেই। যতদূর সম্ভব দীঘল একাই তৈরি করেছে, আর তার সঙ্গে রতনী মেঝেনের বিরাগপূর্ণ সাহায্য। বাইরের লোক বলতে মাঝে মাঝে নিনকী মেঝেন তার অবসর সময়ে যেচে এসে দু-চার ঝুড়ি মাটি বয়ে দিয়ে গেছে।

আর বলতে নেই, ওড়ার খুঁটি পোঁতা ও ছাউনি দেবার সময় সিধু কানহুরা এসে উদার সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। এমন তারা সবার জন্যেই করে, পরের ঘরের আপদ-বিপদ কলহ-বিবাদে সর্বদাই মজুদ। কিন্তু ভোগনকে টেনে নিয়ে গিয়ে তারা যে মুণ্ডাদের হাতে খুন করালো, সে কথা রতনী মেঝেন নিজের মরার দিনও ভুলবে না, তাই সে কোনোদিনই তাদের ক্ষমা করতে পারবে না। তাদের নিজেদের মা-বাপ কোন্‌কালে মরে গেছে, দীঘলের সঙ্গে বন্ধুত্ব গভীর হওয়ার পর থেকে তারা আজকাল রতনী মেঝেনকে গ' বলে ডাকে, স্বর্গত ভোগনের প্রসঙ্গ উঠলে তাকে বাবা সম্বোধন করে; সে হিসেবে পিতৃঘাতী সন্তানদের ক্ষমা রতনী মেঝেনের কাছে নেই।

গড়ম মহাজনের ফাঁদে বন্দী হয়ে ভাগলপুরের ফাটকে চালান হওয়ার পর আট মাস পর্যন্ত বাহা অপেক্ষা করেছে, তারপর সে অম্বরে চলে গেছে। ঘরের মায়া, নির্দোষ ফাটকী বরের স্মৃতির মায়া, তার চেয়ে বড় দীঘলের ভালবাসার মায়া, কোনোটাই তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। এত তাড়াতাড়ি বাহার সর্ব ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে ওঠা রতনী মেঝেনের ভাল লাগেনি। গড়ম তার জাওঞাই বলে কথা, আর দীঘল জাওঞাইয়ের ভাই; এ ভাবে তাদের উপেক্ষা করে যাওয়া সমাজের কেউই ভাল চোখে দেখবে না।

কিন্তু ভোগন মারা যাওয়ার পর অদ্ভুত মনোবল ও আত্মসংযম দেখিয়েছিল তার ঐ তরুণী বিধবা সেরালী মেঝেন। হাত বাড়ালেই তাকে নিয়ে যাবার জন্যে হাজারটা জোয়ান আর পরোপকারী জাওঞাই প্রস্তুত, কিন্তু শোকের বহর দেখে কেউ তার কাছে ভিড়তে পারেনি। এখন পতিশোকাতুরা সপত্নীকে দেখে রতনী মেঝেনও অবাক হয়েছে। সেরালীর মতো জোয়ান বয়েসে তার নিজের বৈধব্য ঘটলে কি যে হত তা বলা যায় না।

কিন্তু রাস্তি সেরালী তার কচি গিদরে ডাট্রোকে বুকে নিয়ে শ্বেতাঃবের থেকে এঃতবের শুধু গুম হয়ে ওড়ার ওসারায় বসে থেকেছে। এমন বিরহের নিদর্শন হড়্ সমাজে অবাস্তব। সেরালীর আদর্শ শোক দেখে রতনী মেঝেনের নিজেকে খুবই ছোট মনে হয়েছে। বাপের বয়েসী জাওঞাই, তার ওপর মাঝখানে রতনী মেঝেনের মতো জ্যেষ্ঠা সতীন থাকার দরুন যাকে সে কোনোদিনই খুব কাছে পায়নি, তার মৃত্যুতে এমন মনমরা হয়ে থাকা কল্পনাই করা যায় না।

যাহোক এই অবিশ্বাস্যভাবেই দিন চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তারপর কি হল যেন রতনী মেঝেনের, বাপের বাড়ির আতো তালঝারি থেকে ধীরো মারাস্তি নামের সেরালীর এক খুড়তুতো ভাই আতো ভাগনাডিহিতে হাজির। সেরালীর খুড়তুতো ভাই মানে রতনী মেঝেনেরও ভাই, ভাইবোন সম্পর্ক; বয়হামিসেরা। সেরালী রতনী মেঝেনের সবচেয়ে ছোট বোন, তিনজনের মধ্যে তৃতীয়, আর খুব আদরের।

সেরালীকে আজীবন নিজের কাছে রাখবে বলে রতনী মেঝেনই উদ্যোগী হয়ে ভোগনের সঙ্গে বাপলা দিয়ে তাকে নিজের ওড়ায় নিয়ে এসেছে। মাসির সঙ্গে বোনপোর বিয়ে হয় না, নয়তো সেরালীর যা বয়েস তাতে গড়মেরই রিনিঃ হওয়ার উপযুক্ত ছিল সে।

সন্ধের পর দুই সহোদরা দুই সতীন ভোগনকে নিয়ে পানভোজন করত, তারপর রাতে ভোগন টুডুকে মধ্যিখানে রেখে দু-জনে দু-পাশে শুত। মাঝে মাঝে রতনী মেঝেনের অনুমতি পেয়ে ভোগন আর সেরালী শরীরের দিক থেকে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

যতদিন ভোগন জীবিত ছিল সেরালীর জ্যেষ্ঠা সতীন হিসেবে রতনী মেঝেন তার দেহমন এবং অন্য সবকিছুর ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ফলিয়ে চলেছিল। সেরালীকে সে এক হাতে স্নেহ ও অপর হাতে শাসন করেছে। এ ব্যাপারে ভোগনের কিছু বলা অথবা করার অধিকার এক্তিয়ার ছিল না।

ভাগনাডিহির শোকগ্রস্ত পরিবারকে প্রায় বছর কাটিয়ে সান্ত্বনা দিতে আসার পর ধীরো মারান্তি যেন এখানেই জমে বসে গেল, আতো তালঝারিতে ফেরার নামও করে না সে। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, মনের সুখ বা শোকে তিরিও বাজায়, কোথায় খায়দায় তা সে-ই জানে, তারপর সন্ধে হলে ওড়ায় এসে ঢোকে। ধীরোর বিবাগী মনের কিছুটা সন্ধান রতনী মেঝেন তার কাছ থেকেই পেয়েছে।

ধীরো হতাশ স্বরে বলে, 'আর আতো তালঝারিতে ফিরব না দিদি, যার রিণিঃ দু-দুটো গিদরে নিয়ে পাশের আতোর হড়ের সঙ্গে আঙ্গির আপাঙ্গির হয়েছে, তার আর নিজের আতোয় কারো কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকে না।'

'তোর রিণিঃ আঙ্গির আপাঙ্গির হয়েছে, তুই তো আর কাউকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাসনি, তবে তোর লজ্জা কি? তুইও আবার অন্য কুড়িকে বাপলা করে নিজের ওড়ায় নিয়ে যা, আবার এক বছরের ভেতরই গিদরে হয়ে ওড়া ভরে উঠবে।' জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর উপযুক্ত উত্তরই দেয় রতনী মেঝেন। বেটাছেলে একা থাকার মানেই মাড়ি হয়ে থাকা, প্রাণে বেঁচে থেকেও সে যেন মৃতের সামিল।

হাতের তিরিও দাওয়ার ওপর নামিয়ে রেখে হতাশ এবং অনাসক্ত স্বরে ধীরো বলে, 'না-আ-আ!' তারপর তিরিওটিকে সে একমাত্র জীবনসঙ্গীর মতো হাতে তুলে নেয়।

না তো ঠিকই, কিন্তু এবার যেন রতনী মেঝেনের কেমন এক সন্দেহ জাগে। ডাঙোয়া কোড়ার বাইরে উড়ু উড়ু ভাব বরং ভাল, কিন্তু জোয়ান বয়েসে ঘরের

কোণে মুখ গুমরে বসে থাকা বিশেষ সুলক্ষণ নয়। দিনেরবেলা ধীরো অবশ্য ওড়ায় থাকে না, কিন্তু এ বিষয়ে রতনী মেঝেন খোঁজখবর নিয়ে দেখেছে, হাটে-বাটে পথেঘাটে মেয়ে শিকারের নেশা নেই তার। থাকলে জানা যেত, পোখরীতে দাঃ আনতে গেলেই সব খবর হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসে। ধীরোর স্বভাবের এই বৈচিত্র্য ভয়েরই ব্যাপার।

ওদিকে সেরালীরও যেন ইদানীং কেমন একটু পরিবর্তন। আজকাল ওড়ায় একা থাকলে গুনগুন করে গান গায় সে। বাইরে থেকে এসে হঠাৎ ওড়ায় ঢুকতে রতনী মেঝেনের কানে তার গানের সুর প্রবেশ করেছে। হড়্ মেয়ের গলায় গান, সে তো তার মুখের কথার মতোই নিয়ত বহমান, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপার যেন কিঞ্চিৎ অন্যরকম। একে মায়ের পেটের বোন, তায় নিজের হাতে বিয়ে দিয়ে আনা সতীন, তাই সেরালীর সম্বন্ধে স্নেহ ও সেই সঙ্গে এক ধরনের সন্দেহ মেশানো বিদ্বেষ আছে রতনী মেঝেনের মনে। আপাতত এ ওড়ার দুটি শোক মিশে গিয়ে কোনো নতুন সুখ হঠাৎ জন্ম নেয়নি তো?

বক্তব্য খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে সেরালীর উদ্দেশে রতনী মেঝেন বলে, 'যাক্ হপন, তোর শোক তো এতদিনে কেটেছে, এবার মাঝে মাঝে হাটে আর মেলায় বেড়াতে যা, খুঁজলে তোকে বাপলা করার মতন হড়্ পেয়ে যাবি। কি বা বয়েস হয়েছে তোর, এই বয়েসে কি রাণ্ডি সেজে কেউ চিরদিন থাকতে পারে?' তার-পর একটু স্নেহ ভরা কণ্ঠে হাসেও সে, 'আর বুড়ো নয়, এবার একটা জোয়ান জাওঞাই তোকে ধরতে হবে, তবেই বুঝবি বাপলার কি আর কতখানি সুখ!'

এত কথা শুনেও সেরালী জবাব দেয় না, ঢেঁকিতে যোগান দিতে দিতে ঘাড় তুলে সতীন রতনী মেঝেনের মুখের দিকে তাকায়, চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব সরল করে রাখে সে।

নিরুত্তর সেরালীর চোখে চোখ রেখে আরও জোর পায়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয় রতনী মেঝেন, আর মনে মনে ভাবে তার এই পদাঘাত সেরালীর বুকের ওপর গিয়ে পড়ুক, বুক ভেঙে যাক সেরালীর, তাতে হয়তো ভবিষ্যতে এ ওড়ার মানটুকু বাঁচবে।

প্রকৃত তথ্য ফুটে বেরুল আতোয় বাহা পরবের সময়।

মাস ফাগুন, হড়ের বর্ষশেষের মাস, আর আগামী নববর্ষ আবাহনের মাস। সোহরায় পরবের মতো অতখানি উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর না হলেও বাহা কম

গুরুত্বের নয়। অধিকাংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠান জাহের স্থানে। আতোর উৎসাহী জোয়ান হড়ের দল জাহের স্থানের জঙ্গলে দেবদেবী আর বোঙাবর্গের জন্যে একজোড়া কুটির বেঁধে দিয়েছে। একটি কুটির জাহেরেরা মড়েকোতুরুইকো ও মারাংবুরুর। আর অপরটি গোসাইনেরার নিবাস। গোময় দিয়ে নিকনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাহেরস্থান। আঙিনায় ঢেলে ভাত পর্যন্ত খাওয়া যায়।

নাইকী সুরীন মুর্মুর ওড়ায় সারা রাত ধরে দেবতা ও বোঙার ভরগ্রস্ত তিনটি হড়্‌কে বিবিধ রকম প্রশ্নাদি করার পর আতোর হড়্‌বৃন্দ যে যার ওড়ায় ফিরে স্নানাদি সেরে আবার জাহেরস্থানে পৌঁচেছে। অধিকাংশ প্রশ্ন আগামী বছরের শুভাশুভ। সে বিষয়ে ভরগ্রস্ত ব্যক্তিদের মুখে সুসংবাদ পেয়ে সকলের চিত্তই উৎসাহীপূর্ণ। তিনটি হড়্‌ই জ্যান্ত মুর্গীর ধড় থেকে মুণ্ডু ছিঁড়ে ছিন্ন গলদেশে মুখ লাগিয়ে রক্ত পান করে প্রমাণ করেছে তারা বাস্তবিকই দেবতা এবং অপদেবতার ভরগ্রস্ত।

জাহেরস্থানে মুর্গী মাংস মিশ্রিত সমস্ত ভাতের প্রসাদ পেয়ে হড়্‌কুল আবার ওড়ায় ফিরে যে যার সাধ্যমতো পারিবারিক ভোজের আয়োজন করেছে। তারপর সারা দিনরাত্রি জুড়ে আনন্দানুষ্ঠান। মেয়েরা পরস্পরের গায়ে জলের ছিটে দিয়ে হোলি খেলে। সেই বর্ণহীন জলই খুশির ঝলকে রঙীন মনে হয়। উপরন্তু সান্ধ্যলগ্নের পর থেকে নারী পুরুষের স্বাভাবিক ও চিরাচরিত রীতির জীবনানুসন্ধান।

বাহা পরবের সময় ধীরো যেন হঠাৎ একটা প্রাণবন্ত হড়্ হয়ে উঠল, কিন্তু তার প্রাণের উৎস যে এইভাবে ওড়া থেকে বেরিয়ে আসবে তা রতনী মেঝেন একেবারেই ভাবতে পারেনি। উৎসবের মাঠে তাদের অংসং অনেকেরই দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল, কিন্তু পাপ বোধহয় নিজেকে দেখতে পায় না!

রতনী মেঝেন তাদের সাবধান করার আগেই আতো মাঝি ভৈরব এসে ঘোষণা করে গেল, 'বাহা পরবের বারোদিন পরে তোর ওড়ায় বিটলাহা হবে।'

'কেন?' অবাক চোখে তাকিয়ে রতনী মেঝেন জিজ্ঞেস করে।

ভৈরব মাঝি বলে, 'বয়হা মিসেরায় অংসং গো-বো, এসব বরদাস্ত করা হবে না।'

কিছুদিন যাবৎ হীন সন্দেহের বাতাসে রতনী মেঝেনের মনের ভেতরটা খুবই দূষিত হয়েছিল, এখন সেখানে স্থির বিশ্বাসের অটুট সিদ্ধান্ত; তবু সে সভয়ে বলে ওঠে, 'না না, এ একেবারেই মিছে কথা। তারা এমন খারাপ কাজ করতেই পারে না।'

মাথার ওপর গ্রন্থীবদ্ধ সুদীর্ঘ চৈতন দুলিয়ে ভৈরব মাঝি সরোষে উত্তর দেয়, 'চেৎ চিকায়দা—কি বলছিস তুই, মিছে কথা? হড়্ কখনো মিছে কথা বলে না। কাল রাতে অনেকেই তাদের জাহেরস্থানে দেবতাদের জন্যে তৈরি ওড়ায় চুপি-চুপি ঢুকে গিয়ে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে দেখেছে। ভাতুরে সেতারা যেমন বয়হা মিসেরা সম্পর্ক ভুলে পথে-ঘাটে এক হয়ে যায় তেমনি নির্লজ্জ ব্যাপার! আমি একটু আগে খবর পেলে বর্শার এক ঘায়ে ঐ বেহায়া কুকুর আর কুক্কুরীকে গেঁথে এনে তোকে দেখাতুম। জাহেরস্থানের ধরম নষ্ট করেছে, তার জন্যে মারাংবুরু তাদের গায়ে কুষ্ঠব্যাধি দেবে, এ তুই একদিন নিজের চোখেই দেখবি।'

এত দেখার প্রয়োজন বা বাসনা নেই, বারোদিন পরে এই ওড়ার যে কি অবস্থা হবে এখন কেবল তারই অপেক্ষা। অবশ্যম্ভাবীর পূর্বাভাস দিয়ে ভৈরব মাঝি ওড়া থেকে বেরিয়ে গেছে। রতনী মেঝেনের ইচ্ছে হয় বিটলাহা তিথির আগেই নিজের হাতে ওড়ায় আগুন দিয়ে বনের পথে পালিয়ে যায়, তাহলে স্বচক্ষে আর অপরের হাতে ওড়ার ধ্বংস দেখতে হবে না। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই, হড়ের আক্রোশ ফুটে বেরুবার অবসর না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবার নয়।

লাঠির আগায় বাঁধা কাঁচা শারজম পাতড়া নিয়ে ভাগনাডিহির যোগমাঝি যাত্রা করে। তার সহযাত্রী গলায় ঢোলক ঝোলানো পারাণিক। ডুব ডুব ডুব—পথে বিটলাহার খবর ছড়াতে ছড়াতে তারা বোরিওবাজার অবধি চলে যায়, সে জায়গা ছেড়ে আরও দূরে।

লাঠির আগায় বাঁধা ছোট্ট প্রশাখাযুক্ত কাঁচা শালপাতার দিকে সকৌতূহলে তাকিয়ে পথচারী হড়্ আর কুড়ি প্রশ্ন করে, 'চেৎ সন্দেশ—কি ব্যাপার, এ পাতড়া কিসের?'

'সামনের রবিবারের পরের বুধবার আতো ভাগনাডিহিতে দীঘল টুডুর ওড়ায় বিটলাহা হবে। তার রাপ্তি হপন গ' নিজের বয়হার সঙ্গে সেতা-সম্বন্ধ করেছে। ভাইবোনের মধ্যে কুকুর কুকুরীর মতন জাওঞাই আর রিণিঃর খারাপ সম্পর্ক।'

খবর শুনেই সংবাদপ্রাপ্ত হড়্ নিকটস্থ শাল গাছের পাতা ছিঁড়ে নিজের লাঠির ডগায় বেঁধে নেয়। পথে যার সঙ্গে দেখা হবে ভাগনাডিহির মাঝির ঘোষণা তাকে বিদিত করবে। হড়্ সমাজের প্রতি এ তার পবিত্র কর্তব্য। এবং দু-দিনের মধ্যেই দেড়হাজার বর্গমাইল দামিন এলাকা জুড়ে কোনো হড়ের কাছেই বিটলাহার ঘোষণা অজ্ঞাত থাকবে না। পাতড়ার পক্ষীরাজ হাওয়ার বেগে ছোটে। আর তার গতিও অব্যাহত।

আঠারো

মাত্র দেড়দিনের মাথায় তেরো ক্রোশ দূরবর্তী অম্বর রেলপথের জন্যে দূরের একটা ঢিবি থেকে ধামাভর্তি মাটি বয়ে আনার সময় কামিন বাহা কি" একজন অপরিচিত হড়ের হাতে পাতড়া দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর একটি সাধারণ মেয়ের মতো কৌতূহল নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে, 'কি খবর, কিসের পাতড়া ?'

জাতিচ্যুত কামিন কুড়ির মুখের দিকে বিকৃত ও অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সংবাদী হড়্ অরুচিকর গলায় বলে, 'কিছু না, হড়ের ওড়ায় বিটলাহা।'

নেহাৎ মেয়েমানুষের অদম্য কৌতূহল, যা শত অপমানের পরও প্রশমিত হয় না, তা না হলে ঐ হড়ের মুখভাব দেখার পরে বাহা আর মুহূর্তমাত্র সেখানে দাঁড়াত না। আবার সে শুধোয়, 'কোথায় বিটলাহা হবে ?'

জবাব না দিয়ে ছাড়ান নেই, পরিপূর্ণ সংবাদ না পাওয়া অবধি অবাধ্য মেয়েটা হয়তো নির্লজ্জের মতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাই অগত্যা বোধে সংবাদবাহী নিরুপায় হড়্টি বাহার সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

এবার বাহা কিস্থ বিস্তারিত জানতে পারে। খবর শুনে প্রথমটা তার সর্বচিত্ত এক ধরনের বিষাদপূর্ণ আনন্দে ভরে ওঠে। মন বলে বেশ হয়েছে, আমি খুব খুশি। বুঝি সেই খুশির আবেগ ও আতিশয্যে তার চোখদুটো দিয়ে জল ঝরে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মাঠের মধ্যে একান্তে দাঁড়িয়ে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে সে। এ কান্না আর থামতে চায় না, অশ্রুধারা বিরামহীন অবিরল।

দীঘলের ওড়া উজাড় হয়ে যাবে ; হয়তো ওড়া থাকলে ভবিষ্যতে বাহারও একদিন সেখানে ফেরার সম্ভাবনা থাকত। ঐ বাপের আমলের ওড়া ছাড়া দীঘলের ভাগনাডিহি আতোয় আর কোনো মায়ার বন্ধন নেই। বয়স্ক ছেলের সঙ্গে তার মা-র কতটুকুই বা সম্পর্ক ? ওড়া উজাড় হয়ে যাওয়ার পর শাশুড়ী রতনী মেঝেনই কি আর ভাগনাডিহিতে পড়ে থাকবে ? হয়তো কোনো দেওরের কাছে গিয়ে উঠবে সে, কিংবা আতো তালঝারিতে তার বাপের বাড়িতে। মোটের ওপর এই সংবাদের যেদিন পুষ্টি হবে ঠিক সেদিনই আতো ভাগনাডিহি থেকে ভোগন টুডুর পরিবার মুছে যাবে।

তারপর আর কেবল পারাণিকের একক প্রচারবাদ্য নয়, হাজার হড়ের সরোষ

এবং বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ অসংখ্য বাজনা। নারীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত ও তাদের ছন্দবদ্ধ নৃত্য বিবর্জিত সে অনুষ্ঠান। দামিনঈকোহ্‌র বিভিন্ন স্থান থেকে আগত হড়ের দল দীঘল টুডুর ওড়া অবরোধ করল, সঙ্গে আতো ভাগনাডিহির হড়্‌বৃন্দ। তাদের ক্রোধায়ুধের ঘায়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওড়া ধূলিসাৎ। তারপর অশ্লীল সঙ্গীত ও মানুষের দেহনিঃসৃত অপসম্পদে ভিটের নারকীয় অবস্থা।

নিকটবর্তী একটা গাছের সঙ্গে রজ্জু শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে লাঞ্ছিতা আসামী সেরালী নীরবে দেখছে সব। তার কাছেই অবহেলিত শিশু ডাটো মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। দীঘল নেই এ আতোয়। রতনী মেঝেনও যেন কোথায় সরে গেছে।

বিটলাহা অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত। সমবেত হড্‌গোষ্ঠী উত্তেজনা অবসানের পর সবিশেষ শ্রান্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অপরাধিনীর সম্যক বিচার।

সেরালীর সামনে এসে ভৈরব মাঝি তাকে গম্ভীর গলায় শাসানি দেয়, 'সেই ভূতের কোড়াটা কোথায় গেল বল্, নয়তো এখানে থাকলে তার যে অবস্থা হত তোরও তাই হবে।'

ভীতিবিমূঢ় সেরালী মাথা নাড়ে, 'আমি জানি না।'

'বল্, নয়তো তোর ভালবাসার জায়গা গরম লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেব।'

শিউরে ওঠে সেরালী, তার কণ্ঠস্বর অস্ফুট, তবু কোনোমতে ঘাড় নেড়ে আবার বলে, 'আমি সত্যিই জানি না সে কোথায় পালিয়ে গেছে।'

ঠাস করে সেরালীর গালে একটা চড় কষিয়ে দেয় ভৈরব, 'মিছে কথা!'

বাঁ হাতের পাতায় সেরালী তার আহত গাল মোছে, যেন তাতেই সব জ্বালার উপশম। ঐ ভাবে জ্বালা নিবৃত্তি করে নিজেকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে তোলে, তারপর আশ্চর্য শান্ত স্বরে বলে, 'মিছে নয়; আমি জানি না।'

সত্যিই জানে না সেরালী। বিটলাহার ঘোষণা শুনে ধীরো হড়্ আতো ছেড়ে জোড়াপায়ে পালিয়ে গেছে। এ আতো দূরে থাক, ভবিষ্যতে নিজের আতো তালঝারিতে পর্যন্ত সে ফিরবে কিনা সন্দেহ। বিপুল লাঞ্ছনাপূর্ণ অবধারিত মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকার সাহস ছিল না তার।

গাছের সঙ্গে আসামী, আর তাঁতের একটি সুদীর্ঘ রজ্জু বাঁধবে তার বিশেষ অঙ্গটিতে। তারপর সে দড়ির অপর প্রান্ত সামনের একটা গাছের গায়ে টান টান করে বাঁধা হবে। প্রতিটি হড়ের মুখে থাকবে অশ্লীল সঙ্গীত, এবং তার লাঠির

প্রচণ্ড ঘা পড়বে সেই তাঁতের দড়ির ওপর। এক অথবা একাধিক ঘা। ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ সারা জীবনের মতোই পৌরুষের পঙ্গুতা। উপরন্তু যথেচ্ছ প্রহার। এত নির্যাতনের পর নিয়তির দৃষ্টিতে উপেক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কে আর বেঁচে থাকে ? মৃত্যুই এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি।

সাস্তব্যস্থলে সেরালীও পালিয়ে মান বাঁচাত, কিন্তু আতোর প্রতিটি হড়ের সন্দিগ্ধ ও সন্ধানী দৃষ্টির পাহারা কেটে তা সম্ভব হয়নি। এসব বিপদে সিধু কানহুরাই ভরসা, কিন্তু এক মাসের ওপর তারা আতোর বাইরে হড় সমাজের মধ্যে মুক্তিমন্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে গেছে। তবে আতোয় থাকলেও সামাজিক বিচার পর্বে তারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত কিনা তা সঠিক বলা কঠিন। এ তো আর দীঘলের সেই মস্তক মুণ্ডনে অস্বীকৃত হওয়ার মতো সামান্য অপরাধ নয়।

ভৈরব মাঝি সেরালীকে প্রশ্ন করে, ‘তুই পাপ করেছিস ?’

অস্বীকারে লাঞ্ছনা বেশি, সেরালী মৃদু ঘাড় নাড়ে, বলে, ‘হ্যাঁ।’

‘বয়হা মিসেরার মধ্যে জাওঞাই আর বিণিঃ সম্বন্ধ কুকুর কুকুরীর সম্বন্ধ, নয় কি ?’

‘হ্যাঁ।’ সেরালী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

‘তুই কুকুরী ?’

‘হ্যাঁ।’ সেরালীর ত্বরিত জবাব।

‘তোর মাথা নেড়া করে চুন আর গোবর মাখিয়ে আতো থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, উচিত শাস্তি তো ?’

আবার আগের মতোই সহজ স্বীকৃতির ভাব নিয়ে সেরালী বলে, ‘হ্যাঁ।’

সব ব্যাপারে নিরুপায় স্বীকারোক্তি ও সহজ সম্মতি দেওয়া ছাড়া সেরালীর অন্য পথ নেই। অভিযোগ অস্বীকার এবং শাস্তির প্রতিবাদে নির্যাতনের বহরই কেবল বাড়বে।

এরপর কেউ আর আতো ভাগনাডিহিতে সেরালীকে দেখেনি। গিদরে ডাটোকে নিয়ে মুণ্ডিত মাথায় আতো ছেড়ে চলে গেছে সে। মাথায় চুল গজানোর অপেক্ষায় কিছুদিন নিরালা নির্বাসনে কাটিয়ে তারপর হয়তো অম্বর রেলপথ অথবা কোনো নীল কিংবা রেশম কুঠিতে কাজের সন্ধানে চলে যাবে। এক যাত্রায় প্রাণ বাঁচলে তারপর চিরদিন বেঁচে থাকার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। মৃত্যুর মুখোমুখি না পৌঁছনো পর্যন্ত প্রাণের অমূল্য স্বাদ টের পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই নতুন যুগে হড় মেয়ের তেমন অসহায় দুর্দিন নেই আর।

কিছুকাল জাতিচ্যুত হয়ে থাকার পর মাঝিস্থানে নগদ তিন টাকা ও একটি শুয়োর জরিমানা দিয়ে আবার জেত কিনেছে দীঘল। তার সঙ্গে মারাং গ' রতনী মেঝেনও জাতে উঠেছে। অজাতের মানুষকে হড় আতোয় ওড়া বাঁধেত দেবে না কেউ।

কিন্তু আবার নতুন করে ওড়া তৈরির কোনো সাধই রতনী মেঝেনের ছিল না। কি আর হবে ঘর বেঁধে? গড়ম ফাটকে চালান হওয়ার পর থেকে বুকের মধ্যে যে শূন্যতার ঘা জন্মে গেছে তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তারপর একে একে জাওঞাই ভোগন গেছে, পুত্রবধূ বাহা বিদায় নিয়েছে, আর হড়ের বিচারের ফলে সতীন সেরালী পালাতে বাধ্য হয়েছে। উদাসী দীঘলও এবার যে কোনোদিন নিরুদ্দেশ হতে পারে। তাই যদি শেষ পর্যন্ত হয়, তারপর রতনী মেঝেন নিজে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকবে। আর হড় সমাজে নয়, বা মানুষের মধ্যে নয়। হড় মানে তো পরম নিষ্ঠুরতায় জড়। আর মানুষ মানে কি তা রতনী মেঝেন ঠিক জানে না, কিন্তু চতুর্দিকে দেখে শুনে শুধু ভয়ই হয় তার।

কিন্তু ভাগ্য কখনো ব্যক্তি বিশেষের রুচি অথবা অরুচি গ্রাহ্য করে না, তাই তার ওপর অভিমান করে খুব বেশিদিন বসে থাকা বৃথা। নিজের সর্বহারা বুকের দীর্ঘশ্বাস শুধুমাত্র নিজেকে শুনিয়েই বা লাভ কি, কেউ তো সুমুখে এসে সহানুভূতির একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না? অথবা যদিও বা ততটুকু করে তা এই অপরিসীম বেদনা ও ক্ষোভের প্রতিকারস্বরূপ হবে না।

তাই মারাং গ' রতনী মেঝেন একদিন কর্মক্লান্ত দীঘলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশানিরাশাহীন এবং স্বপ্নশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে তালাকোড়া, আমার ওড়ায় কি আর কোনোদিন একটা বাচ্চা কোড়ার কান্না শোনা যাবে না?'

প্রশ্ন শুনে দীঘল অনিচ্ছের হাসি হাসে, তারপর জবাব দেয়, 'কেন, আমিই তো তোর বাচ্চা কোড়া, কাঁদতে বললেই কাঁদব?'

'তা বেশ,' এ পথে কৌতুকের প্রতিবন্ধক পড়তে মারাং গ' আবার অন্যভাবে বলে, 'এ ওড়ায় কতদিন ঢেঁকি কোটা হয়নি বল তো, একা একা কি এ কাজ করা যায়? কোনো বহু এসে কি ঢেঁকিতে পাড় দেবে না?'

'তোরও তো বয়েস হয়েছে,' বলতে বলতে শ্রান্ত দীঘল একটা সুদীর্ঘ হাই তোলে, তারপর দাওয়ায় বেছানো খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর শরীর ছড়িয়ে

দেয়. 'বহু আসুক আর নাই আসুক, তুই আর কতদিন ঢেঁকি কুটতে পারবি বল ?'

মারাং গ' উত্তর দেয়, 'হড়ের ঘরের রিণিঃ আর কুড়িকে চিরদিনই খেটে মরতে হয়, না হলে ওড়ার মালিক তাকে কুষ্ঠ রুগীর মতন ওড়া থেকে বের করে আতোর বাইরে একটা শালগাছের নিচে বসিয়ে দিয়ে আসে।'

দীঘলের গা বেয়ে অকারণেই ঘাম চুঁইছে, অথচ গরম বিশেষ নেই। পরনের গামছাকৃতি কিচরির একটা প্রান্ত ওপর দিকে তুলে সে গায়ের ঘাম মোছবার চেষ্টা করে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিধেয়ের খুঁট সর্বাঙ্গে পৌঁছয় না, অগত্যা হাতের সাহায্যে ঘাম মুছে সেই হাত আবার গামছায় মুছতে মুছতে সে মা-কে আশ্বাস দেয়, 'তোর ভয় নেই, আমি কোনোদিনই তোকে তাড়াব না, আর আমার কোনো রিণিঃও আসবে না যে বলবে, সংসারের কাজ না করলে খেতে পাবি না।'

না, তর্ক অথবা অত দূর প্রসারিত আলোচনার শেষ নেই, শুধু কথায় কথা বাড়ে, প্রকৃত কাজের সম্ভাবনার মুখে ভাঁটা পড়ে যায়, তাই এবার মারাং গ' খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাষায় প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা তালাকোড়া, একটা সত্যি কথা বল্ তো, তুই কি কোনোদিনই বাপলা করবি না ?'

দীঘল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপ্রশ্ন করে, 'তাতে লাভ কি ?' তারপর নিজেই উদাস গলায় উত্তর দেয়, 'তোরও তো বাপলা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কি লাভ হল ?' তারপরই কিন্তু লাভ-ক্ষতির প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সে বলে, 'হ্যাঁরে গ', তোর কি রকম বাপলা হয়েছিল — ইতুত বাপলা নাকি ?' এবার একটু হাসে সে, 'দেখে তো মনে হত আমার আপাত ভোগন হাড়াম নিজের জোয়ান বয়েসে খুব রসিক মানুষ ছিল ?'

'না,' মারাং গ' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, 'আমি কিরিণ বহু।'

দীঘলের কথার উত্তর দেওয়ার পরই রতনী মেঝেনের দৃষ্টি হঠাৎ ওড়ার উঠোনে ঋজু খেজুর গাছের দিকে গিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে গাছটার গায়ে সন্ধের ছায়া মেখে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রতনী মেঝেনের মন থেকে বিগত দিনের সব দূরত্ব সরে চলেছে যেন। ক্রমশ তার নিজের বাপলার দিন পর্যন্ত সময় পিছিয়ে গেল। এবং তারপর সেখানেই থেমে রইল কিছুক্ষণ।

রতনী মেঝেন কিরিণ বহু। ভোগনের পক্ষে বরকর্তা তার বাপ খড়ো টুডু।

খড়ো টুডু প্রস্তাবিত বাপলার সম্বন্ধ নিয়ে আতো ভাগনাডিহির গোড়াইত রতনী কুড়ির বাপের বাড়ি আতো তালঝারিতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে হাঁড়ি ভর্তি মদ, কনের জন্যে নতুন পঞ্চি পাঢ়ান আর কনের বাপের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী নগদ পাঁচটা শাদা পয়সা কন্যা পণ।

শুভ শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে বাপলা। আতো ভাগনাডিহি থেকে বর যাত্রীর দল এসে পৌঁছল দুপুরের পর। বিয়ে গোধূলি লগ্নে, যখন দিনের আলো শেষ হতে খানিকটা সময় বাকি। তবে শুক্লা চতুর্দশীতে গোধূলি লগ্ন ঠিক বোঝা যায় না, দিনান্তের রক্তাভ রশ্মি আর চাঁদের পীতাভ আলো মিশে গিয়ে অন্য এক ধরনের বর্ণ সমাহার।

বরযাত্রী এবং কন্যাপক্ষের বাজনার ধুমে সারা আতো তালঝারি গম্‌গম করছে। মেয়েরা ছোট ছোট দল বেঁধে আতোর পথেঘাটে ওড়ায় ওড়ায় ঘুরে বাপলা সেরিং গাইছে। বিবাহ সঙ্গীত। প্রতিটি গানই নতুন। হড়্ মেয়ের গলায় গানের স্বর ফুটলেই অচিরে গানের কলি রচিত হয়। সব গানেই ভোগন হড়্ ও রতনী কুড়ির নাম। কবে কোন্ বনপথে বা পুকুরঘাটে তারা পরস্পরকে দেখে প্রেমে পড়েছিল তারই কাল্পনিক গাথা। গানের সঙ্গে নাচের সদা সহাবস্থান, একটা বাদ দিয়ে অপরটা নয়।

বেশ সোমত্ত বয়েসে রতনী কুড়ির বাপলা হয়েছে, ততদিনে জীবনের অনেকগুলো ঘাট মাড়িয়ে দেখা হয়ে গেছে তার। ঘরের কাজ জানে ক্ষেত-খামারের কাজও। পুরুষের সঙ্গে একটি মেয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ কি আর কোথায়, সে বিষয়েও যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তবু বাপলার সময় তাকে ধামার মধ্যে বসিয়ে মাথায় করে ওড়ার বাইরে নিয়ে আসা হল। বাপলার প্রথম অনুষ্ঠান ওড়ার স্মুখে রাস্তার ওপর। সিঁদুর দানের পরই জাওঞাই শ্বশুরের ওড়ায় ঢুকতে পাবে. তারপর স্ত্রী আচার।

প্রকাণ্ড হড়্ ভোগন টুডু, ভাল শিকারী হিসেবে দশ বিশটা আতো জুড়ে খুব নাম-ডাক, তবু সে-ও আতো ভাগনাডিহির এক জোয়ান হড়ের কাঁধে চেপে রতনী কুড়ির সামনে হাজির হয়েছে। যার কাঁধে চেপে রয়েছে তার গলার দু-পাশ দিয়ে জাওঞাইয়ের একজোড়া পা শালকাঠের শক্ত খুঁটির মতো ঝুলছে।

রতনী কুড়ি ধামায় বসে আর তার জাওঞাই একজন হড়ের ঘাড়ে চেপে, সেই অবস্থায় সিঁদুরদান। কতকটা যেন খুনসুটি করবার উদ্দেশ্যেই রতনী কুড়ির মাথার সামনেটায় ও সারা কপালে ভোগন টুডু খুব জবজবে করে সিঁদুর লেপে

ইল। পাঁচজনের চোখের সুমুখে এ কি দুষ্টুমি জাওঞাইয়ের, সে কথা ভেবে তনীর সর্বাঙ্গে সলাজ পুলকের শিহরণ খেলে যায়।

ঐ সিঁদুরদানের পরই চতুর্দিক থেকে পাথরবৃষ্টি। আতোর জোয়ান কোড়ারা তুন জাওঞাই আর বরযাত্রীদের সঙ্গে তামাশা করছে। এদের মধ্যে দু-চারজন ঈর্ষাপরায়ণ হড়্ও রয়েছে, যারা দু-দিন আগেও রতনী কুড়ির সুন্দর সুঠাম যৌবনের স্বত্বভোগী হবার চেষ্টায় ছিল, এবং কেউ কেউ এ ব্যাপারে সফলতাও পেয়েছিল।

হড়্ সমাজে বাপলার সময় প্রস্তর বর্ষণের এ রীতি বোধ হয় আবহমানকাল, তবু এর জন্যেও রতনী মেঝেনের মনে ক্ষীণ লজ্জা জেগে ওঠে; তার নতুন জাও-ঞাই নিজের রিণিঃর সম্বন্ধে কি ভাবছে এখন!

সিঁদুরদানের এক নিমেষের মধ্যেই চিরদিনের রতনী কুড়ি থেকে বাকি জীবনের রতনী মেঝেন। তার বছর তিন পর থেকে গড়মের ইঙ্গাৎ। গড়মের গ'। ভোগনের দ্বিতীয় বাপলার পর থেকে সে মারাং গ'—বড় মা!

বাপলার আগেও রতনী মেঝেন জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু তবু বাপলার পরে আতো ভাগনাডিহিতে এসে তার মনে হল, সংসারধর্মের অঙ্গীভূত এই সম্বন্ধ রক্ষায় যে পরম গাম্ভীর্য ও দায়িত্বপূর্ণ সুখস্বাদ তা সম্পূর্ণই নতুন। এর অপরিসীম পুলকের রেশ সারা জীবন ধরে দেহ এবং মনের সর্বাঙ্গ আপ্লুত করে রাখে।

'আডিং ভাগেনা হড়্—আমি খুবই ভাগ্যবান পুরুষ।' বাপলার পর রতনী মেঝেনকে আতো ভাগনাডিহিতে নিজের ওড়ায় এনে পত্নীভাগ্যে গরীয়ান ও গর্বিত পুরুষ ভোগন টুডু বেশ আবেগপূর্ণ গলায় কথাটা বলেছিল।

সে কতকাল আগেকার উক্তি, তারপর ঝর্ণার স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়-কুটোর মতো কত অজস্র কথা সময়ের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে, কিন্তু জীবন থেকে এই আবেগের বিলুপ্তি হয়নি। ভোগন নেই, অথচ তার কণ্ঠস্বরে, আডিং ভাগেনা হড়্, রতনী মেঝেনের কানে নিয়ত সোচ্চার।

নিজের পেটের কোড়া দীঘলের দিকে তাকাতে গিয়ে মারাং গ'-র মন হঠাৎ অনুকম্পা মিশ্রিত বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। আর কোনোদিনই অবাধ্য সন্তান তাদাকোড়ার বাপলার কথা তুলবে না সে। যে কোনো হড়্ সারা জীবনের হাজারটা কুড়ির সংস্পর্শে আসতে পারে, কিন্তু সবার কপালে বাপলার সুখ থাকে না। মারাং গ' মাথা খুঁড়ে মরলেও এ ব্যাপারে সে দীঘলকে সুখী দেখতে

পাবে না।

মারাং গ'র মনে পড়ে যায় ছেলেবেলায় কতদিন দীঘল হালের মোষ চরাতে বেরিয়ে সন্ধেবেলায় মোষের পিঠে শুয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় ওড়ায় ফিরেছে। সে নিজে মোষকে ফিরিয়ে আনেনি, মোষই ওড়া চিনে তাকে নিরাপদে পৌছে দিয়েছে।

তারপর মারাং গ' দশ বছরের বলিষ্ঠ বালক দীঘলকে বুকে করে ওড়ার দাওয়ায় পাতা খেজুরপাতার চাটাইয়ের ওপর এনে শুইয়ে দিয়েছে। ঘুমোলে নাকি মানুষের ওজন অনেক বেড়ে যায়, কিন্তু ইস্পাতের কাছে কোড়া তো চির-দিনই পেঁজা তুলোর বস্তা—যতই বড় দেখাক না কেন, ভার তার কখনোই বাড়ে না।

মোষের পিঠের ওপর থেকে নামিয়ে আনা, দাওয়ায় শোয়ানো, কিন্তু এততেও দীঘলের ঘুম ভাঙেনি, অথচ তারপর মারাং গ' অবাক হয়ে দেখেছে, তার হাতের পাচনবাড়ি আগাগোড়াই দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা রয়েছে। একটা বিরাট জীবকে পরি-চালিত করছে, বাচ্চা কোড়া এ দম্ভটুকু কোনোমতেই ছাড়তে পারেনি। সেই দম্ভ ও জিদ দীঘলের আজও রয়ে গেছে।

আগাগোড়া ভেবেচিন্তে মারাং গ' স্থির বিশ্বাসে পৌছয়, দীঘলের কপালে সুখ নেই।

উনিশ

অম্বর রেলপথের কুলিকামিনের রাজ্যে আবার হড় সমাজের পাতড় এসেছে। পাতড়ার ঘোষণা বাহা কিছু স্বকর্ণে শোনেনি। কারণ এবারের সন্দে আগের মতো সোচ্চার নয়। তাই বাহা কেন, পাতড়ার খবর অনেকেই ঘোষকে মুখ থেকে জানতে পারেনি। তা ভিন্ন কোনো আতোর যোগমাঝি অথব পারাণিক পাতড়া নিয়ে অম্বরে আসেনি। পাতড়ার সঙ্গে বাজনাবাদ্যিও ছিল না

সন্ধের পর সর্দার গরভু মারান্ডী নিজের দলের হড় আর কুড়িদের একা নিভৃত স্থানে ডেকে জড়ো করল, 'খোবর তাহেনা—খবর আছে।'

'কিসের খবর?' অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে সপ্রশ্ন হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি নিজের মুখে হাত চাপা দেয় সর্দার গরভু মারান্ডী, নীরব থাকা

ইঙ্গিত করে, তারপর মৃদু স্বরে বলে, 'এবার সোহরায় পরবের আগে সব হড়্ আর কুড়িকে চুপি চুপি নিজেদের আতোয় ফিরে যেতে হবে। যে যার আতোয় গিয়ে সোহরায় পরব করবে। সেই সময় মারাং বুরু দর্শন দেবে।'

'মারাং বুরু দর্শন দেবে, কাকে দর্শন দেবে শুনি?' কৌতূহলের সঙ্গে ঈষৎ শ্লেষ মিশিয়ে কে যেন জিজ্ঞেস করে।

গরভু সর্দার গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, 'যে হড়্ হড়্ জেতকে ভালবাসে, দীকু মোগল আর সাহেবদের ঘেন্না করে।'

আবার প্রশ্ন, 'কুড়িরাও মারাং বুরুর দর্শন পাবে নাকি?'

এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সর্দার গরভু মারান্ডী একটু ইতস্তত করে, কারণ সৃষ্টির আদি পর্ব থেকেই মেয়েদের বেলায় দেবতাদের কাছে নিয়মবিধি সম্পূর্ণ আলাদা। তবু এখন বিশেষ এক পরিস্থিতি, কত যুগ পরে মারাং বুরুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা ঘোষিত হয়েছে, হয়তো এতদিনে দেবতাদের নিয়মও খানিকটা বদলেছে, তাই শেষাবধি কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা এনে সে বলে, 'হ্যাঁ, এবার মেয়েরাও মারাং বুরুর দর্শন পাবে।'

গোপন সম্মেলনের খবর পেয়ে মনের মধ্যে পরম কৌতূহল ও অঙ্গে সবিশেষ সাজগোজ করে বাহা সভায় এসে পৌঁছেছিল। তার পরনে দীকু মেয়ের মতো বান্ধেন কিচরি, যার নাম শাড়ি; যে জিনিস মাত্র একটি খণ্ড হওয়া সত্ত্বেও পায়ের গোড়ালি থেকে গলা অবধি জড়িয়ে ধরে, এমনকি দরকারের সময় পিঠের দিক থেকে তুলে মাথায় ঘোমটা দেওয়া যায়; দু-হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, কান আর গলায় পেতলের ঝলমলে অলংকার। উপরন্তু বোতলের সুগন্ধী তেল মেখে চুল বেঁধেছে সে। রঙীন ফিতে দিয়ে চুলের বিনুনি। এরপর আর সুবেশা হড়্ কুড়ির মতো মাথায় ফুল গোঁজার দরকার নেই, তবু পথে আসতে এক জায়গায় বেহায়া গাছের ঝাড় দেখে দুটো নীল বর্ণের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাও খোঁপায় গুঁজেছে।

মেয়েরা মারাং বুরুর দর্শন পাবে, কিন্তু তার সঙ্গে যে সর্ত, তদনুযায়ী বাহার ভাগ্যে সে দুর্লভ দর্শনের সম্ভাবনা নেই। কারণ সাহেব মোগল আর দীকুদের ঘেন্না করার কথা দূরে থাক্, অম্বরে আসার পর তার সর্বাঙ্গে ঐ তিন জাতের গন্ধ প্রায় পাকাপোক্তভাবে মেখে গেছে।

তবু লজ্জাহীনা বাহা কিন্তু সর্দারের কথা শুনে ফিক্ করে হেসে ফেলে, তারপর আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে মাথা দুলিয়ে প্রশ্ন করে, 'আমরা আতোয় ফিরে গেলেও

আর ওড়ায় ঢুকতে দেবে কেন, পরবের সময়েই বা কাছে যেতে দেবে কেন, আমাদের তো জেত চলে গেছে ?'

বাহার কথা শুনে সর্দার গরভু মারান্ডী সরোষে বলে, 'হড়ের জেত কখনো যায় না।'

বিতর্কের সুরে বাহা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'হড়েরই তো কথায় কথায় জেত চলে যায়, তাকে সমাজ থেকে বের করে দেয়।'

তা সত্যি; এ অভিযোগ ও অপবাদ অস্বীকার করার উপায় নেই। সর্দার এবার ঘুরিয়ে বলে, 'আর হড়ের জেত যাবে না, সোহরায় পরবের দিন থেকে সব হড়্ আবার এক জেত হয়ে যাবে। মারাং বুরু সির্সিজাওই যেমন পিলচু কোড়া আর পিলচু কুড়িকে সৃষ্টি করেছিল, তেমনি পবিত্র সব হড়্ আর কুড়ি।'

এ কথা শোনার পর চতুর্দিক থেকে খানিকটা আশা ভরসা সমন্বিত প্রশ্ন উঠল, 'কে বলল এ কথা, আতোয় ফেরার পাতড়া কে নিয়ে এসেছিল, কার সঙ্গে পাতড়া বাহকের দেখা হয়েছিল, কথাবার্তা হয়েছিল ?'

এতগুলি প্রশ্ন শোনার পর সর্দার গরভু মারান্ডী কিছুক্ষণ নীরব থেকে উত্তর-সমূহ নিজের মনে গুছিয়ে নেয়, তারপর জবাব দিতে আরম্ভ করে সে। অবশ্য সম্পূর্ণ তথ্য সে নিজেও জানে না। দিন দুই আগে চারজন হড়্ এসেছিল অম্বরে। তারা আতো ভাগনাডিহির হড়্ সিধু কানহুর কাছ থেকে খবর এনেছে যেখানকার যত হড়্ কুলিকামিন সকলেই যেন সোহরায় পরবের আগে নিজের নিজের আতোয় ফিরে যায়, সোহরায় পরবের দিন মারাং বুরু তাদের দর্শন দেবে।

সিধু কানহুর বাণী নিয়ে যে চারজন হড়্ অম্বরে এসেছিল তাদের একজনের নাম দীঘল টুডু। আতো ভাগনাডিহির হড়্ বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছিল সে। সেই দীঘল টুডু নামের হড়্টি বলেছিল, সিধু কানহুই নাকি হড়্ সমাজের নতুন রাপাজ। মারাং বুরু তাদের সমাজ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে রাজা করে ধারতিতে পাঠিয়েছে।

সিধু কানহুর নামও গরভু সর্দারের অজ্ঞাত নয়, আরও অনেকেই শুনে থাকবে। আতো ভাগনাডিহিতে মুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধের পর তাদের নাম ও বীরত্বের পরিচয় সারা দামিন এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

একান্ত মনোযোগের সঙ্গে বাহা সর্দারের কথা শুনছিল, কিন্তু দীঘলের নামটা তার কানে যাওয়ার পর সমগ্র চেতনা একটিমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে ঘুরতে

লাগল। দীঘল এসেছিল অম্বরে, তার প্রাণের বন্ধু সিধু কানহুর দূত হয়ে, অথচ সে বাহার খোঁজ করেনি, তার সঙ্গে দেখা করেনি! কিন্তু দীঘল তো জানত বাহা কোথায় আছে?

অম্বরে রেলের কাজে আসার পর বাহা দীকুদের রেশম বা লাক্ষা চাষে কামিন খাটতে যায়নি, নীলকুঠির সাহেব বাড়িতেও কাজের সন্ধানে ছোটেনি। রেল কোম্পানীতে কাজের নাম করে আরও কয়েকটি মেয়ে পুরুষের সঙ্গে আতো থেকে বেরিয়েছিল সে, তারপর প্রায় বছর দুই ঘুরে গেলেও খুঁটি তুলে অন্যত্র চলে যায়নি, একই জায়গায় রয়ে গেছে। ভাগনাডিহির আর সব হড়্ আর কুড়ি যে যার নিজের সুবিধেমতো কিছুদিন পর থেকেই স্থানবদল করেছে, কেউ বা একবার অন্য জায়গায় গিয়ে আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু বাহা কিস্কুর একদিনের জন্যেও স্থান বা কাজের পরিবর্তন হয়নি।

এমন স্থাণু বাহাকে ইচ্ছে হলে খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে দীঘলের অসুবিধে ছিল না। যে কেউ এক নিমেষের মধ্যে আঙুল তুলে তাকে দেখিয়ে দিতে পারত। দীঘল কি তাহলে এই দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে গেল? বাহার মনে হঠাৎ একটা ব্যগ্র কৌতূহল, অথচ ব্যঙ্গময় বিদ্রূপ জেগে ওঠে।

মনের সংকোচ বিসর্জন দিয়ে সর্দারের দিকে সারাসরি চোখ তুলে বাহা জিজ্ঞেস করে, 'আতো ভাগনাডিহির দীঘল টুডু এখানকার কারো খোঁজ করেনি?'

'না।' পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আকাশের দিকে মুখ তুলে এক গলা চুটির ধোঁয়া উগলে দেওয়ার পরে গরভু সর্দার ঘাড় নাড়ে, 'তারা তো হয়োদাঃর মতন এল আর তেমনি করে চলে গেল; বললে এক পক্ষের মধ্যে তাদের সারা দামিন ঘুরে আতোয় ফিরতে হবে।'

ওঃ, এটুকুও বাহার কিঞ্চিৎ শান্তি, দীঘলের হাতে সময় ছিল না মোটেই! মনে মনে আর এক বিশেষ ব্যাপারে স্বস্তিলাভ করে সে, আজও দীঘলের বাপলা হয়নি, ঘাড়ের ওপর রিণিঃর বোঝা থাকলে সিধু কানহুর দূত হয়ে সারা দামিন চষে বেড়াবার জন্যে সে আতো থেকে বার হত না। এ ধরনের বিদঘুটে শখ আর পাগলামী ডাঙোয়াদেরই মানায়, যারা চিরকেলে আইবুড়ো আর ঘোর দায়দায়িত্বহীন মানুষ।

আকাশের গায়ে লিপ্ত ক্ষীণ চন্দ্রকলা এবং অসংখ্য নক্ষত্রসমষ্টির আলো-আঁধারিতে পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে সর্দার গরভু মারান্ডীর মনও

নিজের আতোর চিন্তায় মোহমুগ্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু অন্তরের সেই সাগ্রহ লোলুপতা ঢেকে উপস্থিত সবার উদ্দেশে একটিমাত্র প্রশ্ন ছুড়ে দেয় সে, 'সোহ্‌রায় পরবের আগে কে কে নিজের আতোয় ফিরতে চায়, তারা উঠে দাঁড়া।'

সবাই! অনেকগুলি উপবিষ্ট শিলাখণ্ড হঠাৎ যেন স্থির সংকল্পিত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ওঠে, তার মধ্যে একা বাহা কিস্কুই কেবল অনড়।

'আচ্ছা বসে পড়্ তোরা।' দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষ আর মেয়েগুলিকে বসতে বলার পর সর্দার গরভু মারান্ডী বাহার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে, 'কি রে বাহা মেঝেন, তুই আতোয় ফিরবি না?'

সর্দারের সবিস্ময় জিজ্ঞাসার উত্তরে বাহা ম্লান হেসে ঘাড় নাড়ে, 'না, আমি যাব না। আমার কোনো আতো নেই, ওড়া নেই, জাওঞাই নেই। আমি রেঞেচ রাণ্ডি—ভিরারিনী বিধবা।'

যে হড়্ আর কুড়িরা পাদ্রী বুড়োদের ভালবাসার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে গির্জের খাতায় নাম লিখিয়েছে তাদের সম্বন্ধে একজন হড়্ প্রশ্ন তোলে, 'যীশুর হড়্ গিদরেরা আতোয় ফিরবে না?'

'না।' শঙ্কিত চোখে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে সর্দার গরভু মারান্ডী সবাইকে সাবধান করে দেয়, 'যীশুর গিদরেরা সব সাহেবদের সেতা, ঐ কুকুরগুলোর কানে যেন এ সমস্ত কথাবার্তা একেবারেই না যায়। আমরা সবাই একদিন হোয়োদাঃর মতন এখান থেকে উবে যাব।'

ঠিক এমনি করেই হড়্ চিরদিন তার সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ছেড়ে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে উবে গেছে, পেছনে কোনো নিদর্শন রেখে যায়নি, এমনকি সব সময় এই বিদায়ের স্থির – নির্দিষ্ট কারণ পর্যন্ত দর্শায়নি।

হড়্ মানে হোয়োদাঃ—ঝড়।

বাহা হঠাৎ বিদ্যুৎস্পর্শিতার মতো ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ফসলভরা মাঠের দিকে হন্ হন্ করে হাঁটতে আরম্ভ করল। কোথায় যাচ্ছে, কেনই বা, তা নিজেও বোধহয় ভাল করে জানে না সে।

বাহার পেছন থেকে একটি কামিন মেয়ে হাঁক দিয়ে ডেকে উঠল, 'অতে ও বাহা কোথায় চললি তুই?'

এক মুহূর্তের জন্যে বাহা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, কি চিন্তা করে যেন, তারপর পেছন পানে তাকিয়ে জবাব দেয়, 'আমার পুরনো আতো ভাগনাডিহি।' বলার পরই খিলখিল হাসি হেসে আবার আগের মতোই এগিয়ে চলল সে।

এবার বাহার গতিভঙ্গিমা আরও সতেজ, প্রতিটি পদক্ষেপে স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হচ্ছে যেন!

সে রাত্তিরে মনের অস্থির ভাব নিয়ে বাহা কিস্কু অনেকখানি পথ একা চলে গিয়েছিল, যেন আতো ভাগনাডিহির রাস্তা ধরে হেঁটে দেখছে কোথাও কেউ নিষেধ অথবা প্রতিরোধ দেবার আছে কিনা। আর এইভাবে বিবিধ চিন্তায় ভারগ্রস্ত মনটাকে অবশেষে স্থির সংকল্পে গুছিয়ে নিয়ে প্রায় শেষ রাতের কাছাকাছি অম্বরে নিজের কামিন ডেরায় ফিরে শান্তিপূর্ণ অচেতন ঘুমে ডুবে গিয়েছিল সে, পরের দিন আর হাজরিতে যেতে পারেনি।

এই হাজরি আর কামিন ডেরার মেয়াদ আর কটা দিনই বা? কপালে যাই থাক্ সিধু কানহুর ডাকটাকে উপলক্ষ্য করে এখানকার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাহাকে একবার আতো ভাগনাডিহি ফিরতেই হবে। কিন্তু তারপরও একটা সংশয় থেকেই যায়, সেখানে গিয়ে কোথায় উঠবে সে? বছরখানেক আগে দীঘলের ওড়ায় বিটলাহা হয়ে গেছে, তারপর সে কি আর নতুন ওড়া তুলতে পেরেছে? সামর্থ্যে কুলোলেও কিসের উৎসাহে সে ওড়া তুলবে, কে আছে তার?

মারাং গ' রতনী মেঝেন হয়তো নিজের বাপের বাড়ি আতো তালঝারিতে ফিরে গেছে। আর ওড়াহীন বাউণ্ডুলে দীঘল টুডু সিধু কানহুর হয়ে সারা দামিন চষে বেড়াচ্ছে। তবু ভাগনাডিহিতেই ফিরবে বাহা, শ্বশুর ভোগন টুডুর মরা ভিটে চিনে নিয়ে সেখানেই নতুন ওড়া তুলবে। এক্ষেত্রে তার একার সামর্থ্যই যথেষ্ট, কারণ সঞ্চয়ের তিনশ' টাকা তিনটে আতোর তিরিশটা হড়ের সাধ্যের সমান।

অন্যান্য কামিন মেয়েরা প্রতিদিন শ্বেতাংবেরে এসে ডাক দিয়ে যায়, 'অতে বাহা মেঝেন, দেলা—চল্ বাহা মেঝেন, কাজে চল?'

বাহার দৈনন্দিন একই উত্তর, 'না, যাব না, আমার শরীর খারাপ।'

কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উদ্বেগের ভাব এনে একজন সঙ্গিনী প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে তোর, রুয়ঃ নাকি—জ্বর হয়েছে বুঝি?'

বাহা অলস দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর অনিচ্ছুক গলায় বলে, 'হ্যাঁ, রুয়ঃ।'

তারপর ঐ বিশ বাইশটি মেয়ে কোমর জড়াজড়ি করে ভালবাসা ও বিরহের গান গাইতে গাইতে রেল ইস্টিশানের দিকে চলে যায়। আর বেশিদিন বাকি নেই, খুব শিগগিরই অম্বরের সাধের কয়েদ থেকে যে যার আতোয় ফিরবে, এই

সময়টা হাতে কিছু পয়সা থাকার খুবই দরকার। সুদিনে কখনো তো সঞ্চয়ের কথা মনে পড়ে না। শহরে আসার পর এই এক নতুন শিক্ষা, পয়সা চাই, হাতে কিছু এসে পড়ার পর সে চাহিদা আরও বেড়ে যায়, তারপর অনেক অনেক চাই।

পয়সা আকাঙ্ক্ষিনী সঙ্গিনীরা পয়সার জগতের উদ্দেশে বিদায় নেওয়ার পর বাহা কিন্তু চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে। শীতের আমেজ এখনো অবধি কিছুটা রয়ে গেছে, সকালের দিকে রোদের কোলে অলস ও অকারণে শ্রান্ত গা ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একটু পরেই উপলব্ধি হয় ধীর পায়ে বসন্তের আবির্ভাব হচ্ছে।

সদ্য ফসল কেটে নেওয়া মাঠগুলো অবশ্য নিরালা, কিন্তু চারিদিকেই পলাশ আর শিমুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। বাতাস টেনে ঘ্রাণ নিলে দূর থেকেও মহুয়া ফুলের মাদক সৌরভ নাকে আসে।

এখন কৃষ্ণপক্ষ।

সর্দার গরভু মারান্ডী বলেছে শুক্লপক্ষের সপ্তমী অথবা অষ্টমী তিথিতে এখানকার ডেরা উঠবে, সবাই তিন পক্ষকালের ছুটি চাইবে। ছুটি পায় ভাল, নয়তো বলবে, তোদের চাকরি তোরাই কর সাহেব, আমরা নিজেদের আতোয় ফিরে চললাম!

সাহেব ঠিকেদারের দিশি দীকু চর বোধহয় এই ষড়যন্ত্রের কিছুটা আঁচ পেয়ে যথাস্থানে খবর পৌঁছে দিয়েছে, তাই সাহেবও হঠাৎ মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরুষের এক আর কুড়ির দৈনিক আধ পয়সা বেশি। আর সর্দারের ডবল পয়সা। বাড়তি মজুরি সবাই হাসি মুখে ও হাত পেতে গুনে নিচ্ছে, কিন্তু সপ্তমী কি অষ্টমী তিথিতে হপ্তা পাওয়ার পর বিশেষ কেউ আর ঐ বাড়তি মজুরির লোভে এখানে টিঁকে থাকবে না।

এবার নাকি সোহরায় পরবের সময় ঠিকেদার সাহেব সব কুলি কামিনকে ধুতি শাড়ি আর মদ খাবার জন্যে নগদ আটআনা করে বকশিশ দেবে, কিন্তু বাহা জানে লোভ দেখিয়ে হড়্‌কে বশ করা যায় না। তাকে সত্যি সত্যি হাতে রাখতে হলে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে হয়। আর মানুষের সমান মান দিতে হয়।

হড়্‌ মানে বন্ধনহীন ঝড়!

সপ্তমীর বিকেলে হপ্তা। সে হপ্তা মেলায় বাহা যায়নি। দু-সপ্তাহ থেকে তার আর এসব বালাই নেই। ওরা সবাই যখন শনিবারী হপ্তা নিতে গেছে, বাহা

তখন চুপি চুপি সেই গোপন জায়গায় গিয়ে মাটি খুঁড়ে নিজের গুপ্তধন তুলে এনে মস্তবড় ধামার ভেতর পুঁটুলি বেঁধে রেখেছে।

আতো ছেড়ে অম্বরে আসার সময় একপ্রস্থ অতিরিক্ত পরিধেয় ছাড়া কিছুই সঙ্গে আনেনি বাহা কিস্থ, তবু দু-বছরে কত জিনিসের বিপুল সঞ্চয় খেজুরপাতা ছাওয়া এই ছোট্ট কুঠলির ভেতর হয়ে গেছে, সব কি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ?

পথে বনবাদাড়, পাহাড়ীদের উপদ্রব, এসব সামলে তেরো ক্রোশ পথ হাঁটতে অন্ততপক্ষে পাঁচটা দিন। রাত্তিরে হড়ের আতো খুঁজে নিয়ে বিশ্রাম, আর বিশ্রাম মানেই অতিথি ও আতিথ্যমানকারীর পরস্পরের সাহচর্যে আনন্দানুষ্ঠান। এবং দিনের বেলা বিপদময় পথ অতিক্রম।

তবে বিরাট ভরসা হড়ের তীরকে বনের বাঘ বরাহ ভয় করে, মাদলের শব্দ কানে গেলে বুনো হাতির পাল পাঁচ ক্রোশ দূরে পালিয়ে যায়, বিরাট বপু অজগর অন্যতম একটি বৃক্ষকাণ্ডের মতো গাছের গুঁড়িতে গা মিশিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে। আর পাহাড়ীদের তো বিশেষ গুণগৌরব, দিনের বেলা তারা মেষের চেয়ে নিরীহ, শুধু রাত হলেই স্বভাবের হীন সর্পিলতা প্রকাশ পায়।

অম্বরে এসে সংগ্রহ করা বোঝা অম্বরেই পড়ে থাকুক, এই মনোভাব নিয়ে অধিকাংশ জিনিস বাদছাদ দিয়েও বাহার ধামার প্রায় আধ মণ বোঝা। তবে এক মণই এখন তার অতি স্বাভাবিক বহন ক্ষমতা। এক মণ মাটি বা পাথরভর্তি টুকরি মাথায় নিয়ে সারাদিন ছুটোছুটি করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, বিশেষ অবসর ও বিশ্রাম না পেলেও ক্লান্তি জাগে না আর।

কি সঙ্গে নেবে, কি বা ফেলে রেখে যাবে, তা বারবার বাছাই করতে সময় কেটে গেছে, তবু সকলে হপ্তা নিয়ে ডেরায় ফেরার আগেই বাহার সব গোছগাছ সারা। প্রস্তুত পাজোড়া যেন ডেরার বাইরে এগিয়ে রয়েছে তার।

সর্দার গরভু মারান্তী একবার এসে বাহার কুঠলিতে উঁকি দিল, 'অতে বাহা মেঝেন ?'

'এই যে আমি !' বাহা বেরিয়ে এসে সর্দারের সুমুখে দাঁড়াল। তার মুখের ওপর দিয়ে অপরিসীম খুশির বন্যা বয়ে গেছে যেন !

গরভু সর্দার স্মরণ করিয়ে দেয়, 'কাল চোরখেদা তারা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অম্বর ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

বাহা হেসে সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য স্বরে প্রশ্ন করে, 'আমার আতো তো আছে, কিন্তু ওড়া নেই, আমি কোথায় গিয়ে উঠব ?'

গম্ভীর মুখভঙ্গি করে গরভু সর্দার উত্তর দেয়, 'আতোয় ফিরে গিয়ে আবার ওড়া বেঁধে নিবি। হড়ের ওড়া রোজ ভাঙে আর রোজ গড়ে ওঠে। তোদের আতো নাইকীর মুখে এ গল্প কি কখনো শুনিসনি তুই ?'

'শুনেছি, অনেকবার শুনেছি, তাই তো সাহস করে আবার আতোয় ফিরে যাচ্ছি।' বাহা ঘাড় নেড়ে পরম আস্থাভরে উত্তর দেয়, সন্ধের আঁধারেও তার চোখজোড়া আবার আলোয় চক্‌চক্ করে ওঠে।

এ তো কোনো নতুন পর্যায়ের গৃহপ্রবেশ নয়, যেন কিছুদিন বাইরে বেড়িয়ে এসে আবার পুরনো ওড়াতেই ঢুকছে বাহা কিস্কু। ভোগন টুডুর আমলের সে ওড়ার রূপ অবশ্য বদলে গেছে। এ নতুন ওড়া আগের তুলনায় অনেক ছোট, পুরনো দরাজ হাতের ছাপ কোনোখানেই নেই।

সেটা ছিল সুখী হড় পরিবারের বসতবাটি, আর এ যেন পথচারী বেদের তৈরি সাময়িক নিবাসের জন্যে তৈরি অস্থায়ী ডেরা। তবু মন্দের ভাল, দুটো কুঠলি অন্তত তুলেছে দীঘল। আর এক সারিতে দো-কুঠলির সুমুখে ওসারা একখানা। তবে দেখেশুনে মনে হয় সবই যেন বেগার ধরে করানো।

আতো ভাগনাডিহি পৌছতে দুপুর। যদিও সর্বত্রই প্রায় গাছের ছায়ায় ছায়ায় রাস্তা, তবু নিরন্তর চড়াই আর উৎরাই ভাঙা পথশ্রমের দরুন বাহার মুখ ঘাড় গলা ও বুক গলিত ধারার স্বেদ বিন্দুতে ভেসে গেছে।

মাথার ওপর থেকে আধমণী ধামা ওসারার ওপর নামিয়ে রেখে বুকের পাঢ়ান খুলে মুখ ও গা মুছতে মুছতে বাহা মেঝেন ইতিউতি তাকাতে লাগল। পথে আসার সময় দলের সঙ্গী হড়্‌রা সদ্য ফসল তুলে নেওয়া মাঠ থেকে অনেকগুলো মোটাসোটা মেঠো ইঁদুর শিকার করেছিল, বাহাকেও দিয়েছিল চারটে।

দীঘলের কথা মনে করে বাহা মরা ইঁদুরগুলো সযত্নে পুঁটুলি বেঁধে রেখেছিল, সেটিও সে সন্তর্পণে এক পাশে নামিয়ে রাখল। ধীমে আঁচে পোড়ানো ইঁদুরের মাংস পেলে দীঘল হয়তো তখুনি এক ভাঁড় মদ নিয়ে তোয়াজ করে খেতে বসে যাবে। আগে তো সে একটু ভালমন্দ খেতে পেলে ছেলেমানুষের মতোই আনন্দ করত, এখনো বোধ হয় তার সেই স্বভাব একেবারে বদলে যায়নি।

কিন্তু বাহা এতক্ষণ এসে বসেছে, কারো দেখা নেই, ওড়া তো খালি মনে হচ্ছে, কেউ কোথাও আছে কি ? তাছাড়া আজকাল কে-ই বা ওড়ায় থাকে সে ধারণা বাহার নেই। এইজন্যে তার পুরনো অধিকারের জায়গা হলেও প্রথমটা

একটু অস্বস্তি লাগছিল বইকি, আর নিজের অজ্ঞাতেই মুখের ওপর একটা সলাজ ভাবও ফুটে উঠেছিল।

'আরে, বহু এসে গেছে য়ে!' বেশ আনন্দে কলরব তুলে মারাং গ' রতনী মেঝেন এগিয়ে এল।

শাশুড়ী বাইরে কোথাও গিয়েছিল, তাকে ওড়ায় এসে ঢুকতে দেখে বাহা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তারপর মারাং গ'র কাছে গিয়ে সুমুখপানে কোমর ঝুঁকিয়ে ডান হাতের একটি পাতা মুঠি করে কপালের মাঝখানে ঠেকিয়ে প্রণাম করল, এবং ঈষৎ সলজ্জ, কিন্তু হাসিভরা শ্রান্তিচিহ্নিত মুখে বলল, 'জোহার গ' — প্রণাম মা।'

বাহার অবনমিত পিঠে দু-হাত ঠেকিয়ে মারাং গ' আশীবাদ করে, তারপর তার কপালে সাদর চুম্বন দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছিস বহু ?'

'ভাল গ'।' বলতে বলতে বাহা ওসারার কাছে ফিরে এসে যথা সত্বর ধামা উজাড় করে একজোড়া নতুন শাড়ি বের করে মারাং গ'র হাতে দিয়ে হাসিমুখে বলে, 'গ', এর নাম শাড়ি, বিলিতি কলে তৈরি, দীকু মেয়েরা পরে। তুই এখুনি এই বাহ্নেনকিচরি পরে দেখ তো গ,' কেমন সুন্দর মানাবে তোকে ?'

বাহা বুঝি জানে না, কিন্তু ইতিপূর্বে এ আতোয় বাহ্নেনকিচরি আমদানী হয়েছে, দু-একজন অল্পবয়িসী মেয়েকে পরতে দেখেছে মারাং গ' রতনী মেঝেন। বাবাঃ, এ কি পোশাকের বহর, পায়ের পাতা থেকে নিয়ে মাথার ওপর অবধি সাপের মতো জড়িয়ে ধরে ; পরবে কে, দেখেই তো দম বন্ধ।

শাড়িজোড়া হাতে নিয়ে মারাং গ' সন্দেহে বলে, 'বহু, তুই দিচ্ছিস আমিও হাত পেতে নিচ্ছি, এ কিন্তু তোকেই পরতে হবে। আমার বয়েসে বাহ্নেনকিচরি মানায় না, পরলে সারা আতোর হড়্ আমায় দেখে হাসবে।'

বাহা কিন্তু কপট রাগ দেখিয়ে উত্তর দেয়, 'দেখি তো কটা হড়্ হাসে ? কে বললে তোকে মানাবে না ?'

বাহা নিজে অবশ্য এখন হড়্ মেয়ের পোশাকেই আতোয় ফিরেছে, দীকু মেয়ের সাজে ওড়ায় ঢুকতে দেখলে কে কি ভাবে নেবে এই কথা ভেবে। তাছাড়া সর্বাঙ্গে এতখানি কাপড় জড়িয়ে বুনো পথে হেঁটে আসা সহজ নয়। যেখানে যেমন।

রতনী মেঝেন বলে, 'এবার রাখ তোর কাছে, এ কিচরি তুই-ই পরিস বহু।'

শাড়ি ফেরত নেয় না বাহা, উত্তর দেয়, 'আমি তো পরিই, আর অম্বরে একে-

বারে থুথ্‌ুড়ে হড়্‌ বুঢ়ী পর্যন্ত বান্ধেনকিচরি পরে মেলায় যাচ্ছে, হাট বাজার করছে। মাত্র এক টাকা জোড়া, কত সস্তা আর কত বড় বল তো ?' তারপর এতক্ষণ চেপে রাখা প্রধান আগ্রহের জায়গায় এসে সে প্রশ্ন করে, 'তালা এরোয়েল কোথায়, তাকে তো দেখছি না ?'

'কোথায় আর ?' অবজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ মারাং গ' ঠোঁট উল্‌টোয়, 'এক দেড় মাস বাইরে বাইরে কাটিয়ে পাঁচদিন হল আতোয় ফিরেছে। অম্বরেও তো সে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলল, বাহা হিলি অম্বরে নেই, নতুন বাপলা করে কোথায় যেন চলে গেছে।'

'কি বলল তালা, নতুন বাপলা করে—!' বলতে বলতে বাহা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে, তারপর হাসি সামলে নিয়ে অভিযোগ করে, 'তালা তো অম্বরে গিয়ে আমার খোঁজও শুনি করেনি, আমাদের সর্দার বলল। আমি ভাবলুম বুঝি—'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বাহা, ইতিমধ্যে দীঘল এসে ওড়ায় ঢুকল, তারপর বাহার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'মাঝিস্থানে খবর পেলুম তুই এসেছিস, তাই তাড়াতাড়ি ওড়ায় ফিরে এসেছি।'

বাহা ঝগড়া করার জন্যে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, পরিবর্তে স্থির চোখে দীঘলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সে। এ যেন আগেকারই সেই দীঘল, তার মাঝখানের আকস্মিক পরিবর্তন এখন প্রায় কেটে গেছে। হড়্‌ মানে পাহাড় নয়, সমুদ্র নয় ; পরিবর্তন তো তার হবেই। দীঘলেরও ততটুকুই বদলেছে যেটুকু না হলে জ্যান্ত মানুষকেও মড়ার সামিল মনে হয়। মৃতের পরিবর্তন নেই। আতোর এক জায়গায় একটা মরা শালগাছ বছরের পর বছর একই রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাইনী খাওয়া গাছ ভেবে ভয়ে কেউ আর সে মড়া ছোঁয় না।

বিস্ময়হীন অথচ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দীঘলের দিকে তাকিয়ে থেকে বাহা মারাং গ'কে প্রশ্ন করে, 'তালা এখনো বাপলা করছে না কেন, আর কবে করবে ?'

মারাং গ'কে প্রশ্ন করলেও বাহা যেন কথাটা দীঘলকেই জিজ্ঞেস করে, কিন্তু দীঘল উত্তর এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

বাহার জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে মারাং গ' আগেকার মতোই অনীহাভরে উত্তর দেয়, 'আগে তো বলত বাপলাই করবে না, এখন আবার নতুন কথা শুনছি, হড়ের দেশে স্বাধীন রাজা হলে তারপর। তবে আর কিছু করতে পারুক বা না পারুক, এরা যে তোদের আতোয় ফিরিয়ে আনতে পেরেছে তাই ঢের।'

তা ঠিক ! আতো গোকুলপুরে সোহরায় পরব দেখতে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বাহার মনে পড়ে যায়। সে সময় ঐ আতোর হড়্ আর কুড়িরা তাদের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তারপর কারো আর সে সমাজের প্রতি দরদ থাকে না। কিন্তু এই মুহূর্তে বাহা আতো গোকুলপুরের সমাজকেও মনে মনে ক্ষমা করল। ভবিষ্যতে সে যদি আবার অম্বরে ফেরে তবে আর একবার আতো গোকুলপুরের দিকে যাবে। সেটাও তো তার স্বজাতি হড়েরই আতো !

সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বাহা এবার বলে, 'গ', আমি একটু পোখরীতে যাচ্ছি, এখুনি ফিরে আসব।'

দীঘল ওপরপড়া হয়ে এগিয়ে আসে, 'চল্, তোকে পোখরীর রাস্তা চিনিয়ে দিয়ে আসি।'

বাহা হাসে, দীঘলের অনাবিল ব্যঙ্গের জবাব দেয় সে, 'একবার যখন আতোর রাস্তা চিনে ফিরে আসতে পেরেছি, তখন আর কিছুই চিনিয়ে দিতে হবে না, এবার না মরা পর্যন্ত এখানেই থাকব।'

আর দেরি না করে বাহা পোখরীর উদ্দেশে ওড়া ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কুড়ি

দামিনঈকোহ্‌র দেড় হাজার বর্গমাইল এলাকার মধ্যে শিথিল বনানী এবং অনুচ্চ পর্বতমালা পরিবেষ্টিত অতি ক্ষুদ্র এবং সবদিক থেকে নগণ্য আতো ভাগনাডিহি, সিন্ধুর মাঝে বিন্দুবৎ কিন্তু অচিরাৎ তার পরিধি গাম্ভীর্য আভিজাত্য আর কার্যকরিতা যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে। হড়্ সমাজের কাছে আজ আতো ভাগনাডিহি অসীম আকাশের বুকে নির্দিষ্ট দিক্‌চিহ্ন ধ্রুবতারার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের সমাবেশ অভূতপূর্ব। দশ হাজারের অধিক যুদ্ধসাজে সজ্জিত বহিরাগত হড়্‌কে আতিথ্যদান করে তেমন জায়গা আতো ভাগনাডিহির মাঝিস্থান বা হাটে বাজারে নেই। তবু নিয়ত প্রবহমান রণদামামা জানান দেয় আতো ভাগনাডিহির উদ্দেশে ধাবিত উৎসাহী মানবস্রোত এখনো অব্যাহত।

মাঝিস্থানের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মাঠ, সামাজিক এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে যার ভূমিকা সর্ব-প্রধান, কিন্তু আজ যেন অজস্র মানুষের ভিড়ে তার রূপ অসহায়

অস্তিত্বহীনতায় পরিণত হতে চলেছে। মানুষের প্রবল চাপে অসীম দিগন্ত পর্যন্ত দিশাহারা।

এই মাঠের দিকে তাকিয়ে নিনকী মেঝেন শিউরে ওঠে যেন, 'ওঃ, এত হড়্ সব কোথা থেকে আসছে রে বাহা বহু? ধারতিতে কি শুধু হড়্ই আছে, আর কোনো জাতের মানুষ নেই?'

'কেন, দীকু আছে, মোগল আছে, সাহেব আছে?' ব্যঙ্গের স্বরে বাহা উত্তর দেয়, তারপর সোৎসাহে নিনকী মেঝেনের হাত চেপে ধরে স্বর বদলে নিয়ে পুলকিত, কিন্তু অহেতুক চাপা গলায় বলে, 'তুই দেখছিস কি, আরও অনেক—অনেক হড়্ আসবে। সিঞচান্দো আর ইন্দাচান্দোবাবার পেট চিরে হড়ের সমুদ্র বেরিয়ে ধারতি ছেয়ে ফেলবে।'

এদেরই সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল নীতু মেঝেন, নিনকী মেঝেনের অলক্ষ্যে বাহার গায়ে নিজের অঙ্গের মৃদু ধাক্কা দিয়ে ঠাট্টা করে সে, 'এসব কথা তোকে কে বলেছে রে, সেনাপতি বুঝি?'

সেনাপতি অর্থাৎ দীঘল। আসন্ন যুদ্ধ শেষহওয়ার পর বাহার সঙ্গে যে তার বাপলা হবে, সে কথা এ আতোর আর কারো অবিদিত নেই। কারণ বাহার জীবনে গড়ম পর্ব আজ অবধারিত ভাবেই বিগত ইতিহাস।

ভাগলপুরের খবর, গড়ম এখন তারই মতো নতুন মেথর সম্প্রদায়ভুক্ত এক হড়্ রমণীকে নিয়ে পরম সুখে সংসার করছে। অবশ্য কারাজীবনও চলছে তার, তবে সে কয়েদের অর্থ জায়া-পুত্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নয়। কয়েদী পালিয়ে না যায় এবং সরকারি কর্তব্য নিয়মিত পালন করে, এইটুকুই পাহারা আর নিষেধের বেড়ি।

গড়মের গিদরে হয়েছে একটা, কুড়ি গিদরে, সে জন্ম সূত্রেই মেথরানী, বড় হয়ে ওঠার পর তার কোথাও কোনো অভিযোগ থাকবে না। হড়ের নাড়ি ছিঁড়ে বেরুলেও সে মেয়ে আর হড়্ নয়। তার জাত মেথর।

নীতু মেঝেনের কৌতুকে আপ্লুত বাহা তার কথার উত্তর দিতে যাচ্ছে, ইতিমধ্যে সরবে ভেরী বেজে উঠল। মাঝিস্থানের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে একজন হড়্ আকাশের দিকে মুখ তুলে ভেরী বাজাচ্ছে। সম্পূর্ণ নীরব থাকার ইঙ্গিত। অনড় নির্দেশ।

বাহা চেনে না এ ভেরীবাদককে। আতো ভাগনাডিহির হড়্ নয়। সে শুধু একজন হড়্, এইমাত্র তার পরিচয়। এর চেয়ে বড় বিজ্ঞপ্তি আজকাল আর

কোনো হড়ের নেই। দুনিয়ার একদিকে হড়্, আর অন্যদিকে পৃথিবীর বাদবাকি যত মানুষ।

সোহরায় পরবের সময় থেকে কত হড়্ই তো প্রতিদিন এ আতোয় আসছে! ওড়ার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে বাহার মনে হয় হঠাৎ সে কোনো নতুন আতোয় গিয়ে পড়েছে যেন। সবই নতুন মুখ আর অসংখ্য মুখের মিছিল। তবে চেনা হোক অচেনা হোক, সবাই অতি নিকট আত্মীয়, এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কারণ তারা হড়্।

হড়্ মানে ঘন সন্নিবিষ্ট মানবতার দুর্ভেদ্য গড!

পাহাড়ীরা তো কোন্‌কালে এ আতোর পথ ভুলে গেছে, হাটে আসা দূরের কথা, ফসলের ভাগ আদায় করতে আসার দুঃসাহস পর্যন্ত তাদের আর নেই। দীকুরাও তাই। আগে মহাজনের চর আসত, দালাল এসে জুটত, এখন আর তারা ভয়ে এদিকে পা বাড়ায় না। আতো ভাগনাডিহি মানে হড়ের পৃথিবী। দুনিয়ার অন্য কোনোখানে যদি মানুষ নামের আর কোনো জীব থাকে তাদের পক্ষে আতো ভাগনাডিহি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ পুরী।

মাঝিস্থানের বেদীর ওপর ক'জন হড়্ উপস্থিত। সিধু কানহুদের চারটি ভাই তো আছেই, উপরন্তু দীঘল ও আরও কয়েকটি হড়্। প্রত্যেকের মুখাবয়বে গাঢ় গাম্ভীর্য। এতখানি বয়েস, তার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা নিয়েও বাহা ইতিপূর্বে কোনো হড়ের মধ্যে এমন ধরনের গাম্ভীর্যের সাক্ষাৎ পায়নি।

হড়্ মানে তো সরলতার ঘর!

এখন কিন্তু ওদের যে কোনো একজনের দিকে তাকালে ভয় আর আতঙ্কে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে যায়। ওদের চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত যেন বুকের প্রাণকেন্দ্রে বিষাক্ত তীরের মতো বিঁধছে। ওদিকে তাকানো যায় না, তবু ময়াল সাপের দৃষ্টির ফাঁদে পড়ে যাওয়া আতঙ্কগ্রস্ত চোখ দুটো দিয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়; এমনি বাধ্যবাধকতা!

সিধু নিজের ঈশ্বর দর্শনের অভিজ্ঞতার বিবৃতি দান করছে। ঠাকুরজিউর সাক্ষাৎ আবির্ভাব। পোণ্ড রাপাজের মতো গৌরকান্তি, প্রতিটি হাতে দশটা করে আঙুল, পরনে হড়ের পোশাক।

ঠাকুরজিউর সঙ্গে দুই দেবানুচর। অঙ্গে অবয়বে হড়্, কিন্তু দুটি হাতেই অঙ্গুলী সংখ্যা ছয়। মাথায় তাদের হড়ের মতো ঝুঁটি, তাতে অগ্নিশিখার চিরুনি

গোঁজা। মাথা ঝাঁকি দিলে আগুন ঝরে পড়ে।

স্বয়ং ঠাকুরজিউ ও তার অনুচরদ্বয়ের হাতে অজস্র কাগজপত্র ও একখানি কিতোব। ঐ কিতোব আর খাতাপত্র তারা সিধু কানহুদের দিয়ে গেছে। কাগজগুলোতে দীকু মহাজন আর জমিদারের পাওনাগণ্ডার কথা লেখা, আর কি ভাবে ঋণ পরিশোধ হবে তার নির্দেশ দিচ্ছে এই ছাপা কিতোব। শুধুমাত্র পাজী দীকুদের সঙ্গেই ব্যবহারবিধি নয়, দারোগা মোগল সাজাওয়াল পাহাড়ী ফৌজ আর শাদা কুকুরদের সম্পর্কেও কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তারও নির্দেশনামা এই কিতোব।

ঠাকুরজিউ ও তার দু-জন অনুচরের আবির্ভাব এবং খাতাপত্র আর কিতোব সম্পর্কে সমবেত হড়্ সম্প্রদায়কে অবহিত করার পর সিধু হাত নেড়ে জনতার মধ্যে থেকে যে কোনো ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানায়, 'তোদের ভেতর থেকে যে কেউ সামনে এগিয়ে আয়, এসে এই কিতোব পড়ে দেখ্, ঠাকুরজিউর কি হুকুম?'

উত্তরে অনেক হড়্ই আকাশপানে হাত তুলে চিৎকার করে বলে, 'আমরা কিতোব পড়তে জানি না, তুই পড়ে দে।'

বিনা দ্বিধা এবং সংকোচে সিধু উত্তর দেয়, 'আমিও জানি না; কানহু কিতোব পড়তে পারে।' এ কথাটা বলার পর হাতের বইখানা সে কানহুর দিকে এগিয়ে দেয়।

বেশ অভ্যস্ত হাতে কিতোব খোলে কানহু, ইংরেজি ভাষায় লেখা বই সেণ্ট জনস্ গসপেল, আমড়া পাড়া হাটে ক্রীশ্চান্ পাদ্রীর কাছে সংগৃহীত। কিতোব খুলে সে হড়্ ভাষায় দ্রুতবেগে পড়ে চলে। পাশে দীঘল দাঁড়িয়ে, তার গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্রদৃষ্টি বইয়ের পাঠভুক্ত পৃষ্ঠার ওপর নিবদ্ধ। কানহুর এক পৃষ্ঠা পড়া হয়ে গেলে সে হাত বাড়িয়ে পাতা উল্টে দেয়।

কানহু পড়ছে, 'সব দীকু মহাজন আর জমিদারদের মেরেকেটে শেষ করে ফেলতে হবে। তাদের গলার নলি কেটে রক্ত চুষে নিতে হবে। বাড়ির মেয়েদের ন্যাংটো করে আতোর চৌমাথায় শুইয়ে ফেলে ইজ্জৎ কেড়ে নিতে হবে, যাতে বেঁচে থাকার পরও তারা মরে থাকে। হড়্ রাজ্যের যত দারোগা আর সাজাওয়ালকে কেটে ফেলতে হবে। পাহাড়ী ফৌজ দেখলেই দূর থেকে তুপ্এ্র করতে হবে—তীর বিঁধে মারতে হবে তাদের।'

তারপর কানহু বই বন্ধ করে উদ্‌গ্রীব জনতার দিকে মুখ তুলে বলে, 'বিদেশী কুকুরদের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই, আমরা ভাগলপুরের কমিশনার

সাহেবকে দরখাস্ত দিয়েছিলুম, মোষের লাঙলের ওপর বছরে দু-আনা, বলদের লাঙলে বছরে এক আনা, আর মহাজনের সুদ বছরে টাকায় এক পয়সা হিসেবে দেব ; দীকু মহাজন আর মোগল দারোগাদের পুড়িয়ে খুন করব, এ বিষয়ে আমাদের অনুমতি দিতে হবে, কিন্তু আজও সে উচিত অনুমতি আসেনি।'

কানহু আবার বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে চোখ নামিয়ে পড়তে থাকে, 'আমাদের এসব কাজ ঠাকুরের কাজ ; এ ব্যাপারে পোণ্ড সেতারা বাধা দিলে তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ হবে, ঠাকুরজিউর এই হুকুম।'

কানহু এবার বিরতি দেয়, তারপর চতুর্দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেখে এই বক্তৃতার প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সর্বত্রই সম্পূর্ণ নীরবতা থেকে উপলব্ধি হয় তার কথা প্রতিটি পুরুষ ও নারীর মনের অন্তরভূমি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এর জন্যে অপার গর্বানুভব করে সে, কিন্তু মুখের গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাবে কোনো পরিবর্তন আসতে দেয় না।

বক্তৃতা ও পুস্তক পাঠ বন্ধ করে কানহু নীরব হতে দীঘল হাত তুলে সরবে ঘোষণা করে, 'হ্যাঁ, আমরা তৈরি।'

দীঘলের উদার এবং অসংকোচ প্রতিশ্রুতি দশ সহস্রাধিক কণ্ঠের প্রতিধ্বনি স্বরূপ চতুর্দিক থেকে বার বার ফিরে আসে, 'আমরা তৈরি, সারা দুনিয়ার হড্ যুদ্ধের জন্যে তৈরি।'

তারপর অগণিত দামামা মৃদঙ্গ ঢাকঢোল ও ভেরীর নিনাদে সে প্রতিধ্বনির কোলাহলও ডুবে যায়। কিছুক্ষণ পরে বেদীর ওপর সমবেত হড়্বৃন্দ ওপর দিকে হাত তুলে নীরবতা রক্ষার ইঙ্গিত দেয়।

ছুঁচ পড়া শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় এমনি নিস্তব্ধতা ফিরে এলে সিধু বলতে আরম্ভ করে, 'পাজী দীকু আর পোণ্ড সেতারা আমাদের সুঁতার বলে, আজ থেকে তাদের কানে এটা পৌঁছে দিতে হবে, আমরা হুল সুঁতার—বিদ্রোহী সুঁতার। আমাদের বিদ্রোহের গুরু হুল হড়্ বাবা তিলকা মাঝি, যে একশ' বছর আগে চিলিমিলি সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। আমাদের তার প্রতিশোধ নিতে হবে। জয় বাবা তিলকামাঝি।'

'জয় বাবা তিলকামাঝি!' এ প্রতিধ্বনি যেন অনন্ত বাণীস্রোতে প্রবাহিত।

হুল হড়্ বাবা তিলকামাঝির কাহিনী তিন চার পুরুষের স্মৃতিতে জড়িয়ে

মনে হয় এ যেন গতকালের সজীব ঘটনা। যেন সব বয়েসের প্রতিটি হড়ের চোখের সুমুখে এর সবগুলি দৃশ্যেরই অবতারণা হয়েছিল। সে ঘটনা স্মরণ করলেই দেহ রোমাঞ্চিত হয়, অনিবার্য ও অনির্বাণ ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

ওয়ারেন হেসটিংস বারাণসী যাত্রা করার পর থেকে আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের মনে স্বস্তি ছিল না। উন্মুক্ত অনুমতি দিয়ে গেছেন হেসটিংস, কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধানতার প্রাথমিক সর্ত। অত্যন্ত ধীরে জাল টানতে হবে, সরকার পক্ষে ব্যস্ততার প্রকাশ যেন না থাকে। তারপর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পর্বে দুটি অসফল বছর উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড তিলকা মুর্মুকে নিজের দপ্তরে সমন করলেন।

তিলকা মুর্মুর মৌখিক জবাব বহন করে সরকারি তকমাধারী পেয়াদা ফিরে এল। ক্লীভল্যাণ্ড বাসনা করলে তিলকা মুর্মুর বারারী আতোর সিকন্দারপুর আর মুজাহীদপুর রাজ্যের যে কোনো অঞ্চলে পদার্পণ করতে পারেন, কোথাও তাঁর স্বাগতের অকিঞ্চন হবে না; কিন্তু কোনো স্বাধীন রাজার পক্ষে সমনের তাগিদে অপর রাজার অধীনস্থ কর্মচারীর দপ্তরে গিয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের সমন আমন্ত্রণের ভাষায় নয়, অহেতুক অপমান করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে বলে তিলকা মুর্মুর সুদৃঢ় ধারণা।

এ উত্তরের পর সৈন্যবল সমন্বিত তরুণ কাথেস্টারের পক্ষে ধৈর্য ধারণ কঠিন। মাত্র একজন অনুগত সেপাই সঙ্গে নিয়ে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে মৌজা বারারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, যেটি হড়্ রাজা তিলকা মুর্মুর তথাকথিত রাজধানী। কতটুকুই বা রাস্তা তাঁর দপ্তর থেকে, এক ক্রোশের বেশি নয়।

হড়্ রাজা বাবা তিলকা মাঝি পূর্ণ সমাদরের সঙ্গে ক্লীভল্যাণ্ডকে মাঝিস্থানে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর অতিথির আপ্যায়ন পর্ব। হড়্ কুড়ি এসে পরম যত্নের সঙ্গে পরিষ্কার জলে চিলিমিলি সাহেবের পা ধুইয়ে শুকনো গামছা দিয়ে গেল। তারপর স্বয়ং বাবা তিলকা মাঝি স্বহস্তে চিলিমিলি সাহেবকে ঝকঝকে কাঁসার পাত্রে সুপেয় হাঁড়িয়া পরিবেশন করল। অতিথির সম্মান রক্ষার জন্যে নিজেও গ্রহণ করল সে।

হাঁড়িয়ার পাত্রে দু-একটা সতৃপ্তি চুমুক দেওয়ার পর বাবা তিলকামান অনুযোগের ভাষায় অনুরোধ করে, 'সাহেব, তুই মাঝে মধ্যে এদিকে আসিস কেন, আগে তো প্রায়ই বেড়াতে আসতিস?'

তিলকা মুর্মুর অনুযোগের জবাব না দিয়ে সরাসরি কাজের কথায় এলেন

ক্লীভল্যাণ্ড, 'মাঝি, তুই তো তিন-চারটে মৌজার সর্দার, তোরা সরকারকে খাজনা দিস না কেন ?'

আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের কথা শুনে তিলকা মুর্মুর সম্পূর্ণ মুখাবয়ব বিস্ময়-চিহ্নিত হয়ে যায় ; এ বিস্ময়ে কোনো কপট অভিব্যক্তি নেই, সে উত্তর দেয়, 'সর্দার, আমায় সর্দার কি তুই বলছিস বটে ; আমি হড়্ রাজ্যের রাপাজ। তুই তো পোণ্ড রাপাজের পোণ্ড নফর বটে ? হড়্ কেনে তোকে খাজনা দিবে, হড আমায় খাজনা দিবে। তোকে দীকু খাজনা দিবে, মুণ্ডা দিবে, মোগল দিবে।'

তখুনি উঠে পড়লেন ক্লীভল্যাণ্ড, যাবার আগে উত্তমরূপে শাসিয়ে গেলেন তিনি।

তারপর পঞ্চম দিন অতি প্রত্যুষে বারারী মৌজা আক্রান্ত হল। বারারী সাবোর সিকন্দারপুর আর মুজাহীদপুর, এই চারটি মৌজা দেশী ফৌজ ও হিল রেঞ্জার বাহিনী ঘিরে ফেলেছে, তবে গাদা বন্দুকের গুলি বর্ষণ শুধুমাত্র বারারী মৌজার ওপরই সীমিত। ক্ষিপ্ত হড়ের দল নিজেদের জাতীয় অস্ত্রাদি নিয়ে ছুটে এল। সে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল আরও বহু অঞ্চলে, কিন্তু সবই যেন উল্কা নিয়তির মতো একান্তই সাময়িক।

আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতেই যুদ্ধের বিরতি। ধৃত তিলকা মুর্মুর হাত পা বেঁধে রাস্তার চৌমাথার ওপর নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন তিনি। তারপর সেই দড়ির একটা প্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যের হাতে দিয়ে ঘোড়া ছোটাবার নির্দেশ। অভিনব পন্থায় বিদ্রোহী বীরের নগর পরিক্রমা। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত উদার আদেশ, সন্ধ্যের পর বিদ্রোহীকে যেন উপযুক্ত মর্যাদায় তার প্রজাবৃন্দের হাতে সমর্পণ করা হয় ; এবং তার সমাধির সমূহ ব্যয় সরকারই বহন করবে।

ঘোড়া ছুটছে, তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড, তবু তাঁর মনে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি। হয়তো বা এক ধরনের অপরাধবোধ ! ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একটি তীক্ষ্ণধার তীর এসে তাঁর বাঁ বাহুতে বিঁধে গেল। পৌষের শীত, দেহে স্থূল পশমীর বস্ত্রের বর্ম, সেই নিক্ষিপ্ত তীরের চুল পরিমাণ অগ্রভাগ দেহত্বক ছিন্ন করে যেন। তীরটা নিজের হাতেই টেনে বের করলেন তিনি। ক্ষতস্থান জ্বালা করছে। সামান্য রক্তপাত গায়ের বস্ত্রাদি সম্পূর্ণ শোষণ করে নেবে।

তবু শত্রুপক্ষীয় হড়ের জীঘাংসামূলক নিশানা এত সহজে উপেক্ষা করা যায়

না। ক্লীভল্যাণ্ডের পাশেই ক্যাপ্টেন ব্রাউন, তাড়াতাড়ি তাঁর আহত হাতটা ধরে তিনি ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'খুব লেগেছে স্যার ?'

ঘাড় নাড়লেন ক্লীভল্যাণ্ড, 'না, একটু জ্বালা করছে, ঠিক যেন গোলাপ কাঁটায় হাত ছড়ে গেছে।' তারপর ম্লান হাসলেন তিনি, 'তবে এই আমার শেষ। গভর্নর জেনারেলকে জানাবেন, তিলকা মাঝিই বলেছিল উনত্রিশ বছর বয়েসে আমি মারা যাব। কিন্তু এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করাতে তেমন কিছু বাহাদুরী নেই, জীবনের মোমবাতি জ্বলে উঠলে একদিন তো নিভবেই! আমি ভাবছি তিলকা মুমু´ নিজের মৃত্যুর কথাটাও কি সঠিক জানতে পেরেছিল, তাই সে আমাকে সহ্য করতে পারেনি ? অথচ প্রথম দিকে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালই ছিল !'

সে ঘটনার পর মাত্র ন-দিনের মাথায় ভাগলপুরের প্রথম তরুণ কালেক্টার আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। টিলাকুঠির প্রান্তরে তাঁর স্মারক স্তম্ভে মৃত্যুতিথি উৎকীর্ণ, তেরোই জানুয়ারী সতেরোশ' চুরাশি। আর সেই শিলাপটের একটি বিশেষ পংক্তি, Who employing only the means of benevolence accomplished the entire subjection of lawless and savage inhabitants of the jungleterry ; প্রেমের প্রবাহে বর্বর জাতির হৃদয় সিক্ত করেছিলেন তিনি !

একুশ

মাঝিস্থানের কাছে দক্ষিণের মাঠে হড়্ সমাবেশে বাহার আর অপেক্ষা করার সময় নেই। শুধু সে কেন, আতোর একটি মেয়েরও না। এতগুলি অভ্যাগত হড়ের খাওয়ার আয়োজন করা সহজ নয়। উপকরণ সামান্য, কিন্তু পরিমাণ অকল্পনীয়। চাল ও মুগুরডালের গুড়োদাকা আর হাকোবাটা।

সেই খিচুড়ি রাঁধতে কতগুলো যে উনুন আর হাঁড়ি দরকার তার হিসেব কেউ করতে পারে না। আর নুন তেল রসুন ও কাঁচা লংকা মিশিয়ে মণ দেড় দুই কাঁচা চুনো ও চারামাছ বাটতে কটা যে শিলনোড়া প্রয়োজন তাই বা কে বলবে !

এতখানি উপকরণ আতো ভাগনাডিহিতে যোগাড় হয়নি, বহিরাগত হড়্রা

যে যেমন সম্ভব সঙ্গে এনে এই আতোর মাঝি-ভাণ্ডারে জমা দিয়েছে। কাঁচা মাছের পেট টিপে নাড়িভুঁড়ি বের করে হলুদের গুঁড়ো মাখিয়ে এনেছে যাতে পচন না ধরে। আর যে যার তামাক ও মদের রসদ সঙ্গেই রেখেছে। আতো ভাগনাডিহির পক্ষের আতিথ্য কেবল আন্তরিক ব্যবহার এবং পানীয় জল। কিন্তু জলের আয়োজন করাও দুঃসাধ্য। কত মেয়ে যে গাগরি নিয়ে দূর ডাভী আর আতোর পোখরীতে গেছে তার সংখ্যা নেই। মোষের গাড়িও জল বহনের কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

রান্নাবান্না ও শত কাজের মাঝে ব্যস্ত থেকেও মনে মনে সবিশেষ আশ্চর্য হয়ে বাহা সারা গ্রামখানার দিকে বার বার তাকিয়ে দেখে। আর লক্ষ্য করে এখানে সমবেত যত মানুষকে। নারী ও পুরুষ সকলকেই। এত ব্যস্ততা, এতখানি নিষ্ঠুর উৎসাহ, এ তো হড় সমাজের লক্ষণ নয়? সবটাই কি অন্যায়ের প্রতিকার অন্বেষণ? সর্বত্রই যেন পাশবিক বিক্রমের ঘোর উল্লাস!

কাজের ফাঁকে সুযোগ করে বাহা একবার ওড়ায় ফিরেছিল, তখন দীঘলও সেখানে উপস্থিত, একান্ত মনোনিবেশে অস্ত্রশস্ত্রে শান দিতে বসেছে সে। কদিন যাবৎ এ কাজে বিরাম নেই তার, তবু যেন সন্তোষহীন।

'কি করছিস তুই?'

বাহার আচমকা ডাকে দীঘল চকিত হয়ে মাথা তোলে, তারপর হাতের ধারাল কাটারিটা দেখিয়ে জবাব দেয়, 'শান দিচ্ছি, যেন দীকু বেটাদের গলায় ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ধড় থেকে মুণ্ডু খসে পড়ে যায়; কষ্ট করে আর টান দিতে হবে না।'

'পারবি তুই?' ভ্রূ-চোখ পূর্ণায়ত করে অবিশ্বাসের সুরে বাহা জিজ্ঞেস করে।

দীঘল সবিক্রম হাসি হেসে উত্তর দেয়, 'দীকু কুড়িকে বাপলা করে ওড়ায় নিয়ে আসা ছাড়া আর সবই করতে পারব। সুযোগ পেলে তোর চোখের ওপর দেখিয়ে দেব কি ভাবে দীকু মেয়েদের ইজ্জতে আগুন ধরাতে হয়।'

'তাতে তোর নিয়ম ভাঙবে না?' এবার বাহার প্রশ্ন অধিকতর সবিস্ময়।

বাহার বিস্ময় ঘোচাবার জন্যে হাতের জরুরী কাজে স্থগিত দিয়ে দীঘল বিস্তারিত উত্তর দেয়, তবে প্রথমটা বাহার ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন বুঝে উঠতে কিঞ্চিৎ দেরি হয়েছিল তার; সে বলে, 'কিসের নিয়ম? ওঃ, না। এ তো ঠাকুরজিউর হুকুম, এইভাবে দীকুদের দেনা শুধতে হবে, তবেই আমাদের বাপ ঠাকুরদা নরক

থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যাবে। আর আমাদের যা প্রতিজ্ঞা তাতে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে হড়্ মেয়েকে ছুঁলেই নিয়ম ভাঙবে, পাপ হবে, দীকু মেয়েকে নষ্ট করলে তা হবে না। এও তো এক ধরনের লড়াই!'

অম্বর থেকে ফেরার পর বাহার কটা দিন বেশ ভালই কেটেছিল। প্রতিটি রাতেই দীঘলের চিরকাম্য আসঙ্গ আশ্লেষ। যুদ্ধ শেষে বাপলার নিশ্চয়তা। কিন্তু গত এক পক্ষকাল দীঘল পাশ থেকে সরে গেছে। আতোর অনেক হড়ের সঙ্গে সংকল্প নিয়ে এখন সে ঘোর ব্রহ্মচারী। তা হোক্, তাতে খেদ নেই বাহার, চোখের স্মুমুখে থাকলেও অনেক স্থখ, গভীর স্বস্তি, অন্য কোনো মেয়ের কাছেও তো সে যাচ্ছে না।

কিন্তু এখন দীকু মেয়ের সম্বন্ধে দীঘলের বাসনার কথা শুনে বাহার অন্তরাত্মা ঈর্ষার বিষে জ্বলে উঠল যেন, সে সরোষে বলল, 'তুই হাজারটা দীকু মোগল দারোগা আর মুণ্ডাকে মেরে আয়, তাতে আমার বলার কিছু নেই, লড়াই করতে গিয়ে নিজেও যদি মরে যাস তাতেও দুঃখ করব না, কিন্তু কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিবি না।'

'কেন, একি ঠাকুরজিউর হুকুম নয়?' হাতের কাজ বন্ধ রেখে দীঘল সাশ্চর্যে বাহার ঐ বিস্ময়কর নির্দেশ দানকারী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাহা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'ঠাকুরজিউ এমন অন্যায় হুকুম দিতে পারে না; তা সে দিক না দিক, তুই যদি অন্য মেয়ের গায়ে হাত দিস তাহলে তোর সঙ্গে আমার বাপলা হবে না, আমি তোকে ঘেন্না করব।'

চরম কথাটা জানিয়ে দিয়েই বাহা ওড়া থেকে বেরিয়ে গেল, দীঘলকে আর স্বপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ দিল না।

দীঘল তবু ঘাড় উঁচু করে একবার জোর গলায় হাঁক দিল, 'অতে, হিজু ম্যা—এই শুনে যা না একবার?'

'বাইং।' বাহাকে দেখা যায় না, তবু তার উচ্চতর কণ্ঠস্বরে ভেসে এল, 'না, কখনো না।'

বাহার সব সময়কার সব ব্যবহার দীঘল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এই ক'দিন আগেও তার যুদ্ধের ব্যাপারে কি উৎসাহই না ছিল! ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় ছোটখাট লড়াই হয়ে গেছে। দীকুদের দু-চারটে গোলাবাড়ি লুঠ হয়েছে। বাধা দিতে গিয়ে কিছু পাহাড়ী ফৌজ মরেছে। সাহেবরা এ লড়াইয়ের

নাম দিয়েছে ডাকাতি। কিন্তু হড় কোনোদিন গোরু ছাগল চুরি করে না। ডাকাতিও নয়।

সেইসব খণ্ডযুদ্ধে লুঠের মাল আর সামান্য টাকাকড়ি নিয়ে সিধু কানহু আতো ভাগনাডিহির কাছে একটা অগভীর জঙ্গলে লোহা গালাইয়ের ভাঁটি খুলেছে। পাথর গালিয়ে লোহা বের করার কাজ হড় তেমন জানে না। লোহা পাথর বাছাই করতেও পারে না সে।

লোহা গালাই যারা করে তারাও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। হড় তাদের বলে কোল। অবয়ব ভাষা ও কৃষ্টিতে মূলত হড়েরই মতো, তবু কোথায় যেন খানিকটা তফাত, হয়তো তার কারণ পুরুষানুক্রমিক পেশার তারতম্য। দূর বনাঞ্চল থেকে সাতটি পরিবারকে তুলে এনে সিধু আর কানহু ভাগনাডিহির জঙ্গলে বসিয়েছে।

এই উদ্যোগে সবচেয়ে বড় দান বাহা কিস্কুর। তিনশ' টাকার মাত্র দেড় কুড়ি খরচ করে সে দীঘলের তৈরি ওড়ার পুব দিকটা বাড়িয়ে নিয়েছে। নতুন অংশে সবটাই প্রায় মাৎকিনী কাজ। এমন চমৎকার ও নিখুঁত বাঁশের কাজ করা ওড়া আশপাশের দশ বিশটা আতোর কোনো হড়েরই নেই। কিন্তু সে ওড়ায় বাহা আজও ঢোকেনি, দীঘল বা মারাং গ' রতনী মেঝেনকেও ঢুকতে দেয়নি। যুদ্ধশেষে বাপলা হবে, তারপর সেই নতুন ওড়ায় ঢুকে নতুন সংসার পাতবে সে।

তিনশ'র তিরিশ ওড়ার পুনঃনির্মাণে গেছে, তারপর বাকি সব টাকাই সাতটি কোল পরিবারকে আতো ভাগনাডিহিতে নিয়ে আসার ব্যাপারে বাহা স্বেচ্ছায় দান করেছে। সব টাকা নিতে সিধু কানহু ইতস্তত করেছিল, বাহাই জোর করে তাদের হাতে গুঁজিয়ে দিয়েছে, বলেছে, 'হড়ের হাতে বেশি টাকা থাকতে নেই, তাতে মনটা দীকুদের মতন ছোট আর নোংরা হয়ে যায়।'

অথচ এখন? দীঘল সত্যিই বাহার ব্যবহার কিছু বুঝে উঠতে পারে না। মেয়েদের স্বভাবই এই তার সঙ্গে একটু সাদাসিধে আচরণ করলেই হঠাৎ যেন কেমন বেঁকে বসে। বাহা প্রকৃতপক্ষেই একটা মেয়ে, মুখে সে আজকাল যতই বীরত্বের কথা বলুক না কেন।

ছেলেটি কিশোর, বয়েস ষোলোর ভেতরই। সুগৌর ও স্বাস্থ্যবান। শরীরের আধ্যাত্মিক ভাব যারা বোঝে তারা হয়তো বলবে সুলক্ষণযুক্ত ও শুভদায়ক। কিন্তু যে অবস্থায় সে এখানে আনিত হয়েছে তা দেখে মনে হয় কার্য কারণ পরিবেশ

ইত্যাদি অনুধাবন করার শক্তিটুকুও নেই তার। ঘোর মাতাল, আর মদ্যপানে অনভ্যাসের দরুন বাহ্যিক চেতনাহীন। স্থির হয়ে দাঁড়ানোও সাধ্যাতীত। পাশের দুই ব্যক্তি হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ থুবড়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আতো পুরোহিত স্বরীন নাইকীর নির্দেশে ছেলেটিকে উলঙ্গ করে দেওয়া হল, তাতে বরং সে সবিশেষ খুশি, বলল, 'উ, বড্ড গরম!' অচৈতন্যের মধ্যেও যে স্বস্তি অস্বস্তির অতি সূক্ষ্ম বোধ থাকে, কথাটা সম্ভবত সেই অনুভূতির সাহায্যেই বলেছে।

স্নান করাবার পর ছেলেটি কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়, বলে, 'আঃ, এবার আমি একটু ঘুমবো।'

ঘোর অমাবস্যা, কিন্তু নিম রেড়ি আর মহুয়াবীজের তেলের সাহায্যে জ্বালানো অনেকগুলি মশালের আলোয় জায়গাটি উদ্ভাসিত, এবং এক ধরনের পোড়া গন্ধ, পর্যাপ্ত ধোঁয়া ও ঘন সন্নিবেশিত মানুষের ভিড়ে সে স্থান যেন কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত; তাই বোধহয় এই আলোকসজ্জা মনের মধ্যে কতকটা ভীতিস্বরূপ অনুপ্রবেশ করে। অথচ শক্তিপুজোর পক্ষে এটাই সর্বোত্তম লগ্ন।

কিন্তু একমাত্র জাহের স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জাহেরেরা ভিন্ন হড়ের আতোয় আর কোনো শক্তিশালিনী নারী দেবী নেই। আর আছে আতোর সীমাঞ্চলে পরগনা বোঙার পাশাপাশি রতিপরী রংগোরুনি বোঙা। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশে সে সম্পূর্ণই অবান্তর। দেবী জাহেরেরা নিজের গণ্ডিতে বন্দিনী। একমাত্র দেবাদিদেব মারাংবুরুর পক্ষেই সর্বত্র আবির্ভাব ও অভিগমন সম্ভব। তাই এই বিরাট প্রান্তরে মহাশক্তিরূপী মারাংবুরুরই পূজানুষ্ঠান।

রাত দ্বিতীয় প্রহরের মতো। স্বরীন নাইকার বোধন পুজো শেষ হয়েছে, কিন্তু মারাংবুরুর প্রস্তর বিগ্রহের মধ্যে এখনো পর্যন্ত প্রাণের সাড়া নেই; তবে ভরগ্রস্ত একজন হড়্ তার পরিবর্তে কথোপকথন জারি রেখেছে।

'আমার ভয়ংকর খিদে পেয়েছে।' ধৃত ছেলেটির উলঙ্গ দেহের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মারাংবুরুর ব-কলমে ভরগ্রস্ত হড়্টি নিজের নিষ্ঠুর বাসনা ব্যক্ত করে।

মারাংবুরুর ক্ষুধার্ত কণ্ঠস্বর শ্রবণে তটস্থ স্বরীর নাইকা পর্যাপ্ত ভয় ও ভক্তি সহযোগে উত্তর দেয়, 'এখুনি তোর সেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঠাকুরজিউ।' বলার পরই সে সর্বব্যাপারে অধিকতর ব্যস্ততা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে।

প্রায় মাস ছয় যাবৎ আতো নাইকী স্বরীন মুর্মু আতো ভাগনাডিহিতে উপস্থিত ছিল না। দেহে মহাব্যাধির লক্ষণ ফুটতেই অম্বরের কাছে মহেশপুর অন্তর্গত বরু ঝর্ণা নামে ললদাঃরু কাছে চলে গিয়েছিল সে। অনেকেই যায়, কারণ সর্বত্রই গভীর বিশ্বাস ঐ উষ্ণ প্রবাহের কাছে বসবাসের ফলে শরীর রোগমুক্ত হয়। ঝর্ণার জল পান আর উষ্ণ ধারায় প্রতিদিন ত্রিযামা অবগাহন। এবং ললদাঃর অধিকারিণী ইক্ মাতার তোষণ। রোগবিমুক্তির বর পাওয়ার পর মুর্গী অথবা ছাগ বলিদান দিয়ে মাতৃঋণ পরিশোধ অতি আবশ্যিক, অন্যথায় ব্যাধির প্রত্যাগম অবশ্যম্ভাবী।

স্বরীন নাইকীর ব্যাধি এখনো সম্পূর্ণ নিরাময় হয়নি, মাতৃঋণ পরিশোধও বাকি, তবু সিধু আর কানহুর অনুরোধে তাকে আতো ভাগনাডিহিতে ফিরে আসতে হয়েছে। আতো নাইকা ভিন্ন এমন গুরুত্বপূর্ণ মহাপূজার ভার অপরের ওপর অর্পণ করা সম্ভব নয়। নাইকী স্বরীন মুর্মু আবার আগামীকালই মহেশপুর ফিরে যাবে। রোগবিমুক্তির পর সে আতো ভাগনাডিহিতে চলে আসবে, ততদিন পর্যন্ত কুড়ম নাইকী তার স্থানাভিষিক্ত হয়ে থাকবে।

সিধু স্বয়ং শানিত কাপি হাতে হাড়িকাঠের সামনে দাঁড়াল। আজ সকালেই একটি বৃদ্ধ বলদের গলায় কাপির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় আঘাতের প্রয়োজন হয়নি। তারপরও সিধু আবার তাতে নতুন করে শান দিয়েছে। এ কাজ নিজেই করেছে সে, পবিত্রতম কর্তব্যের দায় অপরের ভরসায় ছেড়ে রাখেনি।

মহুয়ার কড়া পউরর প্রভাবে এখনো পর্যন্ত ছেলেটির প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা কিন্তু এই চরম মুহূর্তে তার সমস্ত বোধ ফিরে এসেছে যেন। সমূহ চেতনা ও সমস্ত রকম আকুলতা একাগ্র করে সে একবার ঈশ্বরের দরবারে অশ্রুময় নিবিড় আবেদন পাঠায়, 'হে ভগবান, আমায় কেটো না।'

এই একটিমাত্র কথাই মারাংবুরুর পুজোয় উৎসর্গীকৃত দীকু কিশোরটি আর বার দুই তিন বলতে পেরেছিল, কিন্তু তার একার কম্পিত কণ্ঠস্বর সহসা ধ্বনিত অতগুলি হড়্ বাণ্ডের চাপে ঊর্ধ্ব আকাশের পরিবর্তে নিম্নতম পাতালে তলিয়ে গিয়েছিল।

বলির দৃশ্য উপভোগ করা বাহার পক্ষে সম্ভব নয়, নিনকী মেঝেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সে চুপি চুপি বলে, 'চল্, পালিয়ে যাই।'

'চুপ, বলতে নেই, মারাংবুরু পাপ দেবে।' বাহার হাত চেপে ধরে জোর করে

তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে নিনকী মেঝেন, তার নিজের জলন্ত চোখদুটি হাড়ি-কাঠের ওপর গিয়ে পড়েছে।

নিনকী মেঝেনের দৃঢ় মুষ্টির বন্ধনে আবদ্ধ বাহা প্রায় বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু এত আলোর মাঝেও তার চোখের স্মুমুখে যেন ঘোর অন্ধকারের পর্দা। তবু এ অন্ধত্বই এখন তার সবচেয়ে বড় স্বস্তি।

কিছুক্ষণ পরে কে যেন বাহার কপালে একটি কবোষ্ণ টিপ পরিয়ে দিয়ে গেল। উষ্ণ রক্ততিলক। তারপরই চোখের অন্ধত্ব ঘুচল তার। মনের প্রায় অচেতন ঘোরও সম্পূর্ণ কেটে গেল।

বাইশ

রক্তক্ষরা ও অগ্নিঝরা একুশটি দিন অতিবাহিত।

কেবল দামিনঈকোহ্ নয়, পশ্চিমে কাহালগাঁও থেকে পূর্বে রাজমহল, এবং স্দূর উত্তরে রাণীগঞ্জ থেকে দক্ষিণে সাঁইগিরা ; প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড হুল হড়ের নজিরহীন অত্যাচারের চিহ্নে স্বাক্ষরিত।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানই ভবিষ্যতের ইতিহাসের পক্ষে যথেষ্ট তথ্যসম্ভার, অথচ তখনো পর্যন্ত রক্তের পিপাসা ও নেশা অধিকাংশ হড়ের মধ্যেই তেমন উগ্র হয়ে উঠেনি। অস্ত্রধরা হাত নরহত্যার নামে কুণ্ঠিত, ধর্ষণের পূর্ব মুহূর্তে সর্ব স্নায়ু বিকারগ্রস্ত, শিশু নারী ও বৃদ্ধদের জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার সময় বিবেকের দৃঢ় প্রতিরোধ।

এতগুলি মানসিক প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রথম দিনটির পরীক্ষামূলক আয়োজনই যে কোনো মানুষের মনে সবিশেষ ঘৃণা ও বিপুল ত্রাস সঞ্চার করে।

তবে সে দিনটির কোনো ব্যাপারেই দীঘল টুডুর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। হুল হড়ের দল আতো ভাগনাডিহি থেকেই অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। দীঘলদের শাখায় প্রথমে ছিল তিনশ'র মতো, ক্রমশ তা অধিক সংখ্যায় বিস্তৃত ও পল্লবিত হয়েছে। কানহুর সঙ্গ ছাড়েনি দীঘল। কানহু তার বন্ধুস্থানীয়। আমরণ একসঙ্গে থাকবে এই তাদের শপথ।

হুল হড়ের প্রথম সাক্ষাৎ বোরিওবাজারের মোগল দারোগা ও তার অনুচর ন-জন দেশী বরকন্দাজ। বোরিওর কাছেই আতো পাঁচখুঁটিয়া। শত্রুপক্ষের দর্শনের

সঙ্গে সঙ্গেই হুল হড়ের বিরামহীন যুদ্ধদামামা অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে নিনাদিত হতে আরম্ভ করে।

দলের শীর্ষাগ্রে কানহু, সে সবিক্রমে আদেশ দেয়, 'ঘিরে ফেল ওদের, বেটারা হুল হড়ের জাল কেটে মাছির মতন পালাবার চেষ্টা করছে।'

তারপর চোখের সুমুখে কয়েকটি অতিত্বরিত ভোজবাজি, দু-চোখের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখলে তবুও সব ঘটনা যেন ঠিকমতো উপলব্ধি করা যায় না।

প্রাণের জন্যে ব্যাকুল আকুতি কি যে মর্মবিদারী দৃশ্য দীঘল তা দাঁড়িয়ে দেখল, অথচ সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। তবু একবার ইচ্ছে হয় কানহুকে অনুরোধ করে, 'আহা, এদের ছেড়ে দে!' কিন্তু এতগুলি শোণিতলিপ্সু হড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সেকথা মুখে এল না তার। এ সময় যেন এক অদ্ভুত লজ্জা ও ভয় তাকে পেয়ে বসে।

সিংহাসনের মতো উঁচু একটা মাটির ঢিবির ওপর কানহু উঠে বসল, সামনে দশজন বন্দী আসামী।

দারোগার দিকে আঙুল তুলে কানহু দীঘলের উদ্দেশে বলে, 'মহাজনের কাছে ঘুষ নিয়ে এই বেটা মোগল দারোগা তোর দাদা গড়মকে বেঁধে ভাগলপুরের কাজির আদালতে চালান করেছিল। ধারতির সবচেয়ে উঁচু জেতের মানুষ হড়্ গড়ম ফাটকে যাওয়ার পর মেথর হয়ে গেছে। দীকুর ময়লা মাথায় না বইলে সে আজ খেতে পায় না! তুই এই মোগলকে নিজের হাতে শাস্তি দিবি, একে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল। প্রথমে কাপি দিয়ে দুটো হাত, যে হাতে গড়মকে হাতকড়া পরিয়েছিল, তারপর গলার নলিতে বিষাক্ত তীর বিঁধিয়ে মেরে ফেলবি। বেটা মোগলের বাচ্চা দীকু মহাজনের কুকুর, [illegible]ক কাটলে তোর তিন পুরুষের মহাজনের ধান শোধ হবে। তারা নরক থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যাবে।'

দলপতি কানহুর নির্দেশ সত্ত্বেও দীঘল এগুতে পারল না।

প্রাণভয়ে ভীত দারোগা তখন আকুতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দীঘলের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ বিজড়িত গলায় আশ্বাস দিচ্ছে, 'আমাদের ছেড়ে দে, আজই ভাগলপুর রওয়ানা হয়ে গিয়ে তোর দাদা গড়মকে ছাড়িয়ে এনে দেব।'

দীঘল উত্তর দেবার সুযোগ পায় না, তার আগেই কানহুর গলার পৈচাশিক হাসি বেজে ওঠে, 'ও দারোগাবাবু, তোকে আর কষ্ট করে ভাগলপুর যেতে হবে না, তার চেয়ে তুই এখুনি কবরে চলে গিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়।'

তারপর কি যেন ইঙ্গিত করল কানহু, কাকে বা কাদের উদ্দেশে দীঘল তা

লক্ষ্য করেনি, কিন্তু সে অচিরে দেখল তার সুমুখে স্তূপীকৃত মাংসখণ্ড, এবং সামনের জায়গাটা ঘন রক্তে ভেসে যাচ্ছে, আর কাছেই দাঁড়িয়ে থেকে যে দশজন বন্দী অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণভিক্ষা করছিল, তারা নেই ; কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এবং কানহু তখন সেই সিংহাসনে বসে কোমরের কসি থেকে তিরিও বের করে পরম দুখের বিরহ রাগিণী বাজাচ্ছে ; অর্থাৎ এই নাটকীয়তার ছুতোয় নিজের বিমর্ষ ও পলায়োন্মুখ মনটাকে স্ববশে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করছে।

এ ব্যাপারে যতটুকু নাটকীয়তা তা ঐ প্রথমবারই, তারপর ক্রমশ যুদ্ধের দায়দায়িত্ব ও প্রতিরোধ প্রতিবন্ধক বেড়েছে। প্রথম রাতের বিশ্রাম আতো পাঁচ খুঁটিয়াতে বেশ রাজকীয়ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। এ আতোয় প্রায় পঞ্চাশ ঘর দীকু, বলতে গেলে আতো তাদেরই।

দারোগা ও বরকন্দাজ নিধনের অবসরে তারা ওড়া ছেড়ে উধাও হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। কত যুগ পরে দীকুহীন শ্মশানভূমি আতো পাঁচখুঁটিয়া!

পিছু ধাওয়া করলে দীকু পলাতকদের ধরে ফেলে নিধন যজ্ঞে নিবেদন করা কঠিন ছিল না, কিন্তু কানহুর উদার গাফিলতির জন্যে তা সম্ভব হয়নি। সে বলল, 'যেতে দে, কতদূর পালাতে পারবে, কোথাও না কোথাও হুল হড়ের হাতে ধরা পড়ে যাবে ঠিকই!'

তারপর সেইসব ওড়া খুঁজে নৈশাহারের বিপুল আয়োজন। দোকানপাট লুঠ করে অদূর ভবিষ্যতের জন্যে রসদ এবং মোষ আর বলদের গাড়ি সংগ্রহ। তারপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা বহনের অযোগ্য যা কিছু পরদিন অতি প্রত্যূষে তাতে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ এবং সঙ্গে সঙ্গেই বোরিওবাজারের উদ্দেশে বিজয়যাত্রা। ইচ্ছে করলে আরও অনেক বস্তুই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু হড় সঞ্চয় জানে না, ভবিষ্যৎ শব্দের তথ্যগত অর্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারে না।

বোরিওবাজারে প্রবেশের মুখে একটি ছোটখাট সংঘর্ষ। প্রায় দু-শ' সিপাহী নিয়ে একটি পার্বত্য বাহিনীর ছাউনি রয়েছে এখানে। অর্ধেক দীকু, অর্ধেক পাহাড়ী। শুধু পাহাড়ী হলে যুদ্ধ অথবা প্রতিরোধের প্রশ্ন ছিল না। হড়ের গন্ধ নাকে গেলেই তারা দুর্গম পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে বিলীন হয়ে যেত।

দীকু সিপাহী সঙ্গে থাকায় পাহাড়ী ফৌজ বিনা যুদ্ধে পালাতে পারেনি,

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারা রণে ভঙ্গ দিল, যখন তাদের গাদা বন্দুকের গুলিতে চারজন হুল হড়্ নিহত হয়েছে, আর অল্পবিস্তর আহতের সংখ্যা উনিশ।

ওদিকে সিপাহী পক্ষে হড়ের তীর আর কাপির দাপটে নিহত তেরো, আহত অনেকেই, যারা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছে তারপর মরবে। হড়ের বিষসিক্ত তীর ব্যর্থ আঘাত করে না। যুদ্ধের তামাশা দেখতে এসে কাপির আঘাতে প্রাণ দিল সাজাওয়াল খাঁ সাহেব। আল্লাহ্‌র নাম করে তার মুখে একবিন্দু জলও দেবার অবসর পেল না কেউ।

বোরিওবাজারেই প্রথম সত্যিকার যুদ্ধের মহড়া। সূচনায় শুভ। এখান থেকেই দীঘলের রক্তে উষ্ণতা এসেছে। জীবন ও মৃত্যুকে গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়াতে দেখল সে। আর অপরের জীবন হননে দ্বিধা নেই; নিজের প্রাণ বিয়োগের ভয়ও সম্পূর্ণ ঘুচে গেছে।

বোরিওবাজারের প্রধান প্রবেশ পথের কাছে যুদ্ধ। অন্য কোনোদিকে তেমন দূর প্রসারিত রাস্তা নেই, সেইজন্যে যুদ্ধ ভঙ্গের পর বিরাট গঞ্জটা পুরোপুরি হুল হড়ের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। রণক্লান্ত হড়ের দল, উপরন্তু স্বপক্ষীয় চারটি মৃতদেহ সৎকার আর আহতদের চিকিৎসার আয়োজন শেষ হতেই সূর্যাস্ত। ইতিমধ্যে কেবল গঞ্জ থেকে পালাবার পথগুলি জুড়ে হুল হড়ের চৌকি-ঘাঁটি বসেছে।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথির চাঁদ বিকেলের মধ্যেই অস্তমিত হয়েছে, তাই অনেকগুলি মশাল জ্বেলে সেই আলোয় প্রথম বিজয়োৎসব।

যে ব্যাপারে দীঘল অনেকক্ষণ যাবৎ সবিশেষ অধৈর্য হয়ে ছিল এতক্ষণে সেই কথাটা কানহুকে বলল সে, 'পেড়াহড়্—বন্ধু, আমার কিন্তু ঐ মহাজন ভগতকে চাই, নয়তো বুকের আগুন নিভবে না।'

'আর তার ওড়ার মেয়েগুলোকে?' অদ্ভুত আবিল হাসি হেসে দীঘলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কানহু প্রশ্ন করে।

প্রায় দু-দিন পরে দীঘলের বাহার মুখখানা মনে পড়ে যায়, কানহুর প্ররোচক দৃষ্টির বন্ধন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ে, 'বাইং—না, শুধু মহাজন, তার রক্তে গলা ভেজাতে পারলেই আমার তৃপ্তি।'

দীঘলের বিস্ময়কর উত্তর শুনে কানহু নিজেও অবাক, কিন্তু এ মুহূর্তে কোনোরকম মন্তব্য না করে সে দীঘলকে লুকিয়ে আর একবার হাসেই শুধু, অবিশ্বাসের হাসি, কোনো মৌখিক জবাব দেয় না।

হড়ের সংখ্যা পাঁচশ' ছাপিয়ে গেছে। কে কখন কোথা থেকে এসে জুটেছে তা সে-ই জানে। এতগুলো মুখের ভেতর কটাই বা পরিচিত? কেবল মাত্র চেহারায় হড়্, পোশাক আসাক বাহ্যসম্ভারে হড়্, যে জিনিস শুধু চোখে দেখেই পার্থক্য বোঝা যায় না, সেই রক্তের সম্বন্ধে হড়্।

বোরিওবাজারে করায়ত্ত, আশু কোনো সংঘর্ষের সম্ভাবনা বা ভয় নেই, অতএব পরম নিশ্চিন্তে সকলে সান্ধ্য উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, তবে কানহুর নির্দেশ দশের অনধিক সংখ্যা কোনো দলে নেই। দীঘল আর কানহু অবিচ্ছেদ্য। দশের দলে অঙ্গীভূত হয়ে তারা মহাজন হরেরাম ভগতের কুঠিতে গিয়ে উপস্থিত হল।

ঘোর আঁধারময় নিষ্প্রদীপ কুঠি। এর মধ্যে আগন্তুক আলোক সম্বল বলতে দু-জন হুল হড়ের হাতে দুটি জ্বলন্ত মশাল। এতবড় কুঠি, কিন্তু এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। চতুর্দিকে অবহেলায় উন্মুক্ত-দার কক্ষ সমূহ।

পাঁচ সাতটি আলোর সন্ধান করে নিতে দেরি হল না। যেন হুল হড়ের স্বাগতের উদ্দেশ্যে এতগুলি আলো একটি কক্ষে একসঙ্গে রাখা হয়েছে। সবকটি নিখুঁত সাজানো। ঘরটা দেখে মনে হয় বহির্বাটির ভাঁড়ার। আলোগুলি ছাড়া আরও কত কি যে আছে তা খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করতে যথেষ্ট সময় ও প্রয়োজনীয় আগ্রহ এবং উৎসাহ দরকার।

সাময়িকভাবে দলের সঙ্গে ছেড়ে একটি আলো জেলে নিয়ে দীঘল একা সারা কুঠি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। গরীব মহাজনের ওড়া। সাধারণত নগ্নগাত্রই দেখেছে দীঘল, আর মুখে শুধু হরিনামের ব্যঞ্জনাময় ভাষায় নিজের দৈন্যগাথা গাইতে শুনেছে। নিয়ত একইভাবে দেখা ও শোনার ফলে অবিশ্বাস্য কথায় কতকটা বিশ্বাসও জন্মে গেছে তার।

ওঃ, এখন দীঘল বুঝতে পারে কত মানুষের রক্ত শোষণ করে তবেই এত বড় কুঠি তৈরি হতে পারে। যেমন বর্ষার জলে ভেসে আসা অসহায় ছোট্ট ও উপবাসী জোঁক সামান্য একটু রক্ত মাংসের আশ্রয় পেলে স্বীয় মহিমায় ক্রমশ ফুলে ফেঁপে পাষাণ কঠিন আর বিচিত্ররকম নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে, কেটে না ফেললে তাকে গা থেকে ছাড়ানো সম্ভব নয়।

দুটি চোখ ও সজাগ চেতনা পরিপূর্ণ বিস্ময়ে ভরে নিয়ে কুঠির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন শেষ করে দীঘল সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াল। প্রতি বছর তাকে

এখানে এসে সুদের বিনিময়ে ফসল ওজন করাতে হয়, তার পর সে সম্ভার প্রাঙ্গণের দু-দিকে পরিব্যাপ্ত গোলার ভেতর অন্তর্ধান করে। মহাজন ধর্মসাক্ষী করে বলে, সে ফসলে নাকি তার কোনো অধিকার নেই। দুর্দিনের সময় হড়ের ঘরেব ফসল আবার হড়ের ঘরেই ফিরে যায়। যায় হয়তো, কারণ দীঘলও তো কতবার মহাজনের খাতায় নাম লিখিয়ে ফসল ধার নিয়ে গেছে। খাবার জন্ম আর বীজ হিসেবে।

ফসল দেওয়া নেওয়ার অবসরে দীঘলের প্রতি বছর বারকয়েক বিভিন্ন আতোর অসংখ্য হড়ের দর্শন এখানেই হয়। তাদের সঙ্গে সুখ দুঃখের আলাপচারী আর সুদিনের স্বপ্ন দেখা। যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে দীঘলের গড়মবা' নোয়াপুরী ছেড়ে হানাপুরী গেছে। পিতামহের পর বাপও সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে অপঘাতে মরেছে। দীঘলের নিয়তিও তাই ছিল, কিন্তু তারপর হঠাৎ এই আকস্মিক পরিবর্তন।

কুঠির পেছন দিক থেকে অজস্র কণ্ঠের প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে। হুল হড়ের ভীষণ পৈচাশিক হুংকার। শয়তানের পক্ষে অমূল্য রত্ন খুঁজে পাওয়ার উল্লাস। দীঘল আর তাদের দেখার জন্যে ওদিকে গেল না, কারণ শব্দের গতি এদিকেই গভীর হয়ে আসছে। তাছাড়া তার যেন এখন মনে হচ্ছে ওরা সব অন্য জাতের হিংস্র হড়্, আর সে নিজে হড়্ হিসেবে খুবই নিরীহ মানুষ!

হিংস্র হুল হড়ের দল এসে পড়ল। তাদের হাতে দুটি মশাল আর কুঠির ভাঁড়ার থেকে সংগ্রহ করা পাঁচ-ছটি আলো। হড়ের সংখ্যা পঁচিশের মতো, অর্থাৎ কানহুর নেতৃত্বে দীঘলরা কুঠিতে এসে ঢোকার পর গন্ধে গন্ধে আরও অনেকে এসে জুটেছে। তাদের ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে পলাতক শিকারের সম্ভবত সবকটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অসংখ্য অসহায় হড়ের রুধির পানে পুষ্ট মহাজন হরেরাম ভগতের দিকে দীঘলের দৃষ্টি সর্বাগ্রে গিয়ে পড়ে, যেন জ্বলন্ত উনুনের তাতে তাকে বসিয়ে রেখে ভেতরের রক্ত শুকিয়ে দিয়েছে কেউ। দুর্ভাবনার আগুনের দাহশক্তি নিশ্চুপ তুষানলের চেয়ে ঢের বেশি, অনেক গভীর অবধি তার প্রতিক্রিয়া। দুশ্চিন্তার ধীর মৃদু উত্তাপ কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তা প্রকৃত চিন্তাগ্রস্ত লোকটিকে না দেখা পর্যন্ত অনুমান করা যায় না।

হরেরাম ভগতের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে কানহু তাকে দীঘলের সামনে নিয়ে এল, 'বেটারা ওড়ার পেছনে ডোবার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পানকৌড়ির মতন

বসেছিল, যদি হুল হড়ের হাতে ধরা পড়ে যায় এই ভয়ে রাস্তায় বেরুতে পারেনি।'

এক জায়গায় অনেকগুলো আলো, সেই আলোয় দীঘল একবার পরিষ্কার চোখে চতুর্দিক দেখল, হরেরাম ভগতসহ চারটি বয়স্ক পুরুষ। পাঁচজন নারীর মধ্যে একটি বৃদ্ধা, একটি মধ্যবয়সী আর তিনজনের বয়েস বিশের নিচে।

এদের সর্বকনিষ্ঠটিকে দীঘল ক'মাস আগেই দেখেছে। হরেরামের কিশোরী পৌত্রী, গতবছর মুর্শিদাবাদে বাপলা হয়েছে। এখনো দ্বিরাগমন বাকি। মেয়েটির মুখভাব দীকুদের প্রতিমার মতো, হয়তো চোখদুটি অতিরিক্ত আয়ত বলে এমনিই মনে হয়! বৃদ্ধ হরেরাম ভগতের অতিরিক্ত আদরের ; নাম রাধা। তারা ছাড়া বাকি চারটি শিশু, দশের মধ্যে বয়েস। সকলেই সিক্ত বস্ত্র, প্রাণশূন্য রক্তহীন মুখাবয়ব।

অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাসি হেসে কানহু নৈর্ব্যক্তিকভাবে হুকুম করল, 'তোরা সব দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিস কি, বাবুরা আর কুড়ি মায়জিউ গিদরেরা জলে ভিজে থেকে পুকুরে ডোবানো পাট হয়ে গেছে, আগে এদের ন্যাংটা করে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে নে, তারপর গা সেঁকবার জন্যে আগুন জ্বালা। এই উঠোনেই বড় বড় চেলাকাঠ খুঁজে এনে জমা কর্।'

নীরব দৃষ্টিতে চতুর্দিকের জরিপ শেষ করে তারপর হরেরাম ভগতের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল দীঘল ; লোকটার অবস্থা এখন সত্যি সত্যিই বর্ষার জলে ভেসে আসা রক্তহীন উপোসী জোঁক যেন, কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই আবার হড়ের গলার টুঁটির ওপর চেপে বসে অল্পক্ষণের মধ্যেই পিপের মতো ফুলেফেঁপে উঠবে।

দীঘল আর নিজেকে বেশি চিন্তা করার অবসর দিল না, জ্বালাময় ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল, 'তোর কাছে আমার অনেক ঋণ, না রে ভগত? তোর দু-পুরুষের কাছে আমার তিন পুরুষের ঋণ, আর পুরো সুদও বাকি!'

তারপর দীঘল হাতের কাপি দিয়ে হরেরামের ডান বাহুতে সুদৃঢ় আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা পায়রার ঝরা পালকের মতো সম্পূর্ণ নিঃশব্দে মাটির ওপর খসে পড়ল, আর সেই স্বল্প অবসরে হরেরাম ভগতও একটা তীক্ষ্ণ স্বরের কাতরোক্তি করে ভূলুণ্ঠিত হল।

নিজের আকস্মিক নিষ্ঠুর কীর্তির দিকে দীঘল ঝুঁকে দেখল একবার, আর আগের চেয়ে অধিকতর ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলল, 'নে ববু, এতদিনে তোর চারআনা সুদ শোধ হয়ে গেল। আর বেশি দুঃখ নেই তো তোর?'

হরেরাম ভগতের অচেতন দেহটাকেই উদ্দেশ করে কথা বলে দীঘল, নিরর্থক কথা, তবু তার অপার পরিতৃপ্তি। তারপর সে একজন অতি নিপুণ কশাইয়ের মতো হরেরামের বাকি হাতপাগুলো কেটে ফেলে. সেই সময় মুখে তার অনর্গল বাক্যধারা. 'এই নে রে ভগত তোর আট আনা সুদ, এই বারো আনা, আর এ হল পুরো এক টাকা।'

উর্ধ্বতন দু পুরুষ, আর নিজেকে নিয়ে তিন পুরুষের ঋণের সুদ চুকিয়ে দীঘল এবার উঠে দাঁড়াল। এইটুকু পরিশ্রমেই যেন তার প্রাণান্তক হাঁফ ধরে গেছে। মুক্ত শ্বাস নেবার অবসরে অকৌতূহলী শিথিল দৃষ্টিতে বিশাল প্রাঙ্গণের অন্যত্র তাকিয়ে দেখতে লাগল সে।

ওদিকেও তিনি পুরুষের ঋণ পরিশোধের ব্যাপক আয়োজন। পাশাপাশি শায়িত পাঁচটি উলঙ্গ নারী। নিয়তির কৌতুকে তারাও তিন পুরুষ। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধহীন। যেন সম্পূর্ণ মৃতকল্প। আজন্মকাল ক্ষুধার্ত হাড়গাড়ের মতো হুড়ের দল তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষুধিত নেকড়েদলের সুমুখে আচম্বিতে প্রাপ্ত ভোগের উপকরণ।

দীঘল অবাক, ঐ বুড়িটার মধ্যে কি এক কণা সুখ পরিবেশনের ক্ষমতা আছে, ও তো নিজেই বিগলিত যৌবনা নরক! কিন্তু নিজে বাসনার বশে উত্তেজিত হয়ে পড়ার ভয়ে এ দৃশ্য সে বেশিক্ষণ দেখল না, বাহার কঠিন নিষেধ। তার মাথার দিব্যি!

এই সুপরিসর প্রাঙ্গণের আর একদিকে হাত পা আবদ্ধ অবস্থায় আরও সাতটি নগ্নদেহ মানুষ। এক রজ্জুতে বেঁধে উদ্যত কাপির তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতাত্মক শাসনে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। অদূরেই এই দেহসমূহে মরণোত্তাপ দেওয়ার আয়োজন চলছে।

চিতা প্রস্তুত, হুল হড়ের দল জীবন্ত শবগুলিকে সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একান্ত যত্নের সঙ্গে তাদের চিতা-শয়ান দেওয়া হল। নিখুঁত সজ্জারীতি। নিচের স্তরে বয়স্ক তিনটি মানুষ, আর তাদের বুকের আশ্রয়ে চারটি শিশু। ওপর থেকে পুনরায় চেলাকাঠের বিপুল বোঝা চাপানো হচ্ছে, যাতে আগুনের উত্তাপ পেয়ে মৃতকল্প দেহগুলি হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে চিতা বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম না হয়।

লক্ষ্মীমন্ত মহাজনের কুঠিতে কোনো অভাব নেই। কিন্তু আশ্চর্য, অতগুলি মানুষের কেউ একটুও চেঁচাচ্ছে না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মুমূর্ষুও সচেতন হয়ে ওঠে, সেই চেতনার বশে তারা প্রাণরক্ষার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে না। তবে কি এই

অপ্রীতিকর চিৎকারের ভয়ে আগে থেকে তাদের জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে? কিন্তু মূকের মুখ থেকে একটু দুর্বোধ্য কাৎরানি, অথবা শীররের অস্থির ভাব; তাও তো অনুপস্থিত!

সাধারণ মানুষের পক্ষে ডাইনীর মতো মড়া নিয়ে খেলায় কোনো আনন্দ নেই। তিন পুরুষের ঋণমুক্তির স্বাদ কেমন যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে!

এই মুহূর্তে কানহু রাধা নামের সবচেয়ে কচি মেয়েটার গায়ের ওপর থেকে উঠে পড়ল, তার জায়গায় অন্য এক প্রতীক্ষারত হুল হড়্।

কানহুর মুখে সমূহ পরিতৃপ্তির চিহ্ন, দীঘলের কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে তোর ধার শোধ দেওয়া হয়ে গেছে? এবার ওদিকে যা, জায়গা খালি হবে এখুনি, হলেই শুয়ে পড়বি। তারপর যাবার সময় মেয়েগুলোকেও চিতায় দিয়ে যাব। রোজই তো নতুন নতুন পাওয়া যাবে, পুরনো জিনিস জমিয়ে রেখেই বা লাভ কি? আর এ বোঝা টেনে নিয়ে কোথাও যাওয়াও যাবে না।'

না, ওদিকে যাবে না দীঘল। যুদ্ধ-শেষ না হওয়া অবধি বাহার নিষেধ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কিন্তু ভেতরকার এত কথা কানহুকে না বলে সে শুধু উত্তর দিল, 'না, আমার মূল ধার শোধ হয়নি, শুধু সুদটাই হয়েছে।'

চিতা জ্বলছে, পাকা কাঠে আগুনের আঁচ লেগে ওদিক থেকে অল্পবিস্তর শব্দ ভেসে আসছে, বাদবাকি নিস্তব্ধ। হড়্ যেমন আমৃত্যু দীকুর পায়ের কাছে পড়ে বৃথা জীবনভিক্ষা করেছে, তারই বিপরীত পুরাণ দেখতে চেয়েছিল দীঘল, কিন্তু তার সে সৌভাগ্যের পথে ঐ লোককটি যেন জেনেশুনেই কাঁটা দিয়ে রেখেছে। নিজেদের মৃত্যুর সময়ও তারা দীঘলকে সুখী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের পর পরিতৃপ্ত দেখতে চায় না।

ক্রোধের বশে দীঘলের শরীরের রক্ত মাথায় গিয়ে উঠল, তারপর সে মাটির ওপর উঁচু হয়ে বসে পড়ে হাতে কাপি দিয়ে হরেরাম ভগতের গলার নলিটা কেটে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই ফিনকি রক্তধারায় তার নিজেরই মুখচোখ ভেসে গেল।

চোখ দুটি অন্ধ, জিভে গরম রক্তের স্বাদ, হাতের স্পর্শে নিহতের গলার কাটা নলিটা খুঁজে নিয়ে দীঘল সেখানে মুখ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। দু পুরুষ ধরে ভগত পরিবার তার তিন পুরুষের রক্ত শোষণ করেছে এবার তাই সবটাই সে ফেরত নিয়ে নিজের রক্তের সঙ্গে মেশাবে।

একান্ত নিষ্ঠা ও মনোনিবেশের সঙ্গে দীঘল হরেরাম ভগতের রক্তপান করছিল

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নাকে অতিরিক্ত পোড়া গন্ধ লাগতে বিকৃত মুখাকৃতি করে সে উঠে দাঁড়াল। ঐ কাঁচা মানুষপোড়া দুর্গন্ধে তার রক্তপানের সমস্ত পরিতৃপ্তি নষ্ট।

তবু উঠে দাঁড়ানোর পরে আকণ্ঠ রক্তপানের দরুন দীঘলের সশব্দ উদ্গার উঠল একটা, মাথাটাও যেন একটু ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। রক্তে কি কড়া পউরর নেশা জাগে? এই সময় দীঘল দেখল তার হুল হড়্ সঙ্গীরা মেয়েগুলোকে এক এক করে তুলে নিয়ে গিয়ে চিতার সতেজ আগুনে গুঁজছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বা মরে গিয়ে থাকবে, সেগুলির ব্যাপারে নরহত্যার পাপ অর্সাবে না।

মহাজনের রক্তপানে নেশাগ্রস্ত ও পরিতৃপ্ত হুল হড়্ দীঘল টুডু কুঠির প্রকাণ্ড হাতা ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এমন অপূর্ব উৎসব রজনী সে ইতিপূর্বে দেখেনি। তার জীবন ধন্য, হড়্ জন্মের পূর্ণ সার্থকতা।

বোরিওবাজার গঞ্জ এলাকা জুড়ে অপূর্ব আলোকসজ্জা, বিজয়ী হুল হড়ের পৈচাশিক জয়োল্লাস, চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত রণবাদ্য এ জীবনে ভোলবার নয়। কানহুর প্রত্যাগমন চিন্তায় দীঘল একবার পেছন পানে তাকাল, মহাজনের দরিদ্র নিকেতন পুড়ছে। সেখানেও অনেক আলো। কুঠি জ্বলছে, ভগতের হিসেবের খাতাপত্র সব পুড়ে ছাই হচ্ছে।

দীঘল আন্তরিক খুশি, তার তিন পুরুষের ঋণের তিলমাত্র নাম-নিশানা আর নেই!

তেইশ

It is only by striking terror into these blood-thirsty savages, who have respected neither age nor sex, that we can hope to quell this insurrection. It is necessary to avange the outrage committed, and to protect the cultivators of the plain from a repetition of them. The santals belive that they can enjoy the luxary of blood and plunder for a month without a certainty of retribution. It is absolutely necessary that this impression should be removed or obliterated, if Government would not

in these districts sit on bayonet points.…

পত্রিকার জোরাল নিবন্ধের প্রতিটি শব্দ সবিশেষ স্পষ্ট ও বিলম্বিত উচ্চারণে পড়তে পড়তে এলিজাবেথের উত্তেজিত মুখভাব নিবিড় আরক্তিম হয়ে উঠেছে, তবু অদমিত এবং উত্তেজিতভাবে পড়ে চলেছে সে।

শেষাবধি শ্রীমতী ম্যাক্সে পত্রিকাটি এলিজাবেথের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সোফার এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। জুলাই আঠারোশ' পঞ্চান্নর ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া। কন্যার কাছ থেকে পত্রিকাটি কেড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরও তিনি ব্যঙ্গভরে ছোট্ট মন্তব্য করেন, 'আহা, কি অপূর্ব দরদ!'

মনের অবাধ্য বিরক্তিভাব যথাসম্ভব দমিত রেখে এলিজাবেথ শান্ত স্বরে প্রতিবাদ করে, 'পত্রিকাটা পড়ছিলাম যখন হঠাৎ কেড়ে নিলে কেন, শেষ পর্যন্ত আমায় না হয় পড়তেই দিতে, তোমার ইচ্ছে না থাকলে শুনতে না?'

'এসব বাজে বুক্‌নি পড়ে বা শুনে কি লাভ?' শ্রীমতী ম্যাক্সে গভীর অনাস্থা ও অনীহার সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'এমন অপদার্থ সরকারের যারা কর্তাব্যক্তি, যাদের পিঠে চাবুক মারলেও ঘুম ভাঙবে না, শুধু কাগজের ওপর কালির আঁচড় তাদের চোখের সমুখে ধরে দিয়ে লাভ কি?' বলতে বলতে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন তিনি, 'জেসাস তো জানেন, এই এক মাস যাবৎ আমরা কি অবস্থায় রয়েছি? যে কোনো মুহূর্তে এই পৃথিবী থেকে আমাদের অতি নির্মমভাবে চলে যেতে হতে পারে। তা হবেই তো, পয়সার লোভে আমরা স্বদেশ ছেড়ে বর্বর সমাজের মধ্যে বাস করতে এসেছি! রেশমকুঠির মিস্টার আলফ্রেডের ভাগ্য ভাল, তিনি বিষয়-সম্পত্তির লোভ ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে গিয়ে বেঁচেছেন, আর আমাদের ইনি,' তিনি স্বামীর দিকে তাকালেন, 'পচা সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে আমাদের অগাধ বিপদ-সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলেন।'

শ্রীমতী ম্যাক্সের বিরূপ মন্তব্যের উত্তরে মিস্টার ম্যাক্সে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, 'এই যে বিদ্রোহ হয়েছে তা—'

এতক্ষণ অবধি পানপাত্র হাতে নিয়ে মিস্টার টেরিউড নীরব শ্রোতার মতো চুপ করে বসেছিলেন। মিস্টার ম্যাক্সের মতো তিনিও একজন নীলসাহেব। যৌথ প্রচেষ্টা ও আয়োজনে নিরাপত্তার সন্ধানে তিনি প্রায় দশদিন যাবৎ ম্যাক্সের অতিথি। আর এক অতিথি হলেন অম্বরের রেল পর্যবেক্ষক মিস্টার জন টেলার। এবং আরও কয়েকজন।

হাতের নিবিড় স্পর্শে ধৃত পানপাত্রটি ঠক্ করে সামনের তেপায়ার ওপর

নামিয়ে রেখে টেরিউড বলে উঠলেন, 'বিদ্রোহ, কিসের জন্যে বিদ্রোহ, কার বিরুদ্ধে কার বিদ্রোহ ? শাসক শক্তির বিপক্ষেই বিদ্রোহ হয়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঐ বর্বরগুলো বার বার বলছে, তারা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না, আমাদের সম্পর্কেও তাদের বিশেষ রাগ নেই, এই হিংসার মূল লক্ষ্য বাঙালী, মহাজন আর দেশী জমিদার, যাদের তারা রক্ত শোষক বলে মনে করে, কিন্তু এদের কেউই দেশ শাসন করে না। বিদ্রোহ করার মধ্যে একটা নৈতিক দাবি থাকতে পারে ; আর এটা হল যারা শারীরিক শক্তি ও অস্ত্রবলে দুর্বল তাদের ওপর অত্যাচার। এই ন্যায়নীতিহীন চরম হিংস্র ব্যাপারটাকে আমি বিদ্রোহ নাম দিয়ে গৌরবান্বিত করতে চাই না। এরা যা চালিয়েছে তার নাম অসম দাঙ্গা। দাঙ্গাবাজদের সমূলে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত আমাদের মহামান্য কোম্পানীর অপযশ ঘুচবে না।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর উত্তেজনা দমন করে নিয়ে মিস্টার টেরিউড আবার বললেন, 'হিন্দু আর মুসলমানদের সঙ্গে সুঁতারদের যে জাতধর্মের ব্যবধান সে প্রসঙ্গ বাদ দিলে বলা যায় এ হল সুঁতারদের ঈর্ষাপ্রসূত শ্রেণী সংগ্রাম। দ্রাবিড় উপজাতি সুযোগ সুবিধে পেয়ে খুনোখুনি করেছে, কিন্তু যাকে যুদ্ধ বলে, তেমন কিছুতে অংশগ্রহণ করেছে, ইতিহাসে এ উদাহরণ আমরা খুব বেশি পাইনি ; তাহলে ভারতবর্ষের মানচিত্রই অন্যরকম হত। প্রবল রাজশক্তির বিপক্ষে দাঁড়ানোর মতো নৈতিক সাহস তাদের কোনোদিনই হয়নি।'

টেরিউড নীরব হলেন, তারপর পানপাত্র আবার হাতে তুলে নিয়ে আগের মতোই চুমুক দিয়ে চললেন তিনি।

মিস্টার টেরিউড ও ম্যাক্রে পরিবার এবং জন টেলার ছাড়াও এ কক্ষে আরও সাত আট ব্যক্তি উপস্থিত। সকলেই যেন সম্ভাব্য আশঙ্কাবশত একসঙ্গে দানা বেঁধে রয়েছে, কিন্তু মিস্টার টেরিউডের যুক্তিপূর্ণ কথার পর তারা সম্পূর্ণ নীরব।

সন্ধ্যের ঝিঁঝিডাকা বিচিত্র নীরবতা ছাপিয়ে বাইরে ঘোর ধারাবর্ষণের শব্দ। বাংলোর বিশাল প্রান্তরে অনেকগুলি শাল পলাশ বট অশ্বত্থের মহীরুহ, সে সব যেন আজ ঝঞ্ঝাঘাতে সবিশেষ প্রাণচঞ্চল। তীব্র এলোমেলো বাতাসের সংঘর্ষে অবিরাম প্রাণান্তক মর্মরধ্বনি কক্ষের নীরবতাকে মুহুর্মুহু আঘাত করে যাচ্ছে। সান্ধ্যবর্ষণ ভালই লাগে মিস্টার ম্যাক্রের, কিন্তু এবার যেন এই সময়টা বিপুল অস্বস্তির মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে, কোনো ব্যাপারেই স্থির মনোনিবেশ করতে পারেন না তিনি, সর্বত্রই ঘোর মসীকৃষ্ণতার ছাপ।

এই অস্বস্তিকর উপলব্ধি থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে আনার উদ্দেশ্যে বেশ কিছুক্ষণ পরে টেরিউডকে সমর্থন জানিয়ে মিস্টার ম্যাক্সে বলেন, 'এখন আমি আপনার কথা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি মিস্টার টেরিউড! কিছুদিন আগে সুঁতাররা আমার কাছে এসে প্রস্তাব করেছিল, আমরা যদি এই দাঙ্গায় তাদের সমর্থন করতে রাজী হই, রসদ সরবরাহ করি, তাহলে তারা আমাদের বন্ধু হয়ে যাবে। আমি ঐ জঘন্য প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বর্বরদের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব বা সন্ধি কি, বিশেষত এই হীন আর জঘন্য হত্যা ও কার্যকলাপের ব্যাপারে?'

'অর্থাৎ আপনি আমাদের সবার পক্ষ থেকেই তাদের শত্রুতা আমন্ত্রণ করে নিলেন, তার চেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকারের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণের জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা দাঁড় করিয়ে রাখলেই পারতেন?' সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে রেল পর্যবেক্ষক ম্যাক্সের আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন নয়, পরোক্ষে দোষারোপ যেন।

'হয়তো তাই করেছি।' জন টেলারের অভিযোগ মিস্টার ম্যাক্সে অস্বীকার করেন না, তিনি পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে উত্তর দেন, 'কিন্তু তার জন্যে আমরা তো তৈরি? আমাদের সঙ্গে পাঁচটা বন্দুক রয়েছে, তবে তা ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না।' তারপর তিনি অতিরিক্ত সাহস ও সবিশেষ অবজ্ঞা দেখিয়ে বলেন, 'এক লক্ষ কাকের পালকে ভয় দেখিয়ে সরাবার জন্যে বন্দুকের একটা ফাঁকা শব্দই যথেষ্ট।'

জন টেলার সেই মুহূর্তে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'রাজমহলের ঘটনা কিন্তু অন্য কথা বলে। তবে একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, সংগিদালান প্রাসাদ হাতের মুঠোয় পেয়েও সুঁতাররা হঠাৎ তা ছেড়ে দিয়ে গেল কেন?' প্রশ্নের শেষে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে টেরিউডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এ জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর মিস্টার টেরিউডের কাছে নেই, জন টেলারের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সুমুখ থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। চোখ সরালেও কিন্তু মন থেকে জিজ্ঞাসাটাকে বিদায় দিতে পারলেন না তিনি। বিষয়টা কেমন যেন অবিশ্বাস্য। অথবা বিস্ময়জনক।

ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর সমন্বিত প্রাসাদ রাজমহলের সংগিদালান।

বাংলার নবাবী আমলের সৌধশ্রেণী, নবাব সিরাজের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তির শেষ অধ্যায়স্বরূপ। বিবিধ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে মনে হয় সংগি-দালানের একক পরিচয়ই যেন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ। অখণ্ড ইতিহাস।

ভাগলপুর হয়ে বারাণসী যাত্রাকালে ওয়ারেন হেসটিংস রাজমহলের সংগিদালান প্রাসাদে কিছুদিন বাস করেন। নামেই তা বিশ্রাম। বস্তুত এখান থেকেই বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা জল্পনা-কল্পনা এবং চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যা পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাসে পট পরিবর্তনের সঙ্গে সমূহভাবে বিজড়িত। বারাণসীর রাজা ও অযোধ্যার নবাবের অন্তিম পরিণতির মানচিত্র নিজের মানসপটে হেসটিংস সংগিদালানে অবস্থানকালেই চিত্রিত করেন।

হেসটিংসের পরবর্তী যুগেও সংগিদালান ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়নি। সুঁতার হুলের সময় এই প্রাসাদ রাজমহলের রেল পর্যবেক্ষকের আবাস ও বিভাগীয় দপ্তর। এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয় এবং যুদ্ধ শিবির।

ইতিপূর্বে হড়্ সুবাহ্ সিধু রাপাজের শারজম পাতড়া সদর্পে প্রচারিত হয়েছে, আগামী তিন দিনের মধ্যে শহর রাজমহল আক্রান্ত হবে। প্রাণ ভয়ে ত্রস্ত দীকু ও মোগল শহরবাসী নিরাপদতম আশ্রয়ের সন্ধানে নগরের সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গতুল্য স্থান সংগিদালানে এসে আত্মগোপন করেছে।

এ যুদ্ধে সিধু কানহুর যৌথ নেতৃত্বের ভূমিকা। কানহুও এখন সিধুর মতোই রাজা উপাধিধারী, হড়্ সুবাহ্ কানহু রাপাজ!

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে রাজমহল ও ভাগলপুরের কালেক্টার মিস্টার লুসিংটনও সসৈন্য রাজমহলে উপস্থিত। কিন্তু অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর তিনিও এখন দামিন পর্যবেক্ষক মিস্টার পনটেটের মতো সংগিদালানে আশ্রিত। হড়্ সমাজের পক্ষে অতি বিশ্বস্ত ও পরম সমাদরের পুঁটিয়া সাহেব!

সংগিদালান প্রাসাদের বাইরে থেকে আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রায় এক হাজার কোম্পানীর সৈন্যের অবরোধ। তার অর্ধেক ভাগলপুর থেকে আগত পাহাড়ী ফৌজ, যে দলে অধিকাংশই হিন্দু সিপাহী।

হুল হড়ের আক্রমণ সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে মীন প্রবাহের মতো। বিপুল সংখ্যাধিক্যই তার মূল এবং মৌলিক বল। কিন্তু বিপরীত দিকে কোম্পানীর পক্ষে অকস্মাৎ এক জায়গার জন্যে সমসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য।

কেবল সৈন্যই নয়, উপযুক্ত যুদ্ধ সম্ভারও প্রয়োজন। হাতির মূল্য আপত-

কালীন সুযোগ বুঝে পাঁচশ', আর ঘোড়ার দর উঠেছে একশ' টাকা। কোম্পানীর কাছে মূল্যচুক্তি পাওয়া সময় সাপেক্ষ, সেই ভয়ে যত মোষ আর গোরুগাড়ি অনধিগম্য গ্রামাঞ্চলে পলায়িত।

রাজশক্তির চির বশংবদ জমিদারবর্গের আনুকূল্য নিয়ে বেগারের জন-মুনিষ ধরা দূরের কথা, দৈনিক দু-আনা মজুরীর প্রতিশ্রুতিতেও উপযুক্ত লোক জোটে না, বর্ষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সবাই তারা চাষী।

আর এক বিপত্তি, বহু বছর যাবৎ বিবিধ অনুযোগ নিয়ে দেশী সিপাহীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ; তাই যে কোনো মুহূর্তেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা বর্তমান। এ অবস্থায় কোম্পানীর পক্ষে দেশী সৈন্যে দল ভারি হতে দেওয়া অযৌক্তিক এবং অবিবেচক প্রশ্রয়। সবদিক দেখেশুনে পর্যালোচনা করে মনে হয় বর্তমানে কোম্পানীর সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা সুপ্রকটিত।

শারজম পাতড়ার সাহায্যে ঘোষিত মেয়াদের তৃতীয় দিনে কোম্পানী ফৌজের সুদৃঢ় অবরোধের বাইরে থেকে হুল হড়ের নিবিড় পরিবেষ্টন। একজন লুণ্ঠিত ডাক রাণারের হাতে অন্যতম পাতড়া শিউড়ির পথে পাঠানো হয়েছিল, সেখানেও আজ নির্ধারিত যুদ্ধতিথি। সে দল গেছে সিধু কানহুর অপর দুই ভাই ভৈরব আর চান্দোর পরিচালনায়। আধা শহর আধা আতো দুমকায় হুল হড় অধিক সংখ্যাবলে শক্তিবৃদ্ধি করে শিউড়ি অবরোধ করবে। আবার ভিন্ন দুটি শাখা বৃহত্তম পরিকল্পনা নিয়ে অন্য কোথাও মিলিত হবে। হাতে সময় নেই বিশেষ।

ঘোষিত যুদ্ধ, অধিকন্তু সিধু ও কানহু, সুবাহু উপাধিধারী দুই যোদ্ধা রাজা উপস্থিত, তাই সুসভ্য জাতির সমরনীতি অনুযায়ী এ যুদ্ধে বিষ-নিষিক্ত তীর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। এবং একমাত্র দীকু আর মোগল ভিন্ন যদি অপর কেউ আত্মসমর্পণ করে তার প্রতি যুদ্ধবন্দীর পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে সিধু।

আর অতিরিক্ত আদেশ, দীকুর তুলনায় যেন মোগলের শাস্তির বহর সর্বদাই কম হয়, টাকায় এক আনা দেড় আনা। যে কোনো অবস্থায় দীকুর প্রতি ঘৃণিত সারমেয়ের তুল্য ব্যবহার প্রদর্শনে অন্যায় নেই, কারণ সেখানে হড় পূর্বপুরুষের প্রতি অকথ্য ব্যবহারের সমুচিত উত্তর, এবং বংশ পরম্পরার আকণ্ঠ ও অযুত পরিমাণ ঋণ পরিশোধের প্রসঙ্গ বর্তমান। আজন্মকালের শত্রু, কণ্ঠকাবৃত গুল্মলতা

ও রক্তপায়ী জোঁকের মতো মহাজনের শেষ রাখতে নেই ; এ কেবল হড়্ শাস্ত্রের কথা নয়, সর্বশ্রেণীর মানুষের অভিজ্ঞ উক্তিবিশেষ।

সংগিদালান প্রাসাদ-শিবিরে দূত পাঠাল হড়্ সুবাহ্ সিধু রাপাজ, 'আমরা পোও সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না, তোরা শুধু দীকুদের আর মোগলদের ওড়া থেকে বের করে আমাদের হাতে তুলে দে। দীকুদের কাছে হড়ের অনেক পুরুষের ধার, আমরা আর ঋণী থাকতে চাই না। আর মোগল হল দীকুর দালাল, দীকুর চর।'

গম্ভীর মুখভঙ্গির সঙ্গে কালেক্টার লুসিংটন দূতের প্রস্তাব শুনলেন, তারপর সেই দূতের মারফতই উত্তর পাঠালেন তিনি, 'দীকু আর মোগল আমাদের প্রজা। কোম্পানীর দৃষ্টিতে প্রজার ভেদাভেদ নেই, সব শক্তি এক করে তাদের রক্ষা করা হবে। তোমরা এক ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ কর, কিংবা এখান থেকে সরে যাও, নয়তো দাঙ্গাবাজদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমরা জানি। অর্ধেক পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, বিদ্রোহীদের কেমন করে, আর জুতোর কোন্‌খান দিয়ে, চেপে রাখতে হয় সে শিক্ষা আমাদের যথেষ্ট আছে।'

সিধুর প্রেরিত দূত ফিরে এসে আর একটি অতিরিক্ত খবর দিল, সংগিদালান ওড়ায় পুঁটিয়া সাহেবকে দেখে এসেছে সে, চুরুট মুখে কালেক্টারের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কোনো তরফেই বলেননি কিছু। কারও পক্ষেই ওকালতি করেননি। আরও দু-চারজন সাহেবকে সে একই জায়গায় দেখেছে। তাদের একজনের পরনে ফৌজী পোশাক, চেহারাও বেশ রাশভারি, গুরুগম্ভীর।

একজন সাহেবের পরনে ফৌজী পোশাক শুনে সিধু ভ্রূকুঞ্চিত করে, এ সাহেব তাহলে সেই ডেপুটি কমিশনার এডেন ? ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে তিনি দু-চারশ' জন সিপাহী নিয়ে সুঁতার হুল দমনের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। সুঁতার যে ক্ষেপে উঠলে কালসাপের মতো শিরে দংশন করতে পারে সে খবর বোধহয় কোম্পানীর ঐ ফৌজী সাহেবের জানা নেই ?

আসন্ন যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে প্রতিপক্ষের সঙ্গে চরম বাক্য বিনিময় হয়ে গেছে। আর বৃথা সময় ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। সিধুর ইঙ্গিতে বহু সংখ্যক হুল হড়্ দ্রুত তৎপরতায় আশপাশের উঁচু গাছগুলিতে উঠে পড়ল। নিচেও অনেকেই রয়েছে।

যুদ্ধ দামামা বেজে ওঠে। সংগিদালানের দিক থেকেই প্রস্তুতি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক ইংরেজি বাজনায় যুদ্ধের ভেরী নিনাদিত হতে আরম্ভ করেছে। তারপর

অত্যন্ত অতর্কিতে এবং একসঙ্গে প্রায় একশ'টি বন্দুক থেকে নিক্ষিপ্ত গুলি সংগিদালানের দিক থেকে ছুটে এসে হড়ের ঝাঁকের মাঝে ছিটিয়ে পড়ল।

এবং তৎক্ষণাৎ এদিক থেকেও অন্তত এক হাজার তীর বর্ষণে যথোচিত উত্তর প্রেরিত হল। অনেকগুলির মুখে আগুনের পুঁটুলি বাঁধা। এই জবাবের প্রত্যুত্তরে আবার কামানের গর্জন।

যুদ্ধটা ভালরকম জমে ওঠার আগেই কিছু বেমাত্রা ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার যৌক্তিকতা নেই, অতএব সিধু একটি ছোট্ট নির্দেশ দেয়, 'ঝাঁপিয়ে পড়্।'

আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ, যুদ্ধের গতি নিয়ত অগ্রপশ্চাৎ, এবং এইভাবেই তুটি দিন ও তুটি অখণ্ড রাত কেটে গেল। প্রথম দিন সন্ধ্যের পর দেশী সমরনীতি অনুযায়ী সিধু যুদ্ধ স্থগিতের আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে দেখা গেল ওদিক থেকে কোম্পানী ফৌজ এ সুযোগ বেশ ভালভাবেই সদ্ব্যবহার করছে, তাই মধ্যরাত অতিক্রম করার আগেই হুল হড় আবার তাদের রণনীতিতে আধুনিক পরিবর্তন সাধন করল।

তু-আড়াই দিনের ঘন প্রতাপী যুদ্ধে কোম্পানীর ফৌজ কতই বা মরেছে, বড়জোর তু-তিনশ', তার অতিরিক্ত নয়। অধিকাংশই দেশী সিপাহী, যারা চিরদিনই কর্তব্যপরায়ণ এবং যুদ্ধকালে অগ্রণী। আর সেইসব পাহাড়ী, যাদের জোর করে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পালাতে গিয়েও তাদের মধ্যে পঞ্চাশ ষাটজনের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

সাহেব সৈন্য, যুদ্ধের সময় তারা হয় গর্ত খুঁড়ে বসে থেকে বন্দুক চালায়, নয়তো নিরাপদ আশ্রয়ে সরে দূর পাল্লার কামান দাগে। তবু সাগরের ওপার থেকে এসে তাদের জন দশেককে এপারের মাটিতে কবরস্থ হতে হল। কিন্তু এ মৃত্যু যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নয়, যেন নিয়তির নির্দেশ। তা না হলে এতখানি নিরাপত্তার মাঝে তারা মরত না।

সে তুলনায় হুল হড়ের পক্ষে ক্ষয়ের পরিমাণ অনেক বেশি, অংকের হিসেবে মৃতের সংখ্যা হাজারের উর্ধ্বে। এই বিপুল অংক গণনা করা যে কোনো হড়ের কাছেই অসম্ভব, তাই একসঙ্গে কুড়ি গুণে ভাগ করে রাখা আড়াই কুড়িটি স্তূপ অতিক্রম করে গেল। তারপর আরও সাতটি। যুদ্ধে সিধু ও কানহু উভয়েই অল্পাধিক আহত। অন্যান্য আহত হুল হড়ের সংখ্যাও অনেক, কিন্তু সে গণনার ঝুঁকি নিল না কেউ।

মৃত্যুর মুখরতাময় বিপর্যয়ের পরে হুল হড়্ই যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ। সংগিদালান প্রাসাদ দুর্গ তাদের অধিকারে চলে এসেছে। সুবিশাল প্রান্তরে বিরাট প্রাসাদ। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী অনেক গুপ্ত কক্ষ অবশ্যই আছে, এরই ভেতর পাজী দীকু আর তাদের দালাল মোগলদের সাহেবরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে? কিছুক্ষণ পর্যন্ত বৃথা অনুসন্ধান চলল।

সিধুর বাঁ বাহুতে বন্দুকের গুলির আঘাত, তীরের ফলার সাহায্যে সেটি খুঁচিয়ে বের করার পর ঘায়ে জংলী লতার শেকড বাটার প্রলেপ লাগিয়ে গাছের ছাল দিয়ে সেই ক্ষতস্থানে পটি বাঁধা।

আহত হাতটা সবিক্রমে আকাশের দিকে তুলে ফৌজী সাহেব এডেনের উদ্দেশে সিধু হুমকি দেয়, 'দীকু আর মোগলদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস সাহেব, তাদের বের করে আমাদের হাতে তুলে দে, নয়তো এই ওড়া সুদ্ধ সকলকে পুড়িয়ে মেরে ফেলব।'

এডেনের গম্ভীর মুখাবয়বের নিচে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া মূর্খ হড়ের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না; সিধুর চোখের দিকে জ্বলন্ত নেত্রে তাকিয়ে তিনি দ্বিধাহীন উত্তর দেন, 'এখনো আমরা হার স্বীকার করিনি, তাই আশ্রিত প্রজাদের তোমাদের হাতে তুলে দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।'

'তাহলে আমরা ওড়ায় আগুন ধরিয়ে দেব।' সিধুর কথাটাই কানহু দ্বিরুক্তির মতো বলে।

এই বিতর্কের সময় উভয় পক্ষের মাঝে এসে দাঁড়ালেন দামিন পর্যবেক্ষক মিস্টার পনটেট, হড়ের প্রিয় পুঁটিয়া সাহেব। তাঁর মুখে চুরুট, হাতে চুরুটের বাক্স।

একটা চুরুট বের করে সেটি সিধুর দিকে এগিয়ে পুটিয়া সাহেব হড়্ ভাষায় প্রশ্ন করেন, 'তুই তো আতো ভাগনাডিহির সিধু মাঝি না; হাতে কি গুলি বিঁধেছে, বের করা হয়েছে তো?'

এ সমবেদনামূলক জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়ে সিধু যথাসাধ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিজের দাবি পেশ করে, বলে, 'সাহেব, তোরা ওড়া থেকে পাজী দীকু আর দালাল মোগলদের বের করে আমাদের হাতে তুলে দে, আমরা দীকুদের ধার শোধ করব, মোগলদের দোষের শাস্তি দেব।'

সিধুর চেয়ে পুঁটিয়া সাহেব আরও বেশি গম্ভীর, ঋণ পরিশোধের প্রসঙ্গ উঠতে তিনি বলেন, 'তোরা যা চাস তাই হবে, কিন্তু তার আগে আমার

ধার শোধ কর তো? পাহাড়ীদের তোরা তুপুঞ করেছিলি, তীর বিঁধে খুন করেছিলি, আমি তবুও তোদের বেঁধে ফাটকে চালান করিনি, ফাঁসিকাঠে খুনীদের ঝুলিয়ে দিয়ে প্রাণ নিইনি; এটা কি আমার কাছে তোদের প্রাণের ঋণ নয়?'

পুঁটিয়া সাহেবের এ প্রশ্ন কেবল সিধু কানহুর কাছে নয়, তাদের মাধ্যমে সারা হড়্ সমাজকে প্রশ্ন করেছেন তিনি। হড়্ অকৃতজ্ঞ নয়, প্রকৃত ঋণ সে অস্বীকার করে না কখনো; তবু এ ক্ষেত্রে সিধু জবাব দিতে গিয়ে বেশ খানিকটা বিব্রত হয়ে সমাধান এবং সদুত্তরের আশায় কানহুর মুখের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে।

সিধুর পরিবর্তে কানহুই পুঁটিয়া সাহেবের কথা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে, 'হ্যাঁ, ঋণই তো!'

'তাহলে আমার ধার শোধ করবি?' পুঁটিয়া সাহেব জিজ্ঞেস করেন।

সিধু ও কানহু উভয়েই একসঙ্গে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'প্রাণের বদলে প্রাণ,' চুরুটের ধোঁয়া ফেলে পুঁটিয়া সাহেব বলেন, 'তোদের প্রাণ বাঁচিয়েছি, তাই দীকু আর মোগলদের আমার হাতে দিয়ে যা, তাদের নিয়ে আমি যা খুশি করব।'

'তুই তো তাদের বাঁচিয়ে রাখবি সাহেব?' সিধু সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে।

সঙ্গে সঙ্গে পুঁটিয়াসাহেব দ্বিধাহীন উত্তর দেন, 'হ্যাঁ। তোদেরও তো সেদিন ফাঁসি যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সিধু ক্ষুন্নকণ্ঠে বলে, 'নে তবে, ঐ পাজী দীকু আর মোগলদের নিজের কাছে রাখ।' তারপর সে মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গী হড়্দের উদ্দেশে আদেশ জারি করে, 'দেলা, দেলা—চল্, এখান থেকে ফিরে চল্, আমাদের এ যুদ্ধটা একেবারে নষ্টই হয়ে গেল!' পরক্ষণেই সে আবার পুঁটিয়া সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁরে সাহেব, এই যুদ্ধে তবে কে জিতল?'

'আমি।' মিস্টার পনটেট উত্তর দেন, 'কারণ আমি তো অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামিনি, তাই আমার কোনোদিনই হেরে যাওয়ার ভয় নেই।'

ফিরে যেতে গিয়েও কানহু একবার পুঁটিয়া সাহেবের কাছে এগিয়ে যায়, 'তুই তো আমায় চুটি দিলি না সাহেব?'

উত্তর না দিয়ে পুঁটিয়া সাহেব কানহুর দিকে চুরুটের বাক্সটি প্রসারিত করেন, মুখে স্মিত প্রসন্ন হাসি।

চব্বিশ

দেখে মনে হয় জলমগ্ন ত্রিভুবন।

তবু অম্বরের উত্তর আর গোকুলপুরের দক্ষিণে সমুদ্রের বুকে কূর্মাবতারের পিঠের মতো ভাসমান তেপান্তরের মাঠ হেন যে বিরাট ডাঙাটা জেগে রয়েছে বন্দীদের নিয়ে সেখানে হাজির হল গোকুলপুর আর আতো তালোয়া-ডাঙার হুল হড়্।

মেয়েদের নির্ধারিত জায়গায় পৌছনোর ব্যাপারে হুল হড়্ খানিকটা ভদ্রতা দেখিয়েছে। তেরোটি বন্দীর মধ্যে পাঁচজন মহিলা, বাকি আট ব্যক্তি পুরুষ। মহিলা দলে তিনজন তরুণী আর প্রৌঢ়ার সংখ্যা দুই। তারা পাঁচ বন্দিনী এসেছে হাতির পিঠে। দুটোই নীলকুঠির হাতি। একটি মিস্টার টেরিউডের এবং অপরটি ম্যাক্সে সাহেবের।

এই তেরোজন বন্দী ছাড়া দুটি হাতির দুই মাহুত। তবে তারা ঠিক বন্দী নয়, জাতে দীকু হলেও দূর অঞ্চলের অধিবাসী ; হুল হড়্ চেনে তাদের। দামিন-ঈকোহ্‌র রক্তপায়ী জোঁক নয় এই মানুষ দুটি। তাদের ওপর দীকু বিদ্বেষী হুল হড়ের আরক্তিম দৃষ্টির শাসন নেই, তবে সাময়িকভাবে তারা হুল হড়ের আজ্ঞাধীন।

আতো গোকুলপুরের মাঝি সুফল হাঁসদা মহিলা পাঁচজনকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাল। মাঝে তিনজন নবযৌবনা তরুণী, ম্যাক্সে-কন্যা এলিজাবেথ আর টেরিউডের দুই মেয়ে, নেলী ও এমিলি। তাদের দু-পাশে দুই প্রৌঢ়া মাতা, শ্রীমতী ম্যাক্সে এবং শ্রীমতী টেরিউড।

মনের মতো করে পংক্তি সাজানোর পর সুফল মাঝি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গময় হাসি হেসে মিস্টার ম্যাক্সের উদ্দেশে বলে, 'ও সাহেব, তোর তো নেংটা হড়্ মেয়ের দৌড় দেখতে খুব ভাল লাগত না ? এবার আমরা হুল হড়্ নেংটা মেমসাহেবদের দৌড় দেখব, আমাদের অনেকদিনের সাধ! তুই এখন মেম কুড়িদের নেংটা হতে বল্।'

মাঝি সুফল হাঁসদার সব কথা তখনো শেষ হয়নি, ম্যাক্সে সাহেবের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ থেকে মান ও প্রাণের জন্যে করুণ আকৃতি প্রকাশিত হওয়ার অবসর

জোটেনি, ইতিমধ্যে বিশ পঁচিশজন রতিসুখ ও রক্তপিপাসু হুল হড়্ ছুটে এসে জোর করে মেয়েগুলির পোশাক হরণ করে নেয়।

পাঁচটি মহিলা বুকের ওপর দু হাত জড়ো করে মাটিতে চেপে বসে একসঙ্গে প্রাণবিদারক ক্রন্দনরোল তোলে, 'ও দয়ালু জেসাস, আমাদের প্রাণ বাঁচাও ; মান বাঁচাও, আমরা সারা জীবন ধরে কুমারী মেরীমাতার মন্দিরে মোমবাতি জ্বালাব।'

আকাশের বুকে সবে সূর্যোদগম হচ্ছে, ঈশ্বরপুত্রকে আরাধনা করার পক্ষে সর্বোত্তম সময়, কিন্তু পাঁচটি আর্ত মেয়ের আবেদন ও আকুলতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়, যেন তারা চতুর্দিক থেকেই নীরব উপেক্ষায় অভিষিক্ত।

এলিজাবেথের বাহুর কাছে চেপে ধরে মাঝি সুফল হাঁসদা তাকে সবেগে টেনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে, সেই সঙ্গে সতর্কতা দেয়, 'এই মেমসাহেব, উঠে দাঁড়া, নয়তো এইসব হুল হড়্ তো হাড়গার আছে না, বাপমা'র চোখের সুমুখে তোদের ছিঁড়ে খাবে। আঃ, উঠ্ না রে, কোড়ার কাছে নেংটা হতে কুড়ির আবার কিসের লাজ ? এখানে তো শুধু হড়্ কোড়া আছে, কুড়ি নেই ?'

'হা ভগবান !' সব আবেদন বিস্মৃত হয়ে একটি ছোট্ট হুতাশ বাক্য উচ্চারণ করে কাৎরে ওঠে এলিজাবেথ, এ যেন তার মৃত্যুকাতর যন্ত্রণা।

পিতা মিস্টার ম্যাক্সের কাছে প্রবল আস্থার আশ্বাস পেয়ে খুবই নিশ্চিন্তে একটু গভীর রাতে ঘুমোতে গিয়েছিল এলিজাবেথ, কারণ অনেক রাত্তির পর্যন্ত জেগে বসে থেকে সে স্যামুয়েলের সঙ্গে এই হড়্ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। তার গবেষক চিত্ত বার বার বলেছে, কার্যকারণের অস্তিত্ব ভিন্ন ঘটনা নেই। বর্তমান বিক্ষোভের মূল অনেক গভীরে নিহিত। দূর অতীতের গর্ভ খুঁড়ে তার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

টেরিউডের দুই পুত্র, স্মিথ আর স্যামুয়েল। দুজনেই পিতার সঙ্গে নীলকুঠি দেখাশোনা করত। সম্প্রতি টেরিউড মাড়োয়ারীদের হাত থেকে অম্বরে একটি লাক্ষার কারখানা কিনেছেন, উপস্থিত সেখানকার কর্মভার স্যামুয়েলের ওপর ন্যস্ত।

স্মিথ বিবাহিত। শ্বশুর কলকাতায় রেলের পদস্থ কর্মচারী। স্মিথের স্ত্রী রেনি এখন পিত্রালয়ে। এই প্রথমবার সে মা হতে চলেছে। এবং সেই সূত্রে কি এক চিন্তাজনক খবর পেয়ে স্মিথ গত সপ্তাহে কলকাতায় গেছে, তারপর সেদিনের কোনো সংবাদই টেরিউড পরিবারের কাছে এসে পৌছয়নি। তবে এখন

কলকাতা থেকে অম্বর পর্যন্ত রেল চলেছে, এমনকি ওদিকে পশ্চিমাংশে তিন পাহাড়, আর উত্তরে শাখা লাইন রাজমহল পেরিয়ে গেছে ; তেমন কিছু দুঃসংবাদ থাকলে তা যথা সময়েই এসে পড়ত।

স্যামুয়েলের বিয়ের জন্যে পাত্রী খুঁজতে হবে না, তার বাগ্‌দত্তা বধূ অম্বরেই থাকে। স্বয়ং ম্যাক্সের কন্যা বিদুষী এলিজাবেথ। আর বিয়ের আগে আলাপ পরিচয় ঘটলে কথা ফুরোয় না, কেবল গল্পে গল্পেই রাত কাবার। তা সত্ত্বেও এলিজাবেথের ঠোঁটের ওপর শুভরাত্রি কামনার চুম্বন বিজ্ঞাপিত করার পর স্যামুয়েল তাকে জোর করে নিজের ঘরে শুতে পাঠিয়েছিল।

তারপর বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল এলিজাবেথ। ভয় শব্দটা এমনিতেই তার মনে বিশেষ স্থান পায় না, বা মনের বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয় না। যুক্তি বিনা যে কোনো জিনিসের দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দেওয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। তার ওপর এখন তো নিরাপত্তার আয়োজন ষোলোআনা। কুঠিতে পাচটা বন্দুক। পাহারাদারের দলে অতি বিশ্বস্ত রাজপুত বরকন্দাজ অন্তত দশজন।

তারপর যেন এলিজাবেথের সুখনিদ্রার মাঝেই একটা ভয়ংকর নাটকের কয়েকটি দৃশ্যাভিনয় হয়ে গেছে। সব বিষয়ে বোঝাও যায়নি ভাল করে, কেবল একটা অসহায় সকরুণ অনুভূতি, আমরা ধরা পড়ে গেছি! পাঁচ-ছ'টা বন্দুক, কয়েকজন শক্তসমর্থ পুরুষ, আর এতগুলো নিয়মিত কুস্তিলড়া, মুগুরভাঁজা, লাঠিঘোরানো, শড়কি-চালানো বরকন্দাজ এই অবস্থায় কি করল তা এখনো জানা যায়নি।

টেরিউডের পাথরের মতো ভারি ও অকরুণ গলা শুনতে পায় এলিজাবেথ, শয়তানরা যা বলছে তাই তোমরা কর, ওদের হুকুম মেনে নাও, তাতে হয়তো তোমাদের ওপর এদের দয়া হতে পারে ; যদিও বর্বরের নীতিতে কোনো মধ্যপথ নেই, তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখতে হবে।'

'ও বাবা, আমাদের বাঁচাও। হে ঈশ্বর, হে দয়াময় ঈশ্বরপুত্র, আমাদের রক্ষা কর।' টেরিউডের আদরিণী কন্যা নেলী কাঁদতে কাঁদতে বাপের কাছে আকূতি জানায়, তারপর ঈশ্বরপুত্র ও স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেও।

নেলীর বিশ্রী কান্না বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সুফল মাঝি তার হাঁ মুখের মধ্যে পা গুঁজে দেয়, এবং পা-টা ঐভাবে রেখে একটা ধাক্কাও দেয় সে, আর সেইসঙ্গে

তাকে ও অন্য মেয়েদের লক্ষ্য করে তীব্র কণ্ঠস্বরে বলে, 'তোরা উঠ্ এবার, দৌড় হবে, জলদি জলদি উঠ্, নয়তো এইখানেই হড়ের শরীরের নিচে সকলকে শুতে হবে।'

'শয়তানের নির্দেশ তামিল কর, যা বলছে শোনো তোমরা, ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদের রক্ষা করবেন।' মিস্টার ম্যাক্সের কথাগুলি বেদনাবিদীর্ণ, গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চায় না, তবু তিনি অতিকষ্টে নির্দেশ দেন।

মুমূর্ষু সাপ যেমন হঠাৎ ছোবল তোলে সেইরকম আকস্মিকভাবে হুল হড়ের পরিবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে রূঢ় গালিগালাজভরা ভাষায় প্রতিবাদ জানাল স্যামুয়েল, তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে এলিজাবেথকে আড়াল করে দাঁড়াতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘাড়ের ওপর কোনো ক্রুদ্ধ হুল হড়ের একটা কাপির ঘা পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে অর্ধখণ্ডিত গ্রীবা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেন নিমেষের ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

এর পরবর্তী অধ্যায় সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হুল হড়্কে কোনো বেগ পেতে হল না। সুমুখের দৃষ্টান্ত দেখে সব যেন মন্ত্রবলে ঘটে চলেছে। কেবলমাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষা এবং তদুপযুক্ত অবসর।

সম্পূর্ণ নগ্ন তিনটি যুবতী ও দু-জন প্রৌঢ়া রমণী প্রাণভয়ে উত্তরমুখে ছুটছে। তাদের পেছনে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ও বীভৎস উল্লাসময় কণ্ঠস্বরে কোলাহল তুলে প্রায় একশ' জন হুল হড়্। দেখে মনে হয় করাল মেঘের আবেশ বুঝি একদল আকাশচারী ভয়াতুরা মরালীর পিছু ধাওয়া করে ছুটে চলেছে।

সুফল মাঝি কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, অপেক্ষমান বাকি সাতজন বন্দী পুরুষের উদ্দেশে গলায় ব্যঙ্গের বন্যা ছুটিয়ে দিয়ে সে বলল, 'তোদের কুড়িগুলোকে নিয়ে আরও অনেক তামাশা হবে সাহেব, দেখবি নাকি তোরা? হড়্ মানে তো হাড়গার—নেকড়ে! হড়্ কেমন সুখ করে শাদা মেয়েদের মাংস খায় দেখতে চাস তো ওদিকে গিয়ে দেখে আয়।'

ধৈর্য ও বিহ্বলতার শেষ সীমায় এসে মিস্টার ম্যাক্সে হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন, 'ওরে নোংরা শয়তান, আমাদের এভাবে তিল তিল করে না মেরে একেবারেই মেরে ফেল; এসব দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছি না।'

সুফল মাঝি উত্তর দেয়, 'তুইও তো হড়্ মেয়ের মাংস খেতে ভালবাসতিস সাহেব, অনেক হড়্ মেয়ের পেট থেকে তোর শাদা বাচ্চা বেরিয়েছে। হড়ের পেটেও তো খিদে আছে, আজ তারা মেমসাহেবদের শাদা মাংস খাবে, তাদের

পেটে কালো কালো ডিম পাড়বে; তবে বাচ্চা বেরুবে না, মেমগুলোই যে কিছুক্ষণের ভেতর মরে যাবে।'

এ হেন পরিস্থিতিতেও কিন্তু মিস্টার টেরিউড একেবারেই শান্ত। আর রেল পর্যবেক্ষক জন টেলার হুল হড়ের হাতে ধরা পড়ার পর থেকে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন, তারপর তাঁর একবারও কোনো ভাবান্তর নেই। অপরের হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রিত নিষ্প্রাণ কাঠের গুঁড়ির মতোই অভিব্যক্তি তাঁর। বাকি চারজন পুরুষও যেন তাঁরই প্রতিরূপ।

মোষ ও বলদ বলি দেওয়ার শানিত রামদা কাঁধে তুলে নিয়ে হুল হড়্ সুফল মাঝি মুচকি হেসে আদেশ দেয়, 'সাহেব তুরা এবার গিয়ে হোতির পিঠে উঠ্, তোদের নিয়ে অন্য তামাশা হবে।'

'বদমাশটা যা বলছে তাই তোমরা মুখ বুজে মেনে নাও।' সমগোত্রের মানুষ-গুলির দিকে তাকিয়ে টেরিউড শান্ত গলায় বলেন, তারপর সর্বাগ্রে নিজেই একটি হাতির উদ্দেশে এগিয়ে যান তিনি।

হাওদাহীন দুটো হাতির পিঠে বাঁধা গদির ওপর চড়ে বসে সাতজন পুরুষ বন্দী। পতনের সম্ভাবনা এড়াতে শক্ত কাছিটা তারা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে থাকে। হাতি দুটি মাঠ পেরিয়ে পশ্চিমে জলাভূমির দিকে পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে।

আপাত দৃষ্টিতে প্রায় নিশ্চিন্ত মনে বসে মিস্টার টেরিউড দূর উত্তরে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁদের মেয়েগুলিকে তাড়া করে যে হুল হড়ের দল সেদিকে গিয়েছিল, তারা সব এখন একটি জায়গায় প্রায় কুণ্ডলি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর মাঝে মেয়েরাও আছে কোথাও, কিন্তু সেসব দেহগুলো দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত কিছু সংখ্যক কালো নেকড়ে এখন সাদা নারী মাংস ভক্ষণে ব্যস্ত, তাদের পেটের মধ্যে কালো কালো ডিম পাড়ছে, আর বাদবাকি আপাতত কৌতূহলী দর্শক, এবং পরবর্তী পর্যায়ের উদ্‌গ্রীব খাদক ও কালো কালো ডিমের উৎপাদক।

এ বছর হড়্ যুদ্ধ ও রাজ্যস্থাপনে ব্যস্ত, তাই আর ধান চাষ হয়নি। থৈ থৈ জলরাশি দেখে মনে হয় যেন নাম না জানা কোনো এক বিস্তৃতবক্ষা নদী। টেরিউড বসেছেন সবচেয়ে পেছনের হাতিটির পিঠে। তার পরেই হুল হড়ের পদাতিক বাহিনী, এবং সর্বাগ্রে রামদা কাঁধে মাঝি সুফল হাঁসদা।

হাতি দুটো জলার কাছে এসে পৌছতে সুফল মাঝি মাহুতদের লক্ষ্য করে বেশ উঁচু আর দরাজ গলায় বলে, 'হোতি জলে নামা, ওখানে তামাশা হবে; দেখবি সাহেবরা কেমন জলের মধ্যে মাছের মতন খেলা করবে।'

চারজন বন্দী আরোহীকে নিয়ে প্রথম হাতিটি বিনা দ্বিধায় জলমগ্ন মাঠে নেমে যায়। দ্বিতীয় হাতিটা তাকে অনুসরণ করে আসার আগেই টেরিউড হঠাৎ তার পিঠের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন, এবং হুল হড়ের বিস্ময় মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার অবসর না দিয়ে সুফল মাঝির হাতের রামদা ছিনিয়ে নিয়ে সর্বাগ্রে তার গলা লক্ষ্য করে পূর্ণ বেগে চালিয়ে দেন। তারপর অচিরে আরও দু-জন হুল হড়্‌কে প্রাণান্তক আঘাত করেন তিনি।

এই পবিত্র কর্তব্য যথাসম্ভব নিষ্ঠা ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার পর টেরিউড নিজের মনে বলেন, হে প্রভু, আজ আমি সবচেয়ে সুখী। আমার যথাসাধ্য কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরে আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। এই তিনটি হত্যার একটা আমার আসন্ন মৃত্যুর অগ্রিম প্রতিশোধ, আর আমার পুত্র কন্যা স্ত্রী ও জাতির জন্যে একটি করে। হে ঈশ্বর, আজ আমার আনন্দের সীমা নেই।'

ইহজীবনে এটিই মিস্টার টেরিউডের শেষ কথা। তাঁর একমাত্র আত্মস্তুতি।

ইতিমধ্যে ওদিকেও ঘোর তামাশা আরম্ভ হয়ে গেছে। হাতি দুটির পিঠের ওপর উপবিষ্ট আরোহীদের লক্ষ্য করে হুল হড়্‌ তীরের ঝাঁক ছেড়েছে। হাতের রশি শিথিল হয়ে আহত ব্যক্তিবর্গের দেহগুলি ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দে জলে পড়ছে উদ্দাম বাজনার সুরের সঙ্গে সে আওয়াজের তিলমাত্র সঙ্গতি নেই, তবু পৈচাশিক উল্লাসে হুল হড়্‌ এক নাগাড়ে বিকট রণবাদ্য বাজিয়ে চলেছে।

অম্বরের আকাশে এখন ঘনকৃষ্ণ মেঘসম্ভার। প্রবল ধারাবর্ষণ আসন্ন। ডাঙার ওপর থেকে মিস্টার টেরিউড ও তিনজন হুল হড়ের সব রক্তের দাগ অচিরে ধুয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ সমুদ্রের মতো বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে ফেলবে, ইতিপূর্বেই যেখানে আরও অনেক রক্ত মিশেছে।

পঁচিশ

কেবলই দুঃসংবাদ!

দশমুখী পচা ঘায়ের ভেতর থেকে প্রবাহিত পুঁজরক্তের মতো খারাপ খবর-গুলো অবিরাম দশদিক থেকে বয়ে আসছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হুল হড়ের বিজয় পর্ব চলেছে। ঘোর আঁধারের সম্ভাবনা কাটিয়ে বার বার জয়সূর্য উদিত হয়েছে। সর্বত্রই পরম সাফল্য লাভ! দুর্ধর্ষ ভয়াবহ যুদ্ধ, সেখানে জয় পরাজয়ের

ভবিষ্যৎবাণী করা স্বয়ং ঠাকুরজিউএর পক্ষে অসম্ভব সেখানেও ভাগ্যের পাশা হড়ের স্বপক্ষে দান ফেলেছে।

কেবা কল্পনা করেছিল কোম্পানীর সব আয়োজন ব্যর্থ ও তুচ্ছ করে হুল হড় অম্বরের রেল পরিকল্পনা ও সংযোগ ধ্বংস করবে? এ দিকটা বাঁচাতে কোম্পানীর সবশক্তি প্রয়োগ। সে কেবল বিরাট আর্থিক ক্ষতি বাঁচাবার উদ্দেশ্যে নয়, অর্থ প্রাণ ও মান তিনটি প্রশ্নই সেখানে যুগপৎ জড়িত। সাময়িকভাবে হলেও রেলের ওপর থেকে আধিপত্য যাওয়ার অর্থ কোম্পানীর একটি উৎকৃষ্ট প্রকল্পের সমূহ কলঙ্ক।

কত না বাধাবিপত্তি ও বিপর্যয় অতিক্রম করে রেল লাইন টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। পরাধীন জাতটাকে পরোক্ষে হুমকি দিয়ে রাখার অন্যতম নির্দোষ আয়ুধও এই রেলপথ। বিরুদ্ধ এবং বিপরীত মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে ভয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিচিত্র নিদর্শন।

অতএব ঐ রেলপথের প্রতি হুল হড়েরও দুর্নিবার ক্রোধ, বিপুল আক্রোশ। ওটার আগমনের পর হড় সমাজে ভাঙন ধরেছে। কুলিকামিন জাত হয়ে বেশ খানিকটা অংশ তো বেরিয়েই গিয়েছিল, আজ নয় আবার তারা বিদ্রোহের নামে জাতে উঠেছে। কিন্তু সবাই না, যারা যীশু ভজেছে, গির্জের পাকা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে, তারা তো আরও পাকাপোক্ত সাহেব আর মেমসাহেব। বিলিতি সাহেবদের চেয়ে তারাই হড়ের বড় শত্রু।

অম্বর রেল ইষ্টিশানের এক মাইল দক্ষিণে মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে গোলঘর নাম দিয়ে কোম্পানী একটা দুর্গ গড়ে ফেলেছিল, ভেতরে কামানবন্দুকসহ তিন-চারশ' সেপাই, তার মধ্যে লালমুখো আর দেশী সমান সমান। গোকুলপুরের দিক থেকে যদি হুল হড়ের দল অম্বরে প্রবেশের চেষ্টা করে ঐ দুর্গে বসে গোলা দেগে তাদের সমূলে উড়িয়ে দেবে।

গোকুলপুর হয়েই রাস্তা গেছে হিরণপুর লিটিপাড়া আমড়াপাড়া আর দুমকা। মাঝে মাঝেই অবশ্য নদীনালা। ব্রাহমনী বাঁশলই, শালপাতরা তোরই কিরলা জোবো এবং কপোত। কোথাও বা কোম্পানীর দৌলতে পুল বাঁধা হয়েছে, কোথাও কিছুই নেই। তবে মূল যোগাযোগ বিশেষ আয়াসসাধ্য নয়। সেসব হড়ের আধিপত্যের অঞ্চল; হড়েরই রাজ্য। আর জংলাভূমি বাদ দিয়ে পাহাড়ের ওপর অঞ্চল মাল এবং মালের পাহাড়ীদের আবাস।

পাহাড়ী ফৌজে সরিক পাহাড়ী ভিন্ন সাধারণ পাহাড়ীরা এ যুদ্ধে নিরপেক্ষের

ভূমিকায় রয়েছে। তারা কোনো পক্ষেই নেই ; অর্থাৎ সুযোগ ও সুবিধে অনুযায়ী গাছের খায় এবং তলারও কুড়োয়।

সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে পাহাড়ীরা ফেউয়ের মতো ওৎ পেতে থাকে। যুদ্ধের যেমন সাধারণ পরিণতি, তাতে এক পক্ষ পরাজিত হয় আর বিরুদ্ধ পক্ষ পরাজিতের পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে যায় সেই অবসরে লুণ্ঠন ব্যাপারে আজন্মসিদ্ধ পাহাড়ীরা এসে দু-তরফের অবারিত শিবির লুঠ করার পর পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে অন্তর্ধান করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোম্পানীর সম্পত্তি ও সম্পদ সামগ্রী খোয়া যায় বেশি। বৈরাগী প্রকৃতি হড়ের আর সম্বল কি ? হড় কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় করে, অজস্র সংখ্যায় প্রাণ দেয়, কিন্তু পুরস্কারের সিংহভাগ চির শঠ পাহাড়ীদের। অথচ প্রায় শতবর্ষ ধরে, সেই কালেক্টার আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের যুগ থেকে, কাগজ কলমে তারা কোম্পানীর অতি প্রিয় গোলাম। তাদের শতবর্ষের আনুগত্যের ইতিহাস। কোম্পানীর পার্বত্য বাহিনীতে পাহাড়ী সগৌরব সংযোজন। দরদ ও সমবেদনা প্রদর্শনের বিনিময়ে শত্রুর আনুগত্যলাভের বিশিষ্ট নিদর্শনস্বরূপ পাহাড়ী আর কোম্পানীর সম্পর্ক।

অম্বর কদমশিয়ারে দীকু রাজবাতি ও ম্যাক্সে পরিবার আর টেরিউড পরিবারসহ আরও কয়েকটি ইংরেজের শোচনীয় মৃত্যুর পর বিভিন্ন দিক থেকে হুল হড়ের প্রবাহ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে গোলঘর তৈরি হল, এবং ঠিক সেই সময় আতো গোকুলপুরের উত্তর সীমানায় সমবেত হুল হড় তাদের নবস্থাপিত শিবিরে মহোৎসাহে নরবলিসহ ধনুক পুজো সম্পন্ন করে সে জায়গার নামকরণ করল আতো ধনুকপূজা।

ধনুক পুজার পর তৃতীয় দিন।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ। ধনুক পূজার শিবির ছেড়ে মরণপণে অঙ্গীকারাবদ্ধ অগণিত হুল হড়ের অম্বরের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা। গোলঘর নামের অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বর্ষিত গোলার আগুনে বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ রক্তবর্ণ, আর নিম্ন ভূমিতে পরিপূর্ণ আঁধার। সেই অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু হুল হড়ের দেহ প্রবাহিত রক্তে অম্বরের মাটি লাল হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও কোম্পানীর ফৌজ অম্বরের সগর্ব আধিপত্য হারাল। সেইসঙ্গে সমগ্র রেল প্রকল্প।

গোলঘর দুর্গও বেদখল। অন্ধকার রাতে অসংখ্য হুল হড় পিঁপড়ের সারির মতো কাঁটা আর পাথরকুঁচিভরা মাটির ওপর দিয়ে প্রায় সিকি ক্রোশ বুকে হেঁটে

গিয়ে গোলঘর পরিবেষ্টিত করে ফেলল। অস্ত্রের সম্বল বলতে কাঁধের তীরধনুক, আর হাতের ধারাল কাপি। এবং তীরের আগায় বাঁধা তেলসিক্ত ন্যাকড়ার ক্ষুদ্রাকৃতি অগ্নি গোলক। বিপুল সংখ্যাধিক্যই সে গোলার মৌলিক শক্তি।

অম্বর আর গোলঘর দুর্গ প্রচুর রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে হুল হড়ের করায়ত্ত হয়েছে। ঐ দুই ক্ষেত্রে কোম্পানীর দর্প বিনাশ করতে অন্তত তিন হাজার হুল হড়ের প্রাণনাশ, অথচ যুদ্ধ নায়ক হড় সুবাহ্ সিধু রাপাজ অতগুলি আত্মসমর্পিত সিপাহীর একটিরও কেশাগ্র স্পর্শ করল না। পরাজিতের সঙ্গে তার রাজকীয় ব্যবহার।

শ্বেতবর্ণ যুদ্ধাশ্বের বল্গা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সিধু, কোম্পানীর পরাজিত কাপ্তানকে সমুখে উপস্থিত করার আদেশ দিল।

যুদ্ধবন্দী কাপ্তান সিধুর কাছে আনিত হলে সে উদার কণ্ঠে বলল, 'কাপ্তান তোর গোলা বারুদ আর ফৌজ নিয়ে রামপুরহাটের দিকে ভেগে যা, আবার সেখানে আমাদের যুদ্ধ হবে। আমরা হড় আছি. এই তীরধনুক দিয়েই তোদের সমুন্দুরের ওপারে ফিরিয়ে দেব।' তারপর অবশ্য শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণের নিদর্শনস্বরূপ কিছুটা সংকোচের সঙ্গে কাপ্তানের কোমরে গোঁজা পিস্তলটা চেয়ে নিল সে. 'তোর পিস্তোলঠো আমায় দিবি রে কাপ্তান, আমি তো রাপাজ আছি, এটা কাছে রাখব?'

কোমরবন্ধনীতে আটকানো পিস্তল, নিজের হাতে কোমরবন্ধনী খুলে সিধুর কোমরে কাপ্তান আটকে দিয়ে গেল। সেটা পেয়ে শিশুর মতো অপার আনন্দ সিধুর। শত যুদ্ধজয়ের সুখ। অজস্র হুল হড়ের আত্মাহুতি জনিত খেদ ও ক্ষতির পরিপূর্ণ বিস্মৃতি।

সিধুর অম্বর বিজয়, কানহুর সহযোগে রাজমহলের সংগিদালানে যুদ্ধ, শিউড়ি দখল, হুল হড়ের এইসব গৌরবজনক কৃতিত্বের পর হড় মেয়েরা বীর সিধু কানহুর গান বেঁধেছিল, সে সঙ্গীতমালা হড়ের শারজম পাতড়ার ভরসা না রেখেই বর্ষার প্লাবনের মতো সারা দামিনের পাহাড় জঙ্গল আর গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি।

যে কোনো পর্ব ও সামাজিক অনুষ্ঠান, অথবা ভিন্ন উপলক্ষ্যে পরিবেশনযোগ্য একমাত্র গান সিধো-কানহু সেরিং। সিধু-কানহু, স্তুতিগীত। তাদের নিয়ে হড় রমণীদের রচিত বীরগাথা।

বুরু চেতান চেতান তে
ওকোয়রেণ পোস্ত সাদম লিকির-লিকির—
সোনাতে সাজ সাদম, রূপাতে বাজ সাদম
সিধোরেণ পোস্ত সাদম লিকির-লিকির ॥
অদূর ঐ পাহাড় চূড়ায়
সাদা ঘোড়ায় কে ছুটে যায়—
সোনার তাজে, রূপার সাজে, সাদা ঘোড়া ছুটছে ঐ
সিধু হড়্ তার সওয়ারী. আমার পানে তাকায় কই !!

বিজয় সংবাদের উল্লাস ছাড়াও ইতিমধ্যে ঠাকুরজিউ কতবার কতরূপে দেখা দিয়েছে। কখনো বেদীর ওপর রাখা গরু গাড়ির চাকার মূর্তিতে, কখনো বা সাক্ষাৎ অগ্নিরূপে। সঙ্গে অজস্র বইকিতোব আর খাতাপত্তর।

হড়ের সর্বাপেক্ষা বড় দেবতা স্বয়ং মারাংবুরু এসে হড়্কুলের সর্বাধিক ভক্ত আর বিশ্বাসীকে অজস্র আশার বাণী শুনিয়ে গেছে। হড়্ একদা তামাম চরাচরের রাপাজ ছিল, তারপর নানা পাপ ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনের শঠতার ফলে রাজ্যের অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে; কিন্তু সুদিন আগত ঐ, আবার অবধারিতভাবে হড়্ই এই ধারতির আসন্ন রাপাজ। হড় পুনরায় পৃথিবীর যত বনাঞ্চল আর পার্বত্য তরাই প্রদেশে স্বাধীনরূপে বিহার করবে। হড়্ সর্বত্রই যুদ্ধ বিজয়ী হবে।

হড়্ মানে স্বাধীনতার অক্ষয় গড়।

প্রথম প্রথম ঠাকুরজিউর প্রতিটি প্রত্যাদেশ আকাশে সিঞচান্দো ও ইন্দাচান্দো ওঠার মতোই নিয়মিত ফলে যাচ্ছিল। সূর্য ও চন্দ্র উদয়ের মতোই প্রত্যক্ষ এবং নির্ঘাৎ। কিন্তু তারপরই হঠাৎ সব কিরকম হয়ে গেল। নদীর জল সাগরের দিকে প্রবাহিত না হয়ে পাহাড়ের ওপর তার উৎসমুখে বিপরীত স্রোত ধরে ফিরে যাচ্ছে যেন!

হড়ের ক্ষীণ আধিপত্যে প্রচণ্ড বিস্তারের ঢল নেমেছিল, আবার তা প্রাথমিক পর্যায়ের সংকীর্ণতার মধ্যে ফিরে চলেছে। তবে কি পুনরায় হড়্ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপের পুনরাগমন হয়েছে, সেইজন্যে ঠাকুরজিউ মরাংবুরুর অভিশাপে সবই বিপরীত ও ভিন্নমুখী? প্রকৃত ব্যাপারটা দীঘল টুডু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

যতগুলি জায়গা জুড়ে হড়ের আধিপত্য বিস্তার হয়েছিল ক্রমশই সব প্রায় হাত ছাড়া হয়ে গেছে। অম্বর রাজমহল তিন পাহাড় কোনোটাই আর হুল হড়ের অধিকারভুক্ত নেই। ডুমকা-এবং গোড্ডার মতো সর্বদিক থেকে দুর্ভেদ্য অঞ্চল তাও হস্তচ্যুত।

কোটালপুকুরের যুদ্ধের পর কোম্পানীর ফৌজ হড়্ রাপাজ সিধু সুবাহ্‌কে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। শ্বেত রাজকর্মচারীদের কাছে রাজকীয় মর্যাদা অথবা ব্যবহার পায়নি সে। খুবই ছোট্ট এবং অনুদার ছিল সেই আয়োজন। তার প্রতি বিচারের প্রহসনটুকুও দেখাবার প্রয়োজন হয়নি।

ফাঁসির আগে সিধু এক ঘটি জল ও একটি চুটির ধূমপানের বাসনা প্রকাশ করেছিল, মিত্ লোটা দাঃ, মিততে চুটি—।'

কিন্তু একান্ত অবহেলার দরুন আর সময় অপচয়ের ভয়ে তার সে অনুরোধে কোনো ব্যক্তি বা উদযোক্তা কর্ণপাত করেনি। তারপর গাছে টাঙানো ফাঁসির দড়ি থেকে সিধুর লাশ নামিয়ে কয়েকটা উপবাসী কুকুরকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। একটি কুকুরও সে মৃতদেহ স্পর্শ করেনি, পরে গলিত শব শকুনে ছিঁড়ে খেয়েছে।

কোম্পানীর পক্ষে অন্যতম যুদ্ধ নায়ক মুর্শিদাবাদের কালেকটার টুগুড সাহেবের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। মাত্র পাঁচশ' দেশী আর বিলিতি মেশানো ফৌজ নিয়ে নিষ্ঠুরতার দাপটে পাহাড় জঙ্গল এবং গ্রামগঞ্জ এক করে ছেড়েছেন তিনি।

আর রাতের আশ্রয় তিনপাহাড়ের কাছেই এক সংকীর্ণ গিরিবর্তে। বর্ষা সঞ্জীবিত ঘাসের পুরু গালিচায় বসে শ্রান্ত দীঘল টুডু নিরাশাসিক্ত চিত্তে চুটি টেনে চলেছে। ক-মাসের নিত্যসঙ্গী অস্ত্রগুলো দুর্বহ বোঝার মতো তার এক পাশে নামানো। অস্ত্র বুঝি মনের কথা টের পায়, তাই মন দুর্বল হয়ে পড়লে অস্ত্রও বিকল। তীর চালাতে হাত কাঁপে আজকাল, প্রতি পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। কাপির ত্বরিত ও সুদক্ষ ব্যবহারও সে যেন একেবারেই ভুলে গেছে। কিংবা দুর্বল হাতে এ জিনিস অপভারের মতো।

দীঘলের অদূরেই হড়্ রাপাজ কানহু সুবাহ্। দু-তিনবার ডেকেও সে দীঘলের সাড়া পায়নি। এবার তাই সে দীঘলের কাছে উঠে এল। ডাকতে সংকোচ বোধ হয়, তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, আর একবার একটু ধীরে ডাকল, 'অতে হো দীঘল টুডু?'

দীঘল জবাব দিল না, এমনকি কানহুর দিকে তাকাল না পর্যন্ত, কেবল হাতের জ্বলন্ত চুটি তার উদ্দেশে বাড়িয়ে রাখল সে।

দীঘলের হাত থেকে আধপোড়া চুটিটা হড়্‌রাপাজ কানহু সুবাহ্‌ নিজের হাতে টেনে নিল। যুদ্ধের পাশা উল্টোবার সঙ্গে সঙ্গে তার নেতৃত্বের আকর্ষণ ও দাপট ক্রমশ কমে আসছে। দু-দিন আগে পর্যন্ত তার চোখের ইঙ্গিতমাত্র যত হড়্‌ মৃত্যুর আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্যে নেচে উঠত, আজও হয়তো উঠবে, কিন্তু আগেকার সেই বিশ্বাস নিয়ে নয়। এ শুধু হড়্‌ নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধ জাত বলেই নিঃশব্দে নেতার নির্দেশ মেনে নেবে।

আজকাল শুধু পালিয়ে বেড়ানো, গঞ্জ থেকে বন, বন থেকে পাহাড, পাহাড় ছেড়ে নির্জন প্রান্তরে। এখন যুদ্ধের অর্থ আর আক্রমণ নয়, কেবলই আত্মগোপন। প্রাণভয়ে উন্মত্তের মতো পালানোর সময় ভিন্ন হাতে অবসর প্রচুর।

কানহুর ইচ্ছে হয় এই অবসর সময়টা সে বসে বসে গল্প করে, দল বেঁধে আশার স্বপ্ন দেখে। সত্যি মিথ্যে কাহিনী বুনে সকলকে আবার আগের মতোই উদ্দীপ্ত করে তোলে। পুনরায় পূর্ণ বেগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হড়্‌ মানে ঝড়, এই কথাটা সব বিশ্বস্ত অনুচরদের নতুন করে উপলব্ধি করায়। কিন্তু এই প্রবচন শোনার, বা তার সঙ্গে কথা বলার কেউ নেই যেন। জয় পরাজয়ের হিসেব দিয়েই নেতার মর্যাদা। সিধুর ফাঁসির খবরে কারো মুখে একটুও খেদোক্তি শুনতে পায়নি কানহু। নিজেও তাই সর্ব সমক্ষে মুখ ফুটে একটা দুঃখের কথা সে বলতে পারেনি। নেতা মানে তো হাজারটা মানুষের ইচ্ছের ক্রীতদাস!

সম্পূর্ণ নীরব চিন্তার সহযোগে দীঘলের এগিয়ে দেওয়া আধপোড়া জ্বলন্ত চুটিটা মুখে নিয়ে দু-একটা টান দেওয়ার পর কণ্ঠস্বরে উৎফুল্ল ভাব এনে কানহু বলল, 'এই বর্ষাটাই আমাদের একেবারে কাবু করে ফেলেছে। আবার দুটো দিন পরেই দেখবি হড়ের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। ঠাকুরজিউ শেষবার গরু গাড়ির চাকার রূপ ধরে এসেছিল না? তার মানে বর্ষায় গাড়ির চাকা কাদায় জমে বসে যাবে, হুল হড়্‌ আর এগুতে পারবে না, কিন্তু বর্ষার পর আবার গাড়ি ছুটবে, বুরু চেতান চেতান তে—পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটবে, গ্রামগঞ্জ আর শহরের মধ্যে ঢুকে যাবে।'

দীঘল অপ্রত্যয়ের হাসি হাসে, কিন্তু সে এখনো নিরুত্তর। ঠাকুরজিউর আবির্ভাবের যে ভাষ্য কানহু তৈরি করল তা আর মনে ধরে না, তবু এবার সে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার কানহুর মুখের দিকে তাকায়।

সির্সিজাওই মারাংবুরুর অসীম দয়া তাই আকাশে চাঁদ রয়েছে আজ, নয়তো এই বর্ষা ঋতুর ঘোর আঁধারে বিষাক্ত সাপ আর হিংস্র জীবজন্তুর আশংকা বুকে নিয়ে রাত কাটাতে হত। এক ফোঁটা তেল নেই যে আগুনের মশাল জ্বালবে।

সকালের দিকে একটা মাঠ পেরিয়ে আসবার সময় একজোড়া বেওয়ারিস বুড়ো বলদ পাওয়া গিয়েছিল তাই দলের এতগুলি লোক তাদের পেটের খিদে শান্ত করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তেল নেই, নুন নেই, ঝাল লংকা নেই; একশ' বছরের বুভুক্ষা পেটে নিয়েও কি এ ধরনের মাংসপোড়া খাওয়া সম্ভব?

ঐ অখাদ্য ভোজন করতে করতে কানহু খুব সম্ভব অত্যন্ত অসাবধানেই বলে ফেলেছিল, 'এর চেয়ে মানুষের মাংস বোধহয় খেতে অনেক ভাল? কত দীকুর রক্ত তো খেয়ে দেখেছি, মাংসটা অন্তত নরম আর মিষ্টি হবে।'

তাই হয়তো খেতে হবে একদিন। নরমাংস! অন্য জাতের মানুষ না পাওয়া গেলে হড্‌ হড়ের মাংস খাবে। এবার কি যেন হয়েছে, বর্ষার উৎফুল্ল আর কেঁদো কেঁদো ব্যাঙ, তাও চোখে পড়ে না। হুল হড়ের ভয়ে তারাও বুঝি বিবরে বিলীন হয়ে গেছে, অন্তত এই রকমই ভাবতে ইচ্ছে করে।

এখন হুল হড়ের ভরসা পাহাড়তলী ও জংলী এলাকার তাল খেজুর আতা নোনা আর কাঁঠাল। কোথাও বা বুনো কুল আর পিয়াজ ফল। এবং মহুয়ার ফুল। এসব হয়তো এই দুদিনে হুল হড়্‌কে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই সির্সিজাওই বিধাতার সৃষ্টি!

কিন্তু এ ধরনের খাদ্য খেয়ে শরীরে যুৎ থাকে না। যদি সুসময়ে লুঠের মাল-গুলো বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখা যেত তাহলে তা এই দুদিনের সহায়স্বরূপ হতে পারত। কিন্তু হড্‌ সঞ্চয় জানে না। হড্‌ না ঝড়। সরোষে ধেয়ে আসে, চতুর্দিক লণ্ডভণ্ড ছত্রাকার করে দিয়ে যায়, সঙ্গে নেয় না কিছু। রুষ্ট বৈরাগী যেন। এতদিনকার যুদ্ধের ফলে তাদের ভাগের প্রাপ্য পাহাড়ীরা সব পাহাড়ের ওপর নিজেদের নিরাপদ ডেরায় নিয়ে গিয়ে তুলেছে।

ভবিষ্যতের আলোচনায় দীঘলের আগ্রহ নেই দেখে যে খবর দশ বারোদিন আগে বাসি হয়েছে সেই কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে কানহু টেনে আনে, 'নিনকী মেঝেন মালের সর্দার গুনীশকে মেরে ফেলেছে, নয়তো এবার আতোয় ফিরে গিয়ে তোকে সঙ্গে নিয়ে আমি চুপি চুপি পাহাড়ে উঠে গুনীশ আর তার বউগুলোকে কেটে রেখে আসতুম। তবু নীতু মেঝেনের খোঁজ করতে আমাদের একবার পাহাড়ে যেতে হবে।'

এবার দীঘল কাপিটা হাতের কাছে টেনে নিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বলে, 'হ্যাঁ, আমি তোর সঙ্গে যাব, কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দীঘলের মন্তব্যে সায় দেওয়ার পর কানহু সগর্বে উত্তর দেয়, 'হড়্‌কে তবুও হড়ের কাজ করে যেতে হবে।' তারপর সে কিঞ্চিৎ বিরতির সঙ্গে ঈষৎ কৌতুক মিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করে, 'কিন্তু তুই আমার সঙ্গে যাবার অনুমতি পাবি তো?'

'কার অনুমতি?' জিজ্ঞাসার পর দীঘল অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় কানহু, তারপর সংক্ষেপে উত্তর দেয় সে, 'বাহা।'

বাহা!

বাহার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে দীঘলের সর্ব চিত্তে আকস্মিক চমক লাগে। বাহা বেঁচে আছে তো? এখন যেন মরা আর হারিয়ে যাওয়া, যে কোনো হড়্‌ মেয়ে পুরুষের সম্বন্ধে এটাই একমাত্র সংবাদ। বাহা আর নিনকা মেঝেনের শেষ খবরটা জানা যায়নি। অথচ বলতে গেলে এতদিন পর্যন্ত দীঘলের নিত্য নতুন সংবাদ ও ঘটনামুখর মনে বাহার চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যেও স্থান পায়নি।

আতো ভাগনাডিহিতে মাত্র পাঁচজন শক্ত সমর্থ ও সাহসী হড়ের পাহারা রেখে হুল হড়্‌ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল। মনে তখন কোনো দুর্ভাবনাই ছিল না, যুদ্ধান্বেষী গ্রামত্যাগী হড়ের সংখ্যাধিক্য আর সাহসিকতার আঁচ যেন আপনা থেকেই আতোর অভ্যন্তর অবধি সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তার প্রশ্ন ক্যারো মনেই জাগেনি, তা সত্ত্বেও যে ক্ষীণ ব্যবস্থা, তা শুধু নিয়মরক্ষাই যেন।

আতোর সেই অপ্রতিরোধ অবস্থার সুযোগে একদিন সুস্পষ্ট দিবালোকেই চেতে মালের সর্দার গুনীশ ও তার অনুগত পাহাড়ী সম্প্রদায় ভাগনাডিহি আক্রমণ করে বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ নীতু মেঝেনের জাওঞাই টুইলা ও বাকি চারজন হড়ের মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে যায়।

মেয়েরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তাদের এই সময় ও সুযোগটুকু বের করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মাত্র পাঁচটি বীর হড়্‌কে যুদ্ধের প্রহসন দেখানোর জন্যে ঘাতকদের সামনে এগিয়ে গিয়ে আমন্ত্রিত মৃত্যু বরণ করতে হয়। তবু নাকি সেই এক পক্ষীয় অসম যুদ্ধেও দু-তিনটি পাহাড়ীকে তারা স্বর্গত করতে পেরেছিল, এবং জনকয়েককে গুরুতরভাবে আহত। তারপর টুইলার শবদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার করতে গিয়ে নীতু মেঝেন নিজেই নিখোঁজ। আতোর মধ্যে তার মরা শরীরের

দর্শন পাওয়া যায়নি।

পাহাড়ীরা যখন নিষ্ঠুর হত্যাক্রিয়া শেষ করে গ্রাম লুণ্ঠনের পর পাহাড়ের পথে পলায়োন্মুখ, সেই সময় হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নিনকী মেঝেন পাহাড়ী সর্দার গুনীশের ঘাড়ে ধারাল কাপির মক্ষম কোপ বসিয়ে দেয়। নিনকী মেঝেনের অনেক দিনের অঙ্গীকার পূর্ণ! কিন্তু তারপর কি হল তার এ খবর স্পষ্ট জানা যায়নি। বলেনি কেউ।

পাহাড়ীদের লুঠতরাজের খবর এসেছিল, কিন্তু কোনো বিস্তারিত বিবরণ প্রচারিত হয়নি। হড্ সমাজের শারজম পাতড়া বা প্রচারিত সংবাদ কখনো এমন অস্পষ্ট হয় না। ভুল হড়ের হয়তো হৃদয়ভঙ্গ হবে, সম্ভবত সেই আশংকায় সম্পূর্ণ খবর ঘোষণা করা হয়নি। পাহাড়ীরা কি একা নীতুকেই হরণ করে নিয়ে গেছে, আর কাউকে নয় তো, ভুল হড়ের এ জিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর আসেনি।

নীতু মেঝেনকে ধরে নিয়ে গেলেও অন্য জাতের মেয়েকে খুব বেশিদিন পুষবে এতটা সগৌরব বুকের পাটা বা পর্যাপ্ত খাদ্যের সম্ভার-সংস্থান পাহাড়ীদের নেই। উপরন্তু নির্দয় নিষ্ঠুরতাই তাদের সানন্দ বিলাসিতা। অপহৃতা জোয়ান মেয়ের শরীর খুঁটে পরিপূর্ণ সুখের আকর নিংড়ে নেওয়ার পর পাহাড়ের ওপর থেকে অতল গহ্বর খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই সাধারণ রীতি। বিনা আয়াসে ভবিষ্যতের সর্ব দায়মুক্তি।

হয়তো কেবল নীতুই নয়, বাহার হড়মহাটিং কংকালও গিদরি পাহাড়ের কোনো খাদে পড়ে রয়েছে। আর পরিপূর্ণ যৌবনশাসিত দেহের কঠিন কোমল মাংসে সর্বপ্রথম লিপ্সাপরায়ণ পাহাড়ীদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে তারপর পাহাড়ের খাদে বিচরণশীল বন্য জন্তুর অপ্রত্যাশিত ভোজ হয়েছে।

চিন্তার সঙ্গে সুদৃঢ় সমতা রেখে দীঘলের মানসচক্ষুর সম্মুখ দিয়ে সমস্ত ঘটনা যেন সমুদ্রগামী নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে যায়। সেই অনন্ত স্রোতে সে নিজেও একজন অসহায় ভাসমান হড়্। নিয়তির নিরূপায় বন্ধনে আবদ্ধ!

জীবনের শেষ যখন ঘনিয়ে আসে তখন বোধহয় আন্তরিক কোনো সংকেত আজন্ম পরিচিত আতোর দিকেই আকর্ষণ করে। এরপর আর আতোর বাইরে থেকে কিছু অনুসন্ধান করে নেওয়ার উৎসাহ থাকে না। যেন সব দিকের আলো নিভে গিয়ে একটি মাত্র উজ্জ্বল জ্যোতিতে আতোর সীমারেখা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সেই জ্যোতিস্বরূপ আলোর দিকে তুটি আশাময় চোখ পেতে দিয়েছে হড়্‌রাপাজ কানহু সুবাহ্‌, বলল, 'দেলা—চল, এবার আমরা আতোয় ফিরে যাই, বর্ষার পরে আবার আগুনের মতন সারা দামিনে ছড়িয়ে পড়ব।'

কিন্তু ভাগনাডিহির কাছে পৌছেও আতোয় ঢোকার ভরসা হল না।

কানহু বিমর্ষ স্বরে বলে, 'আমাদের কিছুদিন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে, মনে হচ্ছে আতোয় পৌছলেই কোম্পানীর পেতে রাখা ফাঁদে ধরা পড়ে যাব, তারপর ফাঁসি।'

সত্যিই চোখে কিছু পড়ে না, তবু মনে হয় চারিদিকে যেন অনিরাপত্তার মহাজাল পরিবেষ্টিত রয়েছে।

কানহুর প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত, হয়তো তু-এক ক্রোশের মধ্যেই ওৎ পেতে আছে টুগুডের ফৌজ। হুল হড় আতোয় প্রবেশমাত্রই শত্রু পরিবেষ্টিত হবে। এমনিতেও তারা সন্দেহবশে শত্রুর অনুসন্ধানে আসতে পারে। বিশ্বাস নেই!

কোম্পানীর ফৌজ আতোয় এলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি করবে না, মেয়েদের সঙ্গে তুর্ব্যবহারও তারা কখনো করেনি। হয়তো ফৌজের সিপাহী তাদের ধরে কিছুক্ষণের জন্যে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে যেতে পারে, তবে বিশেষ অস্বাভাবিক জুলুম করবে না। প্রাণ নিয়েও খেলবে না তারা। কোনো বদনামের ভাগী হতে চায় না ফৌজী সিপাহীর দল। শত্রুকে চিনে বের করে নেওয়ার পর বাকি সকলের সম্বন্ধে তারা প্রায় নির্বিকার। চরম উদার। তা ছাড়াও শত্রুপক্ষীয়, কিন্তু নির্বিষ ব্যক্তির, বিশ্বাস অর্জনের জন্যে কোম্পানী নিয়ত তৎপর।

দীর্ঘ পাঁচদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে টুগুডের রক্তপায়ী ফৌজ জঙ্গল পরিবেষ্টন করে নিশ্চেষ্ট বসে রয়েছে। কাছেই আতো, কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে হুল হড়ের উপযুক্ত খাদ্য সংস্থান নেই। ছোট ছোট গর্তে জমে থাকা বর্ষার কর্দমাক্ত জলই তাদের একমাত্র পানীয়। আর খাদ্য বলতে আতা নোনা ও পিয়ালফল। এ জঙ্গলে এগুলিরই প্রাচুর্য। অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ যৎসামান্যই। শ্রাবণ মাসের ফল খেয়ে আরও দশ বিশটা দিন চলতে পারে। হড়্‌ যে জঙ্গলে ঢোকে পশুরা অচিরে সেখানকার নিশ্চিন্ত আবাস ছেড়ে অন্যত্র বিদায় নেয়।

আট দশদিনের মধ্যে বৃষ্টি নামেনি মোটেই, গর্তের সঞ্চিত জল শুকিয়ে এসেছে। বৃষ্টি হলে আবার অন্যদিকে বিপদ, মাথার ওপর আচ্ছাদনের কিছু নেই, নিরাশ্রয় পশুর মতো অবস্থা। জোঁক আর নানান বিষাক্ত পোকার

আক্রমণে সর্বাঙ্গ জর্জরিত হবে। হয়তো বা মৃত্যু পর্যন্ত।

জয় পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়ে প্রকৃত যুদ্ধ নয়, মাঝে মাঝে যেন শিশুসুলভ যুদ্ধের মহড়া চলছে। নিজেদের সগর্ব উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করতে কোম্পানীর অকর্মা ফৌজ জঙ্গল লক্ষ্য করে বন্দুক দাগে, আর তদুত্তরে হুল হড্ তীর নিক্ষেপ করে তাদের সজাগ অস্তিত্ব জাহির করে। উদ্দেশহীন নিশানার ফলে কোনো পক্ষেই হতাহত নেই। হুল হড়ের তীরের সঞ্চয় কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ সবদিক থেকে অবধারিত মৃত্যুর পদক্ষেপ।

হুল হড়ের পক্ষে এখন চরম অস্বস্তিকর অবস্থা, কে যেন তার অদৃশ্য হাতের নিষ্ঠুর আকর্ষণে প্রতিটি রণবীরকে নির্দিষ্ট মৃত্যুপথে টেনে নিয়ে চলেছে। এবং এই অদৃশ্য বিষশক্তির কবলিত হয়ে লোকবলও প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। নিত্যই দলের অনেকের গায়ে নীরব ও নিস্তেজ মৃত্যুর করাঘাত।

মৃত্যুর নিশ্চয়তার এতখানি উন্মুক্ত হস্তক্ষেপ কারো সহ্য হয় না ; অপরিসীম আক্রোশে প্রতিটি হুল হড্ সবিশেষ রুষ্ট। হড্ রাপাজ কানহু সুবাহ্র নেতৃত্ব অস্বীকার করে এবার হয়তো তারা চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কানহুকে হত্যা করে, আত্মসমর্পণের ধ্বনি তুলে টুগুড সাহেবের ফৌজের সামনে এগিয়ে যাবে। তবে এইটুকুই তাদের মানসিক বন্ধন, টুগুডের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ অপ্রতিবাদে ফাঁসির দড়িতে গলা দেওয়ার প্রাথমিক সর্ত ; তারপর টুগুডের যেমন অভিরুচি।

সবকটি হুল হড়ের সঙ্গে দীঘল নিজেও অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তা সত্ত্বেও মস্তিষ্কের শান্ত চিন্তা যথাসাধ্য নিজের আয়ত্তে রেখেছে সে। কানহুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে সে পরামর্শ দেয়, 'আজ সন্ধ্যের পরই আমরা কাপি হাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ব, যার কপালে সিসিজাওই মারাংবুরু পরমায়ু লিখেছে কেবল সেই সাহেবদের বন্দুকের সামনে থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারবে।'

'তাছাড়া উপায়ই বা কি ?' গভীর চিন্তার ফলে যেন এই একটামাত্র পথ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেইভাবে কানহু সম্মতি জ্ঞাপন করে।

এদিকে প্রতীক্ষার শেষ প্রান্তে এসে পড়ে অধৈর্য টুগুড আদেশ দিয়েছেন, 'জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসার জন্যে একটা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বাকি তিনদিক থেকে আগুন লাগিয়ে দাও। সেই নিরাপদ পথ দিয়ে বিদ্রোহীরা যখন প্রাণের দায়ে বেরিয়ে আসবে তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তারপর একান্ত অচিরে শুকনো ঘাসপাতা মরা গাছপালা আর অজস্র যুগাবধি

পুঞ্জীভূত নিষ্প্রাণ লতাগুল্ম অকৃপণ লেলিহান অগ্নিশিখার স্পর্শে প্রবল ও ভয়ংকর প্রেতমূর্তির মতো চারিদিক থেকে জেগে ওঠে যেন। অসংখ্য অগ্নি-অশ্ব জঙ্গল ভেঙে হুল হড়ের পশ্চাৎধাবন করে। সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে তাদের নিভৃত এবং নিরাপদ আশ্রয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এ ত্রাস কেবল আতো ভাগনাডিহির পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নয়; শুধুমাত্র নারী ও শিশু অধ্যুষিত আতোর অভ্যন্তরেও বিভীষিকার মতো প্রসারিত হয়েছে। খবর শুনে মারাংগ' রতনী মেঝেনের নিষেধজনিত অবরোধ দু-হাতে ঠেলে ফেলে বাহা ওড়া থেকে বেরিয়ে পড়েছে; বলে গেছে, 'তালাকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি, আমাদের বাপলা হবে। গ', এবার থেকে তুই আমায় তালারিণিঃ বলে ডাকবি। বলবি তালার বউ!'

নিনকী মেঝেন কিন্তু বাহার সঙ্গ ছাড়েনি, এখানে এসেও সে তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, 'মারাংবুরু ঠিকই হুল হড়্‌দের বাঁচিয়ে দেবে, তুই শান্ত হ'। হড়্‌ মরবে না, কখনো সে মরতে পারে না।'

অগ্নি কবলিত জঙ্গলের শিখারশ্মিতে এদিককার নিরাপদ স্থান পর্যন্ত আলোকিত, বাহার মসৃণ অপাঙ্গ তাতেই উজ্জ্বল। এত স্নিগ্ধ অগ্নিতাপে ভয় নেই তার। কিছুক্ষণ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে নিনকী মেঝেনের বাহুবন্ধন ছিন্ন করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একান্ত অবলীলায় ঐ ঘোর অগ্নিবলয়ের ওপারে চলে যায়।

সব বুঝেও অবুঝ আর্তস্বরে বাহার পিছু ডেকে নিনকী মেঝেন প্রশ্ন করে, 'অতে বাহা, ওকাতেম চলা কানাহ্‌—ওরে বাহা, কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

বাহাকে দেখা যায় না, কিন্তু অগ্নিরেখার ওপার থেকে তার স্থির সংকল্পিত উত্তর ভেসে আসে, 'দীঘল হড়্‌কে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি, তাকে আতোয় নিয়ে যাব।'

তারপর সেই নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ রাত্রিও শেষ হয়ে ভোরের আকাশে চোরখেদা তারার সুস্পষ্ট হাসিমুখ ফুটে উঠেছিল। আর তার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হুল হড়ের সংগ্রামী রণবাদ্য অগ্নিগ্রাসিত বনানীর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশই সে শব্দ ক্ষীণ এবং বাদক সংখ্যা প্রশমিত। হুল হড়্‌ আত্মসমর্পণ জানে না!

এ পরিস্থিতি কোম্পানীর চিরদিনের কলঙ্ক। টুগুড সাহেবের প্রসন্ন মুখাবয়বে গভীর দুশ্চিন্তার ছায়াপাত।

শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর শান্তিদূতের প্ররোচনায় মুষ্টিমেয় হুল হড়্‌ একমাত্র

উন্মুক্ত ও নিরাপদ পথে জঙ্গলের অগ্নিবলয় থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মানুষের কাছে আত্মসমর্পণের অবস্থা ছিল না তাদের। নিরন্তর ক্ষুধা, অপরিসীম তৃষ্ণা ও আকস্মিক অগ্নিদাহে মৃত্যুর হাতে পূর্ব-সমর্পিত প্রেতমূর্তি তারা।

কিন্তু সে কথা জানতে পারেনি আতো ভাগনাডিহির হুল হড়্ দীঘল টুডু।

আর জানতে পারেনি সেই আতোরই এক ভাবী বধূ, বাহা কিস্কু!

—